ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতে বিভিন্ন ঘরানা ও সাংগীতিক বৈশিষ্ট্য

আকলিমা ইসলাম কুহেলী

পিএইচ.ডি. গবেষক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ.ডি. ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

ডিসেম্বর ২০১৮

ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতে বিভিন্ন ঘরানা ও সাংগীতিক বৈশিষ্ট্য

গবেষক

আকলিমা ইসলাম কুহেলী

রেজিষ্ট্রেশন নং-১৮৩

শিক্ষাবর্ষ: ২০১৪-২০১৫

সংগীত বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মহসিনা আক্তার খানম (লীনা তাপসী)

সহযোগী অধ্যাপক

সংগীত বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অঙ্গীকারনামা

আমি এই মর্মে অঙ্গীকার করছি যে 'ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতে বিভিন্ন ঘরানা ও সাংগীতিক বৈশিষ্ট্য' শীর্ষক বিষয়ের উপর অভিসন্দর্ভটি আমার মৌলিক রচনা। এই অভিসন্দর্ভটি অথবা এর কোন অংশবিশেষ কোথাও প্রকাশিত হয়নি কিংবা প্রকাশের জন্য অন্য কোথাও জমা দেওয়া হয়নি।

আকলিমা ইসলাম কুহেলী
পিএইচ.ডি. রেজিস্ট্রেশন নং-১৮৩
শিক্ষাবর্ষ: ২০১৪-২০১৫
সংগীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, আকলিমা ইসলাম কুহেলী কর্তৃক উপস্থাপিত 'ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতে বিভিন্ন ঘরানা ও সাংগীতিক বৈশিষ্ট্য' শীর্ষক অভিসন্দর্ভ আমার তত্ত্বাবধানে রচিত। তাঁর রেজিস্ট্রেশন নম্বর ও শিক্ষাবর্ষ ১৮৩, ২০১৪-১৫। এটি লেখকের মৌলিক গবেষণাকর্ম। এই অভিসন্দর্ভ বা এর কোন অংশ গবেষক অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপন করেননি।

ড. মহসিনা আক্তার খানম (লীনা তাপসী)
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক
সহযোগী অধ্যাপক
সংগীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রসঙ্গকথা

সর্বজনীন মানব জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হচ্ছে সংগীত। সকল দেশে সকল জাতির মধ্যেই সংগীত বিদ্যমান। সভ্যতার তারতম্যে ও কালের প্রভাবে এর উৎকর্ষে ভিন্নতা এসেছে মাত্র। সংগীত সংস্কৃতির এমন একটি মাধ্যম যার শাস্ত্রীয় পরম্পরাগত রূপ না হওয়া পর্যন্ত শিক্ষালাভ সম্ভব নয়। ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের চর্চা এবং এর বিকাশের ক্ষেত্রে ঘরানার উৎপত্তি, অস্তিত্ব ও সৌন্দর্যের রহস্যের উপলব্ধিই বর্তমান গবেষণা কর্মটির মূল প্রেরণা।

বর্তমান অভিসন্দর্ভের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও রূপরেখা নির্মাণে বিভাগের প্রয়াত অধ্যাপক ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এই অভিসন্দর্ভটি রচনার ক্ষেত্রে গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক সংগীত বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মহসিনা আক্তার খানম (লীনা তাপসী)-এর অকৃত্রিম সহযোগিতা ও নিরন্তর উৎসাহ আমার পাথেয়। তাঁকে জানাই আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা। আরো কৃতজ্ঞতা জানাই বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ও রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. বিশ্বজিৎ ঘোষকে। তাঁর বিশেষ দিক-নির্দেশনা অভিসন্দর্ভটি পরিপূর্ণ হতে ভূমিকা রেখেছে।

অভিসন্দর্ভটি রচনাকালে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে সহযোগিতার জন্য বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ জনাব মোবারক হোসেন খান ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. সাইম রানাকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ। গ্রন্থ ও তথ্য সরবরাহ করে যাঁরা আমাকে গবেষণাকর্মটি রচনায় সহযোগিতা করেছেন তাঁরা হলেন সরকারি সংগীত কলেজের শিক্ষক ড. ফকির শহীদুল ইসলাম, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগের অধ্যাপক ড. অসিত রায় ও সহযোগী অধ্যাপক বন্ধু শায়লা তাসমীন, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মো. মাহমুদুল হাসান, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ.ডি. গবেষক স্নেহের মনিরা ইসলাম পাপ্পু ও পিএইচ.ডি. গবেষক তাপস দত্ত। এদের জানাই আমার অশেষ কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিক ধন্যবাদ। কম্পিউটার মুদ্রণের কাজে সহযোগিতার জন্য খোরশেদ আলম, নজরুল ইনস্টিটিউটের রবিউল ইসলাম ও স্নেহের ছাত্র আবু সাঈদকে এবং সার্বিক সহযোগিতার জন্য স্নেহের ছাত্রী রোকসানা করিম (কানন) ও দেবশ্রী দোলনকে জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ।

গবেষণাকর্ম রচনাকালে স্বামী মেহেদী মোস্তফা তার শত ব্যস্ততার মাঝেও সন্তানদের আমার অভাব বুঝতে দেয়নি বলে আমি তার কাছে কৃতজ্ঞ। দীর্ঘ এই সময়ে আত্মজ ঋভু, রুদ্র ও রায়ানকে সময় দিতে পারিনি, ওদের জন্য রইল আমার স্নেহাশীর্বাদ। যার অনুপ্রেরণায় আমার এই পথচলা তিনি হলেন আমার পিতা মো: শহিদুল ইসলাম। তাঁর প্রতি রইল আমার অসীম শ্রদ্ধা ও ভালবাসা।

আকলিমা ইসলাম কুহেলী

Dhaka University Institutional Repository

সূচি

অবতরণিকা	**৭**
প্রথম অধ্যায়	**৯**
প্রথম পরিচ্ছেদ : সংগীতের পরিভাষা	৯
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : সংগীতের বিভিন্ন ধারা	১৩
দ্বিতীয় অধ্যায়	**১৯**
প্রথম পরিচ্ছেদ : ঘরানার সংজ্ঞা	১৯
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ঘরানার উদ্ভব	২১
তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ঘরানার শ্রেণিবিভাগ	২৩
তৃতীয় অধ্যায়	**৩২**
সাংগীতিক বৈশিষ্ট্যসহ বিভিন্ন ঘরানার আলোচনা	৩২
কণ্ঠসংগীত ও যন্ত্রসংগীতের ঘরানা	**৩৩**
সেনী ঘরানা	৩৩
ডাগর ঘরানা	৩৯
প্রসদ্দু মনোহর ঘরানা	৪৫
বেতিয়া ঘরানা	৫২
গোয়ালিয়র ঘরানা	৫৮
আগ্রা ঘরানা	৬৮
বিষ্ণুপুর ঘরানা	৭৩
অত্রৌলী ঘরানা	৭৮
জয়পুর ঘরানা	৮৩
রামপুর(সহসওয়ান) ঘরানা	৮৮
দিল্লী ঘরানা	৯৫
কিরানা ঘরানা	৯৯
ভিন্ডীবাজার ঘরানা	১০৭

Dhaka University Institutional Repository

পাতিয়ালা (পাটিয়ালা) ঘরানা ১১১
মেওয়াতী (মেবাতী) ঘরানা ১১৭
সেনী মাইহার ঘরানা ১২৭
গোলাম আলীর সরোদ ঘরানা ১৩৫
নিয়ামতউল্লাহ খাঁ'র সরোদ ঘরানা ১৪১
শাজাহানপুর সরোদ ঘরানা ১৪৫
এমদাদ খাঁ'র সেতার ঘরানা ১৪৯
ইন্দোর বীণকার ঘরানা ১৫৪
দিল্লী তবলা ঘরানা ১৫৬
লক্ষ্ণৌ তবলা ঘরানা ১৫৯
বেনারস (বারানসী) তবলা ঘরানা ১৬৩
পাঞ্জাব তবলা ঘরানা ১৭০
অজড়ারা তবলা ঘরানা ১৭৪
ফররুখাবাদ তবলা ঘরানা ১৭৭

নৃত্যের ঘরানা **১৮২**
লক্ষ্ণৌ কত্থক ঘরানা ১৮৪
জয়পুর কত্থক ঘরানা ১৮৯
বেনারস কত্থক ঘরানা ১৯৩

উপসংহার **১৯৬**

পরিশিষ্ট **১৯৯**
ঘরানাভেদে খেয়াল গানের বন্দিশের স্বরলিপি ১৯৯

গ্রন্থপঞ্জি **২৩৪**

Dhaka University Institutional Repository

অবতরণিকা

সংগীত মানব জীবনের প্রাচীন ঐতিহ্য ও অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সংগীতের এই বহমান ধারা যুগে যুগে বিভিন্ন উপাদানে সমৃদ্ধ হয়েছে। মানুষের কণ্ঠস্বর সৃষ্টির সময় থেকেই সংগীতের উৎপত্তি। তাই সুরের মূল উৎস হচ্ছে স্বর। ভাষা সৃষ্টির পূর্বে মানুষ তার দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, রাগ-অনুরাগসহ সকল প্রকার আবেগ প্রকাশের ক্ষেত্রে স্বরের ব্যবহার করত। কণ্ঠস্বরের এই ব্যবহারই সাংগীতিক ধ্বনিতে পরিণত হয়ে তা চর্চার মাধ্যমে কালক্রমে সংগীত বিদ্যায় পরিণত হয়েছে। ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে প্রাচীনকাল থেকে বর্তমান যুগ পর্যন্ত সংগীতের যে ধারাবাহিকতা পাওয়া যায় তাই হচ্ছে সংগীতের ইতিহাস। ইতিহাসের এই ভিত্তির উপর একটি জাতির শিক্ষা ও সংস্কৃতি অনেকাংশে নির্ভরশীল। এ উপমহাদেশে অসংখ্য গুণী সংগীতজ্ঞ জন্মগ্রহণ করেছেন। তাঁদের অসাধারণ প্রতিভা সম্বন্ধে বহু কাহিনী বিদ্যমান। সর্বসাধারণের মাঝে সংগীতের ইতিহাস তুলে ধরার জন্য একদিকে যেমন এইসকল সংগীতজ্ঞেরা নির্ণয় করেছেন সংগীতের ব্যাকরণ, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও দর্শন; অন্যদিকে এর অনুশীলনকারীরা সংগীতের এইসকল উপাদান থেকে সৃষ্টি করেছেন সংগীতের তত্ত্বীয়রূপ।

অতীতে সংগীতের সংবাদ সংরক্ষণের সেরকম সুব্যবস্থা না থাকায় গুণী সংগীতজ্ঞদের সম্বন্ধে তথ্য পাওয়া বেশ কষ্টসাধ্য ছিল। বিভিন্ন ঘরানার শিল্পী হিসেবে এইসকল বিখ্যাত সংগীতজ্ঞরা পরিচিত। যেহেতু সংগীত একটি ক্রিয়াসিদ্ধ বিদ্যা তাই সাংগীতিক উপাদান এক হওয়া সত্ত্বেও শিল্পীর পরিবেশন ও উপস্থাপনের ভিন্নতার কারণে তা বিশেষ মাধুর্য লাভ করে এবং এই মাধুর্য সম্বলিত ভিন্ন কৌশলই শিল্পীর ব্যক্তিগত শৈলীরূপে পরিচিত হয়। সংগীতের সেইসকল শৈলী যখন শিষ্য পরম্পরায় অনুসৃত হয় তখনই সৃষ্টি হয় একটি পরম্পরার বা ঘরানার।

এই গবেষণার মূল বিষয় ঘরানাভিত্তিক হলেও এর প্রথম অধ্যায়ে সংগীতের পরিভাষা ও শাস্ত্রীয় সংগীতের বিভিন্ন ধারা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে ঘরানার সংজ্ঞা, ঘরানার উদ্ভব ও শ্রেণি বিভাগ।

তৃতীয় অধ্যায়ে রয়েছে উল্লেখযোগ্য ঘরানাগুলোর ভৌগোলিক অবস্থান, সাংগীতিক বৈশিষ্ট্য, পৃষ্ঠপোষক বর্গের পরিচয়, সংগীত গুণীদের শিষ্য-পরম্পরাগত পরিচয়, গায়কী ও বংশ তালিকা এবং স্থিরচিত্র।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহারে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে ঘরানার অস্তিত্ব, সৌন্দর্য ও নতুন ঘরানার উদ্ভাবন সম্বন্ধীয় আলোচনা। এ অংশে পাওয়া যাবে সমগ্র আলোচনার সারাৎসার। পরিশিষ্টে রয়েছে ঘরানাভেদে খেয়াল গানের বন্দিশের স্বরলিপি ও গ্রন্থপঞ্জি।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ : সংগীতের পরিভাষা

গীত বাদ্য ও নৃত্য এই তিনটি কলার একত্র সমাবেশকে সংগীত বলা হয়। সহজ অর্থে মনেরভাব কথা ও সুর-তালের মাধ্যমে প্রকাশ করা হচ্ছে গান, যন্ত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা বাজনা এবং অঙ্গভঙ্গী দ্বারা ছন্দ ও মুদ্রার মাধ্যমে ভাবপ্রকাশ হচ্ছে নাচ। আর এই তিনটির সমন্বয়ই হচ্ছে সংগীত। ভারতবর্ষে প্রচলিত এই সংগীত শব্দটি সমগ্র বিশ্বে Music নামে পরিচিত। সংগীত শব্দটির অর্থ এক হলেও এর ভিন্নতা কিন্তু পরিবেশনায়। ভরত মুনির *নাট্যশাস্ত্র* বিষয়ক পুস্তকে নাট্যের উপকরণ হিসেবেও গীত, বাদ্য ও নৃত্য- এই তিনটি কলার উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে Music নামকরণের ব্যাখ্যা করতে ঈশ্বরের অবতারণা করেছেন কোন কোন গুণীজন। গ্রীক দেবতা 'Zeus' এবং দেবী Miremonsy এর কন্যা Muse এর অনুপ্রেরণাতেই মানুষের মাঝে সংগীতের প্রচার হয়েছে বলে এটি Music নামে সকলের কাছে প্রচলিত।[১]

ভারতীয় প্রাচীন গ্রন্থগুলোতে হিন্দু দেবতাদের বর্ণনায় সংগীতের বর্ণনা এসেছে। তখন গান্ধর্বরাই বিশেষভাবে সংগীতের চর্চা করতেন। গান্ধার অঞ্চলের অধিবাসীদের গান্ধর্ব বলা হতো। এঁরাই ছিলেন মার্গ সংগীতে স্রষ্টা। বর্তমানে ভারতের এই অঞ্চল ভিন্ন নামে পরিচিত।

"গন্ধং সংগীত বাদ্যাদিজনিত প্রমোদং অধ্বতি প্রাপ্নোতীতি গন্ধর্ব্বং- গীত বাদ্যের আনন্দ উপভোগ করেন, তাই তাহারা গন্ধর্ব্ব; আর সেই জন্যই সংগীত বিদ্যার নাম 'গান্ধর্ব্ব' বিদ্যা, আর সংগীত বিষয়ক উপবেদের নাম 'গান্ধর্ব্ব বেদ'। এই বেদটি সামবেদের উপবেদ। *সংগীত দামোদর* নামক পুস্তকে আছে যে, মহাদেব ব্রহ্মার নিকটে এই বেদ প্রকাশ করেন, ব্রহ্মা ভরতকে তাহা শিখান, আর ভরত এই মর্ত্ত্যলোকে তাহার প্রচার করেন। সেই অবধি এই পৃথিবীতে সংগীতের চর্চা চলিয়া আসিতেছে। ধর্মের জন্য, সুখের জন্য, অর্থের জন্য সকল উদ্দেশ্যেই ইহার প্রশংসা দেখা যায়; ইহার ফল অতি আশ্চর্য্য। যিনি বিষ্ণুর মন্দিরে গান করেন, সেই গানের যত অক্ষর, তত হাজার বৎসর তিনি ইন্দ্রলোকে বাস করিতে পান। যিনি বিষ্ণুর মন্দিরে বাদ্য করেন, নয় হাজার নয়শত বৎসর তাহার কুবেরের ভবনে থাকিবার উপায় হয়। বিষ্ণুর মন্দিরে যিনি নৃত্য করেন, পুষ্কর দ্বীপে গিয়া তেত্রিশ হাজার বৎসর পরম সুখে তাঁহার কাল কাটে। নারদ বলিয়াছেন যে, বিষ্ণুর সম্মুখে ঘন ঘন করতালি সহকারে নৃত্য করিলে শরীরের পাপপক্ষীগণ উড়িয়া পলায়ন করে।"[২]

Dhaka University Institutional Repository

সংগীতের শাস্ত্রীয় রূপ

আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় ও চতুর্থ শতকে সংগীতের একটি নির্দিষ্ট ও বিধিবদ্ধ রূপরেখা গঠিত হবার পর প্রাচীন সংগীত শাস্ত্রীগণ ভারতীয় সংগীতকে দুটি ভাগে বিভক্ত করেন-যার নাম দেয়া হয় মার্গ সংগীত ও দেশী সংগীত। এর পূর্বে ভারতবর্ষে এই সংগীত গান্ধর্ব নামেই পরিচিত ছিল।

সংগীত রত্নাকর গ্রন্থে গান্ধর্ব সংগীতের বর্ণনায় মার্গ এবং দেশী শব্দের উল্লেখ করা হয়েছে। শাঙ্গদেব এ সম্বন্ধে লিখেছেন- "অনাদিকাল ধরে গুরু-শিষ্য পরম্পরায় গান্ধর্বরা সংগীত অনুশীলন এবং প্রচার করেছে। যা নিয়ত বা গ্রহ, অংশ মূর্ছনাদিযুক্ত মোক্ষপদ ও কল্যাণকর তাকেই গান্ধর্ব বলে। আর বাগ্‌গেয়কারেরা গ্রহ অংশাদি দশ লক্ষণযুক্ত করে যে দেশীয় ও জাতীয় সুর বা রাগগুলিকে অভিজাত শ্রেণিভুক্ত করে নিয়েছিলেন তাদের দেশীয় সংগীত বলে।"[৩]

বর্তমান গবেষণার বিষয়বস্তু যেহেতু ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীত সম্বন্ধীয় তাই মার্গ সংগীতের আলোচনার আগে সংক্ষিপ্ত আকারে দেশীয় সংগীত সম্পর্কে আলোচনা করা আবশ্যক বিবেচনা করি।

দেশী সংগীত সম্বন্ধে জানা যায় যে, যে গানের কোন বিধিবদ্ধ নিয়ম নেই এবং যা বিভিন্নভাবে গাওয়া ও বাজানো যায় তাই দেশী সংগীত। তবে একে লোকসংগীত বলা সংগত হবে না। কারণ গ্রাম্যজীবনের প্রকৃতি ও আনন্দ বেদনার অনুভূতির উপস্থিতি থাকে লোকসংগীতে। তাই শাস্ত্রীয় সংগীত ভিন্ন অন্য সকল আঞ্চলিক সংগীত এই দেশী সংগীত হিসেবে ধরা যেতে পারে। এই দেশী সংগীতের উদ্দেশ্যই হলো মানুষের মনোরঞ্জন করা। দেশী সংগীত সবসময়ই শাস্ত্রসম্মত এবং যুগের সাথে তাল মিলিয়ে পরিবর্তনশীল।

সংগীত জিজ্ঞাসায় রামপ্রসাদ রায় লিখেছেন- "বর্তমান সময়ে যে সংগীত প্রচলিত উহারা সকলেই দেশীয় সংগীত। সুতরাং গোয়ালিয়রের ধ্রুপদ, মথুরার হোরি, বেনারস ও লক্ষ্ণৌ এর ঠুমরী, মনিপুরের মনিপুরী নৃত্য, লক্ষ্ণৌ-এর কথক নৃত্য প্রভৃতি সমস্তই দেশী সংগীতের অন্তর্গত।"[৪]

*ভরতের নাট্যশাস্ত্রে*ও দেশী রাগের উল্লেখ আছে। পঞ্চম শতাব্দী থেকে দেশী সংগীতকে উচ্চাঙ্গ সংগীতের অন্তর্ভুক্ত করার যে চেষ্টা দেখা যায় তার উল্লেখ পাওয়া যায় *মতঙ্গকৃত বৃহদ্দেশী* গ্রন্থে। এই গ্রন্থে তিনি গানের স্বর সংখ্যার ব্যবহার অনুযায়ী দেশী ও মার্গ সংগীতের পার্থক্য নির্ণয় করেছেন এবং দেশী রাগগুলির নাম দিয়েছেন ভাষারাগ বা অঙ্গরাগ। এই দেশী রাগগুলির মধ্যেই মতঙ্গ প্রয়োজনমত সুর সংযোজন করে তা মার্গ শ্রেণিভুক্ত করেছেন। এইরূপ ছিয়াত্তরটি রাগের গানের উল্লেখ মিলে তাঁর *বৃহদ্দেশী* গ্রন্থে।

Dhaka University Institutional Repository

মার্গ শব্দের অর্থ অন্বেষণ বা পথ। একে সংগীতের খাঁটি শাস্ত্রীয় রূপও বলা যেতে পারে। পূর্বে মার্গ সংগীতের কোন নির্দিষ্ট গায়নপদ্ধতি প্রচলিত ছিল কিনা তা জানা যায় না। ধ্রুপদ পূর্বে দেশী সংগীতের আওতাভুক্ত হলেও বর্তমানে তা মার্গ সংগীতের অন্তর্ভুক্ত।

প্রসঙ্গত স্মরণ করা যায় ধুর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য- "লোকসংগীতের প্রভাবের সঙ্গে ধ্রুপদ প্রচলনের যোগ আছে। সে যোগ আন্তরিক। লোকসংগীতে তানের অভাব, ধ্রুপদেও তান নেই; লোকসংগীত অর্থমূলক, অর্থও আবার সাধারণত আধ্যাত্মিক; রূপ তার কবিতার, রস তার অনুভূতির।"[৫]

আমরা যাকে শাস্ত্রীয় সংগীত বা মার্গ সংগীত বলি ইংরেজিতে তা Classical Music নামে পরিচিত। পূর্বে সংগীতের উপস্থিতি শুধুমাত্র ঈশ্বর আরাধনার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও কালের বিবর্তনে ও মানুষের রুচির পরিবর্তনের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সংগীতকে মনোগ্রাহী করে ঈশ্বরের পাশাপাশি সর্বসাধারণের কাছেও পরিবেশন করার প্রচলন শুরু হয়। এই পদ্ধতিই ধীরে ধীরে শাস্ত্রের আওতাভুক্ত হয়ে নিয়মবিধি অনুযায়ী পরিবেশনের সিদ্ধান্তে পরিণত হয় যা পরবর্তী কালে শাস্ত্রীয় সংগীত নামে আখ্যা লাভ করে।

প্রাচীন মার্গ বা দেশী সংগীতের রূপ কি ছিল তার সঠিক তথ্য পাওয়া না গেলেও যেহেতু বর্তমান সংগীতজগৎ শাস্ত্রীয়, উপশাস্ত্রীয় এবং আধুনিক সংগীত নিয়ে পরিব্যাপ্ত তাই এভাবে ভাগ করা যেতে পারে যে- ধ্রুপদ-খেয়াল-সাদরা শাস্ত্রীয়, টপ্পা-ঠুমরী-হোরি ও রাগ প্রধান গান উপশাস্ত্রীয় এবং বাকি সব গান সুগম বা আধুনিক। মার্গ সংগীতের সৃষ্টি গান্ধর্ব সংগীতের উপাদান নিয়েই। বৈদিক ও লৌকিক এই দুই ভাগে প্রধানত ভারতীয় সংগীত বিভক্ত। প্রাচীনকালে বিভিন্ন বৈদিক শাখার সামগান যা বিভিন্ন স্বরে ও ছন্দে গাওয়া হতো তা-ই বৈদিক সংগীত নামে ছিল প্রচলিত। এই বৈদিকের পরই আসে ক্ল্যাসিকাল যুগ। গান্ধর্ব যুগের পরিচয় বৈদিক যুগের পূর্বেই পাওয়া যায়। কিছু বৈদিক সংগীত থেকে এবং অধিকাংশই গান্ধর্ব সংগীত থেকে মার্গ সংগীতের সৃষ্টি। এই গান্ধর্ব গানের যারা স্রষ্টা ছিলেন তাঁদের মধ্যে নারদ, তুম্বুরু প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। চারবেদ ও বিভিন্ন শ্রেণির সামগানের উপাদান থেকে *ব্রহ্মভরতম* নামক যে গ্রন্থটি রচিত হয় তাতে নাট্যের প্রয়োজনে সংগীতের আলোচনা করা হয় আর এই গানগুলো ছিল নাট্যগীতির আকারে। এই নাটকের গানের জন্য স্বর, তাল ও পদের সমন্বয়ে যে সংগীত রচনা করা হয় তা 'গান্ধর্ব' নামে পরিচিতি লাভ করে।[৬]

"গন্ধর্বরা ভারতের উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে গান্ধার দেশের অধিবাসী। তারা ছিল সংগীতপ্রিয় ও সংগীতসিদ্ধ জাতি। আসলে গান্ধর্বগানের সার্থকতা গন্ধর্বজাতিকে নিয়ে নয়, গন্ধর্বজাতি উপলক্ষ্য মাত্র। ভরত গান্ধর্বগানের লক্ষণ বলেছেন: 'স্বরতালপদাশ্রয়ম্', অর্থাৎ স্বর, তাল ও পদযুক্ত গানই 'গান্ধর্ব' নামে

Dhaka University Institutional Repository

অভিহিত। স্বর, তাল ও পদ কিন্তু নৃত্য, গীত ও বাদ্য নয়। সেজন্য স্বর, তাল ও পদ বলতে কি বোঝায় সে সম্বন্ধে ভরত বলেছেন,-

(১) 'স্বর' বলতে শ্রুতি, গ্রাম, মূর্ছনা, স্থান, সাধারণ, আঠারো জাতি বা জাতিরাগ, চারবর্ণ, অলংকার, ধাতু, আবাপ, নিষ্ক্রাম, বিক্ষেপ, প্রবেশক ও শম্যা, তাল, সন্নিপাত, পরিবর্ত প্রভৃতি।

(২) 'তাল' বলতে শম্যা, তাল, সন্নিপাত, পরিবর্ত, বস্তু, মাত্রা, বিদারী, অঙ্গুলি, মতি, প্রকরণ, গানের অবয়ব প্রভৃতি একুশটি।

(৩) 'পদ' বলতে স্বর ও ব্যঞ্জন-বর্ণ, সন্ধি, বিভক্তি, আখ্যাত, উপসর্গ, নিপাত, ছন্দ, বৃত্ত, জাতি প্রভৃতি।"[৭]

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, বৈদিক ও গান্ধর্বগানকে অনুসরণ করে যে অভিজাত সংগীতের সৃষ্টি হয় পরবর্তী কালে তা-ই মার্গ সংগীত নামে পরিচিতি লাভ করে। বিশেষ নিয়মানুসারে যেসকল রাগ পরিবেশন করা হয় তাকেই মার্গ সংগীত বলে। বর্তমানে প্রচলিত উচ্চাঙ্গ সংগীত মার্গ সংগীতের অন্তর্ভুক্ত।

তথ্যসূত্র

১) মীনাক্ষী বিশ্বাস, *পরম্পরা*, সপ্তর্ষি প্রকাশন, কলিকাতা: ২০১৩।

২) উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী, *ভারতীয় সংগীত*, সূত্রধর, কলকাতা:২০১৩, পৃ: ৪৩-৪৪।

৩) মীনাক্ষী বিশ্বাস, *পরম্পরা*, সপ্তর্ষি প্রকাশন, কলিকাতা: ২০১৩, পৃ:২৪।

৪) মীনাক্ষী বিশ্বাস, *পরম্পরা*, সপ্তর্ষি প্রকাশন, কলিকাতা:২০১৩, পৃ:২৪।

৫) মীনাক্ষী বিশ্বাস, *পরম্পরা*, সপ্তর্ষি প্রকাশন, কলিকাতা: ২০১৩, পৃ:২৭।

৬) মীনাক্ষী বিশ্বাস, *পরম্পরা*, সপ্তর্ষি প্রকাশন, কলিকাতা: ২০১৩।

৭) স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, *রাগ ও রস*, স্বামী অশেষানন্দ, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলকাতা: ১৯৫১, পৃ: ৯৮।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : সংগীতের বিভিন্ন ধারা

সংগীতের প্রধান চারটি ধারা হলো ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা ও ঠুমরী। আমাদের এই উপমহাদেশে মার্গ ও দেশী সংগীতের যে কয়টি ধারা প্রচলিত রয়েছে তাদের ভিত্তি ধ্রুপদ বলে মনে করা হয়।

ধ্রুপদ

ধ্রুপদের সঙ্গে রাজা মানসিংহ তোমরের নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ধ্রুপদ গানের ভিত্তি তৈরি ও এর রীতিসৃষ্টির মাধ্যমে নতুন সংযোজন করার পাশ্চাতে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। তবে অনেকে মনে করেন ধ্রুপদের পূর্বে 'প্রবন্ধ' নামে যে গানের প্রচলন ছিল তার অনুকরণেই ধ্রুপদ গানের সৃষ্টি এবং বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ গোপাল নায়ক ও তাঁর সমসাময়িক বৈজুবাওরার মাধ্যমেই সেই ধ্রুপদ গানের প্রচলন শুরু হয়।

রাজা মানসিংহ তোমরই ধ্রুপদ গানের স্রষ্টা বলে অধিক স্বীকৃত। মানসিংহের সময় ধ্রুপদের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার ঘটলেও এর নবজন্ম হয় মোঘল যুগে। বিজাপুর, বিদর, আহম্মদনগর, গোলকুণ্ডাসহ উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে সংগীতের ব্যাপক প্রসার ঘটে মোঘল যুগে। মোঘল সম্রাটদের মধ্যে সম্রাট আকবরের রাজত্বকাল (১৫৫৬-১৬০৫ খ্রি:) হচ্ছে ভারতীয় সংগীতের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। তাঁর সময়েই নতুন নতুন সংগীত ধারার সৃষ্টি হয় এবং ভারতীয় সংগীত উন্নতি লাভ করে। এর মধ্যে ধ্রুপদ অন্যতম। ধ্রুপদ হচ্ছে রাগভিত্তিক পরিবেশনা। অতি বিলম্বিত লয়ে ধ্রুপদ গান গীত হয়। মধ্যযুগীয় ধ্রুপদের কথা ও স্বরগ্রাম ছিল অত্যন্ত সহজ ও সরল। কণ্ঠের বলিষ্ঠ ও সম্যক প্রকাশ এবং নিখুঁত উচ্চারণ ধ্রুপদে অপরিহার্য।

ধ্রুপদে মোট চারটি তুক আছে। এই চারটি তুক অস্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ নামে পরিচিত। মধ্যযুগে ধ্রুপদের চারটি বাণীর উল্লেখ পাওয়া যায়। এই চারটি বাণী হলো- (১) গওহর বাণী, (২) ডাগর বাণী, (৩) খাণ্ডার বাণী, (৪) নওহর বাণী। সম্রাট আকবরের দরবারে চারজন গুণী ছিলেন এই চার বাণীর উদ্ভাবক। তাঁরা হলেন তানসেন, ব্রিজচন্দ্র, রাজা সমোখন সিংহ ও শ্রীচন্দ্র। তানসেন গোয়ালিয়র নিবাসী ছিলেন। গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁর জন্ম। তিনি বৃন্দাবনের স্বামী হরিদাসের শিষ্য ছিলেন। ব্রিজচন্দ্র ছিলেন দিল্লীর নিকটবর্তী ডাগুর গ্রামের অধিবাসী। ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। সমোখন সিংহ খাণ্ডার নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন। তিনি জাতিতে রাজপুত ছিলেন এবং অত্যন্ত মধুর বীণা বাজাতেন। জাতিতে রাজপুত শ্রীচন্দ্র নৌহার নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন। আকবরের দরবারের এই চার গুণী চারটি বাণীতে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তানসেন গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ হওয়ায় তাঁর বাণীর নাম গওহর বাণী। ব্রীজচন্দ্রের বাসস্থানের নাম অনুযায়ী তাঁর বাণীর নাম হয় ডাগর বাণী। বিখ্যাত বীণাবাদক সমোখন সিংহ

Dhaka University Institutional Repository

খাণ্ডারের অধিবাসী ছিলেন বলে তাঁর বাণীর নাম হয় খাণ্ডারবাণী। সমোখন সিংহ তানসেনের কন্যাকে বিবাহ করায় তাঁর নতুন নাম হয় নবাৎ খাঁ। রাজপুত শ্রীচন্দ্র নৌহারের অধিবাসী হওয়ায় তাঁর বাণীর নাম হয় নওহার বাণী। ধ্রুবপদ কথাটি থেকে ধ্রুপদ নামটির প্রচলন হয়েছে বলে এইশৈলীর গানের ভাষায় অধ্যাত্মবাদের বর্ণনার উল্লেখ পাওয়া যায়। নোম, তোম ইত্যাদি বাণীর দ্বারা এইশৈলীর গানের আলাপ করা হয়। ধ্রুপদের প্রকৃতি ধীর ও গম্ভীর হয়ে থাকে। তালের ক্ষেত্রেও পাখোয়াজে চারতাল, ঝাপতাল, সুলতাল ইত্যাদি তালের সঙ্গত করা হয়ে থাকে। ধ্রুপদে তানের ব্যবহার করা হয় না তবে দ্বিগুন, তিনগুন, চৌগুন, আড়, বাঁট ও উপজ ইত্যাদি লয়কারীর ব্যবহার করা হয়। ধ্রুপদের চারটি বাণীর আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তানসেন রচিত যে ধ্রুপদ তা গওহর বাণী। এই গওহর বাণী শান্তরসের উদ্দীপক, এই বাণীর ধ্রুপদের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এগুলো ধীরগতি সম্পন্ন, স্পষ্ট, গম্ভীর ও শান্তরস প্রধান। ব্রীজচন্দ্র রচিত ধ্রুপদ যা ডাগর বাণী নামে খ্যাত তার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো সারল্য ও লালিত্য। এর গতি অত্যন্ত সহজ ও সরল। নৌবৎ খাঁ বা সমোখন সিংহ রচিত ধ্রুপদ যা খাণ্ডারবাণী নামে পরিচিত তার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এর গতি অতি বিলম্বিত ও তীব্র রস-উদ্দীপক। এই বাণীর স্বরগুলো সরলভাবে না দেখিয়ে বক্রভাবে দেখানো হয়ে থাকে। অন্যদিকে নওহার বাণী অত্যন্ত রসোদ্দীপক এবং গতি খানিকটা দ্রুত। এক সুর থেকে দু'তিনটি সুর অতিক্রম করে পরবর্তী সুরে যাওয়া এর বৈশিষ্ট্য। খেয়াল গানে যেমন ঘরানার ব্যবহার ছিল তেমনি ধ্রুপদের ঘরানাকে বাণী নামে আখ্যায়িত করা হতো। গুরু-শিষ্য পরম্পরায় এ গান শেখানো হতো বলে শিষ্যের সংখ্যাও ছিল কম। ফলে ধ্রুপদ গানের প্রসারেরও তেমন সুযোগ ছিল না। আর এই সীমাবদ্ধতার কারণে যখন এর উত্তরসূরীদের কাছে ধ্রুপদ পৌঁছায় তখন তা ছিল প্রায় লুপ্ত। সেইকারণে বর্তমান কালে ধ্রুপদ গানের চর্চা খুবই সীমিত।[১]

খেয়াল

খেয়াল শব্দের অর্থ কল্পনা। এটি একটি ফারসি শব্দ। আমীর খসরুর মাধ্যমে খেয়াল পারস্য দেশ থেকে ভারতে প্রতিষ্ঠা লাভ করে বলে কথিত আছে। তাই অনেকে খেয়াল গানকে Foreign Musical Style বলে থাকেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আমীর খসরু ভারতে এসে এই সংগীতের প্রচার ও প্রসার ঘটান। তবে এ নিয়ে মতভেদও আছে।

"ভারতের মত ধর্মভীরু দেশে একজন মুসলমান বাইরে থেকে এসে তাঁদের দেশের সংগীতকে এদেশে স্থাপন করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তার প্রচার প্রসার ঘটে গেল ভারতবাসীর মধ্যে– এমন ভাবা যায় না। শুধু তাই নয়, খেয়াল যদি পারস্য দেশ বাহিতই হয় তবে আমাদের সংগীতের সঙ্গে ওদের আদ্যপান্ত মিল থাকা উচিত। (বিশেষত খেয়াল গায়কীর।) কিন্তু তেমনটি শোনা যায় না। শুধু তাই নয়– সংগীতের সঙ্গে

Dhaka University Institutional Repository

মনের সম্বন্ধ এতই গভীর যেখানে বাইরের কোন কৃষ্টি এত নিবিড়ভাবে বিশেষ করে শাস্ত্রীয় মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে বলে মনে হয় না। ঠিক যেভাবে গান্ধর্ব- মার্গ- প্রবন্ধ- ধ্রুবপদ ইত্যাদির সৃষ্টি হয়েছে বিবর্তন এবং নব নব কল্পনার মধ্য দিয়ে, ঠিক সেইভাবে খেয়ালও জায়গা করে নিয়েছে।"[২]

যেহেতু খেয়ালের অর্থ কল্পনা তাই এইশৈলীর গানে শিল্পী তার নিজ কল্পনানুযায়ী স্বাধীনভাবে গান করার সুযোগ পায়। নানাবিধ তান, বিস্তার, বাঁট সহযোগে যেকোন রাগের নিয়মবিধি অনুযায়ী স্বাধীনভাবে গাওয়ার শৈলীকেই খেয়াল বলে। ধ্রুপদ বা খেয়াল উভয়তেই ঈশ্বরের বন্দনার উল্লেখ পাওয়া যায়। খেয়ালের ভাষা ব্রীজ বা হিন্দি হয়ে থাকে। আমীর খসরুর পর খেয়াল গানের আবিষ্কারে যার নাম আসে তিনি হলেন জৌনপুরের সুলতান হুসেন শাহ সর্কী। তিনি অত্যন্ত সংগীতপ্রেমী ছিলেন। পঞ্চদশ শতকে তিনি বড় খেয়ালের প্রচার ও প্রসার করেন এবং গায়কদের উৎসাহিত করেন খেয়াল গান গাওয়ার জন্য। পরবর্তী কালে অষ্টাদশ শতকে সম্রাট মোহম্মদ শাহর দরবারের প্রসিদ্ধ বীণকার নেয়ামৎ খাঁ (সদারঙ্গ) খেয়াল গানকে ভিন্নরূপ দেন। তিনি তাঁর দু'জন শিষ্যকে খেয়াল গানে তালিম দিয়ে সম্রাটের দরবারে সংগীত পরিবেশন করান। নতুন শৈলীর এই খেয়াল গানে সভাসদসহ সম্রাট অত্যন্ত প্রসন্ন হন এবং নিয়ামত খাঁকে সদারঙ্গ উপাধিতে ভূষিত করেন।

খেয়াল গান দুই ভাগে বিভক্ত- বিলম্বিত খেয়াল (বড় খেয়াল) ও দ্রুত খেয়াল (ছোট খেয়াল)। ভক্তিমূলক, বীররসাত্মক, শৃঙ্গার রসাত্মক- সব বিষয়বস্তুই খেয়ালে দেখতে পাওয়া যায়। বড় খেয়াল বা বিলম্বিত খেয়ালের চলন ধীর ও গম্ভীর হয়। বিস্তার, সরগম, তান, বোলতান ইত্যাদির সহযোগে এই খেয়াল গাওয়া হয়। এতে বিলম্বিত ত্রিতাল, একতাল, ঝুমড়া, আড়াচৌতাল ইত্যাদি তাল সঙ্গত করা হয়ে থাকে। অন্যদিকে ছোট খেয়াল বা দ্রুত খেয়ালের চলন অপেক্ষাকৃত দ্রুত। এতেও বিলম্বিত খেয়ালের মত তান, আলাপ, বিস্তার, বোলতান ইত্যাদি গাওয়া হয় আর দ্রুতত্রিতাল, একতাল, ঝাঁপতাল ইত্যাদি তাল সঙ্গত করা হয়। উভয় পদ্ধতির খেয়াল গানেই তবলা যন্ত্র বাজানো হয়ে থাকে।

খেয়াল গানের মূল বৈশিষ্ট্য হলো এইশৈলীর গান প্রত্যেক গায়ক তার নিজের মনের অনুভূতি, উচ্ছ্বাস ও আবেগকে রাগের স্বর বিস্তারের মাধ্যমে প্রকাশ করার স্বাধীনতা পায়। খেয়ালে স্থায়ী ও অন্তরা থাকে। আলাপ, স্বর-বিস্তার, বোলতান, অলংকার, লয়কারী, তান ইত্যাদির সহযোগে খেয়াল গাওয়া হয়। লয়ের ক্ষেত্রেও ভিন্নতা আছে। বড় খেয়ালে যে লয় থাকে তার চেয়ে দ্বিগুণ লয়ে ছোট খেয়াল গাওয়া হয়। সাধারণত গম্ভীর ও শান্ত প্রকৃতির রাগে বড় খেয়াল এবং চঞ্চল প্রকৃতির রাগে ছোট খেয়াল গাওয়া হয়।

Dhaka University Institutional Repository

ঠুমরী

ঠুমরী গানের প্রচলনের সঠিক সময় না পাওয়া গেলেও মনে করা হয় লক্ষ্ণৌর নবাবদের দরবার থেকেই ঠুমরী গানের উৎপত্তি এবং ওস্তাদ সাদিক আলী খাঁ এর উদ্ভাবক। তবে এ নিয়ে মতভেদ আছে। অনেকে মনে করেন ঠুমরীর আবিষ্কারক গোলাম নবী। আবার অনেকের ধারণা টপ্পা গানের প্রবর্তক শোরী মিঞার ঘরানার গায়কেরা এইশৈলীর গান সৃষ্টি করেছেন। লক্ষ্ণৌর নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ্ ঠুমরীর একজন একনিষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি 'আখতার পিয়া' ছদ্মনামে অনেক ঠুমরী রচনা করেছেন। এছাড়া কদর পিয়া, ললন পিয়া প্রভৃতি ছদ্মনামের আড়ালে অনেক গুণীজন ঠুমরী রচনা করেছেন। প্রধানত দুটি অঙ্গে ঠুমরী গাওয়া হয়– পূর্বী ও পাঞ্জাব অঙ্গ। পাঞ্জাবী ঠুমরী গায়কদের মধ্যে টপ্পার প্রভাব বেশি পরিলক্ষিত হয়। বেনারস ও লক্ষ্ণৌতে যে ঠুমরী গাওয়া হয় তাকে পূর্বী অঙ্গের ঠুমরী বলে। পূর্বী ঠুমরী গানে মধুরতা ও সুরের সূক্ষ্মতা বেশী দেখতে পাওয়া যায়; অপরদিকে পাঞ্জাবী ঠুমরীতে টপ্পার প্রভাবের পাশাপাশি এতে তানের আধিক্য বেশি পরিলক্ষিত হয়। এইগানে দুটি করে তুক বা বিভাগ থাকে– স্থায়ী ও অন্তরা। এইশৈলীর গানে রাগের বিশুদ্ধতার উপর তেমন জোর দেওয়া হয় না। গানের বাণী অল্প হয়। ভাবের প্রতি বেশি মনোযোগ দেওয়া হয় বলে ঠুমরী গানে বিভিন্ন রাগের মিশ্রণ দেখা যায়। দক্ষ শিল্পীরা এতে নানা রাগের মিশ্রণ ঘটান। এইগানের বিষয়বস্তু প্রেমভিত্তিক এবং শৃঙ্গার রসাত্মক। খট্কা, মূর্কী, অলংকার, ছোট তান প্রভৃতি প্রয়োগ করে হালকা রাগ যেমন ভৈরবী, পীলু, তিলক কামোদ, দেশ, ঝিঁঝিট, খাম্বাজ, কাফী, তিলং, গাড়া ইত্যাদি রাগে এবং যৎ, দীপচন্দী, ত্রিতাল প্রভৃতি তালে তবলা যন্ত্রসহযোগে এইশৈলীর গান গাওয়া হয়ে থাকে। ঠুমরী গান প্রথমে বিলম্বিত লয়ে শুরু করে শেষাংশে দ্রুত কাহারবা অথবা ত্রিতালে গাওয়া হয়ে থাকে। একে বলা হয় লগ্গী। ঠুমরীর আরেকটি প্রকার হলো দাদ্রা। তবে দাদ্রা ঠুমরী ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের দরুণ এইশৈলীর ঠুমরী শুধু 'দাদ্রা' নামেই পরিচিত। যন্ত্রসংগীতে বাজানোর সময় একে 'ধুন' বলা হয়। বড়ে গুলাম আলী, বরকত আলী, নজাকৎ আলী, সলামৎ আলী প্রভৃতি সংগীত গুণী ঠুমরী গানের জনপ্রিয়তার জন্য সমাদৃত। এছাড়া রসুলান বাঈ, গিরিজা দেবী, সিদ্ধেশ্বরী দেবী, বেগম আখতার, শোভা গুর্তু, নির্মলাদেবী, লক্ষ্মী শংকর, পারভীন সুলতানা, হীরাদেবী মিশ্রা প্রমুখ শিল্পী ঠুমরীর জন্য বিখ্যাত হয়েছেন। ঠুমরী ক্ষুদ্র গীতের পর্যায়ভুক্ত গায়নশৈলী হলেও এই গান গাওয়া সহজসাধ্য নয়। দক্ষ গায়ক ভিন্ন এইশৈলীর গান ও কাজের সূক্ষ্মতা ফুটিয়ে তোলা প্রায় অসম্ভব। বর্তমানে প্রায় সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারতে এই গান অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।[৩]

Dhaka University Institutional Repository

টপ্পা

টপ্পা একটি হিন্দি শব্দ। এর অর্থ লম্ফ অর্থাৎ লাফ। অন্যভাবে দেখতে গেলে একে সংক্ষেপ বলতে পারি। টপ্পার উদ্ভাবক সম্বন্ধে মতভেদ থাকলেও অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি কোন একসময়ে এইশৈলীর গানের উদ্ভব হয়েছে বলে মনে করা হয়। এ প্রসঙ্গে লক্ষ্ণৌর কাওয়াল মিঞা গোলাম রসুলের পুত্র গোলাপ নবী শোরীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি এই শৃঙ্গার রসাত্মক সংগীতকে পরিমার্জিত করে তা সর্ব সাধারণের কাছে উপস্থাপিত করেছিলেন। তবে টপ্পা উদ্ভবের পেছনে লোকসংগীত রয়েছে এমনটাও কেউ কেউ মনে করেন। তাদের ধারণা মধ্য এশিয়া থেকে একদল যাযাবর যখন পাঞ্জাবে এসে বসবাস শুরু করেন তাদের মধ্যে একজন উটচালক ছিলেন শোরী মিঞা, সেই শোরী মিঞাই এইশৈলীর গানের উদ্ভাবক। উট চালনার সময় উঁচুনিচু পথে গলার স্বরও উঁচুনিচু হতো এবং ভেঙ্গে যেত যা পরবর্তী কালে টপ্পার একটি ঢং এ পরিণত হয়। সেইসময় পাঞ্জাবের উটচালকেরা যে গান গাইত তা লোকগীতি হিসেবে গণ্য হতো। সেই গানে তেমন মিষ্টতা ছিল না। পরবর্তী সময়ে টপ্পাগান উট চালকদের কণ্ঠ থেকে সংগীত শিল্পীদের কণ্ঠে স্থান করে নেয়। ফলে গানের ঢং ও ধারাতেও পরিবর্তন সাধিত হয়। আবার অনেকে মনে করেন প্রাচীন 'বেসরা' সংগীত রীতি থেকে টপ্পার সৃষ্টি। এতে বিশেষ ধরনের গিটকিরি যুক্ত করা হয়। এইশৈলীর গান খেয়ালের মত সব রাগে গীত হয় না। এই গানে দুটি ভাগ বা তুক রয়েছে– স্থায়ী ও অন্তরা। টপ্পা সংক্ষিপ্ত শৈলীর গান হওয়ায় সহজ ও সরল রাগেই সাধারণত গীত হয়। বিশেষ করে খাম্বাজ, কাফী এবং ভৈরবী ঠাটের রাগ গুলিতে টপ্পাগান গাওয়া হয়ে থাকে। দীপচন্দী, ত্রিতাল, টপ্পা ইত্যাদি তাল তবলা তালযন্ত্রে সঙ্গত করা হয়। বাংলার মাটিতে টপ্পার দুইজন বিখ্যাত শিল্পীর গান সর্বজনবিদিত; তন্মধ্যে একজন রামনিধি গুপ্ত যার গানকে আমরা নিধুবাবুর টপ্পা বলি আর অপরজন হলেন রামপ্রসাদ সেন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই শৈলীর গান খুব পছন্দ করতেন, যার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর সুরারোপিত বেশ কয়েকটি গানে।

টপ্পা সংগীতের মধ্যে শাস্ত্রীয় রূপ সংযোজন করে একে বহুল প্রচলিত ও প্রসারিত করেছিলেন প্রসিদ্ধ সংগীতজ্ঞ শোরী মিঞা। তিনি তাঁর স্ত্রী শোরীর নামে ভণিতা দিয়ে গান গাইতেন, যা পরবর্তী সময়ে শৌরী মিঞার টপ্পা নামে পরিচিতি লাভ করে।[৪]

তথ্যসূত্র

১) উৎপলা গোস্বামী, *ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত*, সলিল সাহা, ২০ কেশব স্ট্রীট কলকাতা: ১৩৯৭।

২) মীনাক্ষী বিশ্বাস, পরম্পরা, সপ্তর্ষি প্রকাশন, কলিকাতা: ২০১৩, পৃ:২৮।

Dhaka University Institutional Repository

৩) উৎপলা গোস্বামী, *ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত*, সলিল সাহা, ২০ কেশব স্ট্রীট কলকাতা: ১৩৯৭।

৪) প্রাগুক্ত।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম পরিচ্ছেদ : ঘরানার সংজ্ঞা

ঘরানা একটি হিন্দি শব্দ। এর অর্থ ঘর, গৃহ বা পরিবার। তবে সংগীতে এটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত। ঘরানার কিছু সাংগীতিক বিশেষত্ব রয়েছে। ঘরানা অর্থ পরিবার হলেও তা কেবল আত্মীয়-পরিজন নিয়েই গঠিত হয় না। এর মধ্যে অনাত্মীয় শিষ্যবর্গও অন্তর্ভুক্ত। ধ্রুপদ গানের মত খেয়ালের শ্রেণিবিন্যাসের পর যে ঘরানার সৃষ্টি হয় তার মধ্যেও যথেষ্ট পার্থক্য দেখা যায়। সংগীত গুরু কোনো নির্দিষ্ট স্থানে যে ঐতিহ্য স্থাপন করেন তিনি সেই ঐতিহ্যের ঘরানা প্রবর্তক রূপে গণ্য হন। যেমন আগ্রা ঘরানার খেয়াল ও কিরানা ঘরানার খেয়াল। পরিবেশন পদ্ধতির ভিন্নতা এই দুই ঘরানাকে আলাদা করেছে। একই রাগ প্রত্যেকটি ঘরানায় রাগের শুদ্ধতা বজায় রেখে ভিন্ন গায়নশৈলীতে পরিবেশিত হয়।

ঘরানার অন্যতম লক্ষণ হচ্ছে এর ধারাবাহিকতা। শুধুমাত্র কিছু শিষ্য গঠনেই ঘরানা স্থাপিত হয় না। একটি ঘরানার প্রতিষ্ঠার জন্য কয়েকটি প্রজন্ম দরকার। ঘরানা সৃষ্টিতে অঞ্চলের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ। গুরু গৃহে ঘরানার প্রবর্তন হয় বলে অধিকাংশ ঘরানাই গুরু গৃহের স্থানের নামে অভিহিত। যেমন: গোয়ালিয়র, আগ্রা, রামপুর, বেতিয়া, বিষ্ণুপুর, গয়া, লক্ষ্ণৌ (তবলা), জয়পুর(সেতার) বারানসী (তবলা), ইন্দোর (বীণকার), ফররুখাবাদ (তবলা) ইত্যাদি। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যায় গুরুর নামানুসারেই সেই ঘরানার নামকরণ হয়েছে, যেমন- প্রসদ্দু মনোহর ঘরানা, নিয়ামতউল্লাহ খাঁ ঘরানা, এনায়েত খাঁ'র ঘরানা প্রভৃতি। সকল ঘরানাতেই আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে বৈশিষ্ট্যের আলোকে শিষ্য সম্প্রদায় গড়ে ওঠে আর তাই ঘরানা অন্তর্গত শিল্পী-সাধকদের সংগীতজীবনও সুশৃঙ্খল হয় ও এর ভিত্তি হয় সুবদ্ধ। বিভিন্ন ঘরানার সংগীত সাধকেরা নিজের সাধনা দ্বারা তাদের নিজ নিজ ঘরানাকে সমৃদ্ধ করেছেন। ঘরানার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্যই যেহেতু রাগসংগীত পরিবেশনের একটি নিজস্ব ধরন- তাই অনুশীলন, ধৈর্য, একাগ্রতা ও নিষ্ঠার দ্বারা সংগীত সাধনায় নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিবেদিত করে গুণী সংগীতজ্ঞরা একেকটি ঘরানার জন্ম দিয়ে তার প্রচার ও প্রসার ঘটিয়েছেন। ঘরানার মূল কথা হলো গায়ন পদ্ধতির বিশেষ রীতি। সুর, তাল সমন্বয়ে রাগ পরিবেশনের বৈচিত্র্যই ঘরানার সৃষ্টি করেছে। কোন কোন ক্ষেত্রে রাগরূপ বজায় থাকলেও বিভিন্ন ঘরানার গায়কীর মধ্যে স্বর ব্যবহারে পার্থক্য দেখা যায়।[১]

খেয়াল গায়নে কর্ণ, খট্‌কা, মুর্কী, গমক, মীড়, বিভিন্ন প্রকারের তান, সরগম ইত্যাদির সমন্বয়ে শিল্পী তার সংগীত পরিবেশন করেন। একই রাগ ঘরানা ভেদে ভিন্ন স্বাদের আস্বাদ দেয়। প্রত্যেকটি ঘরানা নিজ নিজ মহিমায় উজ্জ্বল। ঘরানা ভেদে আরো কিছু বিষয় লক্ষণীয় যেমন- গমকের প্রাধান্য বা স্বল্পতা, অলংকারের প্রাধান্য বা কম ব্যবহার, মীড়ের কাজের অধিক ব্যবহার, বাঁটের উপস্থিতি, রাগ-রাগিণী

Dhaka University Institutional Repository

পরিবেশনে কোন বিশেষ স্বরের বিশেষভাবে ব্যবহার অথবা কোন বিশেষ স্বর বর্জন ইত্যাদি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে সনাতন রাগিণী বিন্যাসের ক্ষেত্রে মালকোষ রাগে পঞ্চম স্বর বর্জিত হলেও পাতিয়ালা ঘরানার ওস্তাদ বড়ে গুলাম আলী খাঁ মালকোষ রাগে পঞ্চম স্বর ব্যবহার করেও তিনি ঐ রাগের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে বিভিন্ন ঘরানায় রাগের স্বর পরিবর্তন করে সনাতন রাগিণী বিন্যাসের ক্ষেত্রে নতুনত্ব আনার চেষ্টা করে রাগ পরিবর্তন করা হয় বা নতুন রাগ সৃষ্টি করা হয়। যেমন রাগ বিভাস। এই রাগে রে ও ধ স্বর কোমল। প্রচারে শুদ্ধ রে ও ধ যুক্ত অথবা কোমল রে ও শুদ্ধ ধ যুক্ত বিভাস রাগও আছে। রে ও ধ শ্রুতির পরিবর্তন করে সংগীতজ্ঞরা তিন চার রকমের বিভাস রাগ গাইতেন যার মধ্যে একটি রাগের নাম দেশকার। আবার ললিত রাগ গাওয়ার সময় কোন কোন ঘরানার শিল্পীরা শুদ্ধ ধৈবত আবার কেউ কোমল ধৈবত ব্যবহার করেছেন। এতে করে একই রাগের ঠাটেরও পার্থক্য হয়ে যায়।[২]

ঘরানার ভেদে বিভিন্ন গোঁড়ামীও লক্ষ করা যায় যেমন, গোয়ালিয়র ঘরানায় ঠুমরী গাওয়া নিষিদ্ধ। আবার সেনী ঘরানার যারা বাদ্যযন্ত্রী তাদেরও কণ্ঠসংগীতের তালিম নেয়া অপরিহার্য। আঞ্চলিকতার দরুণ ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন ঘরানার কেন্দ্রস্থল। যেমন– আগ্রা, রামপুর, গোয়ালিয়র ইত্যাদি। তবে শুধুমাত্র অঞ্চলের বাসিন্দা হলেই কেউ ঐ ঘরানার শিল্পী হয়ে যায় না। ঘরানা নির্ভর করে গুরুর ঘরানা অনুসারে। কেউ যদি গোয়ালিয়র বসবাস করেও আগ্রা ঘরানার সংগীত রপ্ত করেন তবে তিনি গোয়ালিয়রের বাসিন্দা হওয়া সত্ত্বেও আগ্রা ঘরানাদার বলে বিবেচিত হবেন।

এভাবেই ঘরানা সৃষ্টির ইতিহাস অগ্রসর হতে থাকে। ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুমরী, টপ্পা, তবলা, সেতার ও অন্যান্য তারযন্ত্র, নৃত্য ইত্যাদি সংগীতের সব অঙ্গেরই ভিন্ন ভিন্ন ঘরানা বিদ্যমান।

তথ্যসূত্র

১) মোবারক হোসেন খান, *সংগীত দর্পণ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা: ১৯৯৯।

২) প্রাগুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ : ঘরানার উদ্ভব

'ঘর' শব্দ থেকেই ঘরানার উদ্ভব। ঘরানা মূলত গায়ন পদ্ধতির বিশেষ একটি ধরন। এক্ষেত্রে ঘরানা ভেদে বাণীর পার্থক্যও দেখা যায়। তবে শুধুমাত্র বাণীর ভিন্নতাই ঘরানার মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিতে যথেষ্ট নয় বরং সুর, তাল, রাগ ও তার প্রকাশভঙ্গির বৈচিত্র্যই ঘরানার সৃষ্টির মূলে রয়েছে। এক্ষেত্রে আঞ্চলিক ভিত্তির গুরুত্বের কথা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। ধ্রুপদ যেমন বিভিন্ন অঞ্চল দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিভিন্ন শিল্পীর মাধ্যমে চারটি বাণী বা চারটি ঘরানায় আত্মপ্রকাশ করে, তেমনি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের সংগীত-সাধকেরা নিজস্ব অঞ্চলের নামানুসারে তাঁদের গায়কীর নামকরণ করেন যা ঐ সংগীত-সাধক বা গুরুর ঘরানা হয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে তাঁর পরিবারের সদস্যসহ শিষ্যবর্গেরা সেই ঘরানার অনুসারী হিসেবে চিহ্নিত হয়। এভাবেই যুগ যুগ ধরে ঘরানাদার শিল্পী তৈরি হয়ে আসছে। অঞ্চলের নামানুসারে গোয়ালিয়র, আগ্রা, কিরানা, উদয়পুর, অত্রৌলী, বারানসী, বিষ্ণুপুর, জয়পুর, দিল্লী, পাঞ্জাব, অযোধ্যা, লক্ষ্ণৌ, বুন্দি ইত্যাদি ঘরানার সৃষ্টি হয়েছে। একই ঘরানার বিভিন্ন শাখার মত একইস্থানের নামেও একাধিক ঘরানা পাওয়া যায়। সেনী ঘরানার তিনটি শাখা আছে। আবার খেয়ালের যেমন দিল্লী ঘরানা আছে তেমনি ধ্রুপদ ও তবলা তাল যন্ত্রেও দিল্লী ঘরানা রয়েছে। শিল্পীর নামানুসারে যে সকল ঘরানার উল্লেখ আমরা পাই তার মধ্যে তানসেনী বা সেনী ঘরানার গুরুত্ব সর্বাধিক বলে মনে করা হয়।[১]

মুঘল বাদশা ঔরঙ্গজেব বা প্রথম আলমগীরের মৃত্যুর পূর্বে ভারতীয় সংগীতে ঘরানার উল্লেখ পাওয়া যায় না। তখন ছিল পরম্পরা ও সম্প্রদায়। আচার্য সম্প্রদায় ও গায়ক-বাদক-নর্তক পরম্পরা নামে তা পরিচিত ছিল। এই দুই ধরনের গায়কীর মধ্যে আচার্য সম্প্রদায়ের সংগীতে মনোরঞ্জনের কোন বিষয় ছিল না। ধর্মীয় সাধনায় এই সংগীত ব্যবহৃত হত। মধ্যযুগেই আচার্য সম্প্রদায় ও পরম্পরাভিত্তিক শিক্ষার বিলুপ্তি ঘটে। তবে উত্তর ভারতের অধিকাংশ আচার্য পণ্ডিতগণ দক্ষিণাত্যে আশ্রয় গ্রহণের ফলে সেখানে দেশী সংগীতের প্রসার ঘটে এবং কর্ণাটকী সংগীতের সৃষ্টি হয়। তখন উত্তর ভারতে মন্দিরাশ্রিত যে সংগীত প্রচলিত ছিল তাও বিলুপ্ত হয় এবং সংগীতের স্থান দখল করে নেয় দরবার। এর ফলে দরবারাশ্রিত সংগীতের সূত্রপাত ঘটে এবং অনেক গায়ক, বাদক ও নর্তক স্থান পায় এই দরবারে। তখনও ঘরানা শব্দটির উদ্ভব হয়নি। এইসকল সংগীতপ্রেমী গুণীশিল্পী বিভিন্ন সময় ভারতের বিভিন্ন স্থানে বসবাস করতেন। যেমন উত্তরপ্রদেশের সাহারানপুর, মীরাট, মোরাদাবাদ, রামপুর, হাপুর, বৃন্দাবন, মথুরা, শাহজানপুর, অজরাড়া, কিরানা, আগ্রা, ফরুক্কাবাদ, ইটারা, চরখারী, ফতেপুর, বান্দা, লক্ষ্ণৌ, কালপট, সহসোবান, অযোধ্যা, জৌনপুর, বেনারস, ইলাহাবাদ, খুজা, অত্রৌলী প্রভৃতি অঞ্চল; বিহারের বেতিয়া দ্বারভাঙ্গা, পটনা, গয়া, মুঙ্গের, ছাপরা, ভগলপুর প্রভৃতি অঞ্চল; মধ্য প্রদেশের গোয়ালিয়র, দাতিয়া,

Dhaka University Institutional Repository

ইন্দোর, উজ্জৈন, বীরা, মৈহর ইত্যাদি; পাঞ্জাবের পাটিয়ালা, অমৃতস্বর, কসূর, তলাবন্ডী, ফিরোজপুর, লাহোর, শ্যামচৌরঙ্গী প্রভৃতি স্থান; রাজস্থানের জয়পুর, উদয়পুর, নাথদ্বারা, চিত্তর, মারবাড়, রতনগড়, চুরু প্রভৃতি স্থান; বাংলায় বিষ্ণুপুর, কৃষ্ণনগর, বহরমপুর, নাটোর, মুর্শিদাবাদ, আগরতলা, ঢাকা, মুক্তাগাছি, বর্ধমান, রানাঘাট, গুপ্তিপাড়া, চুঁচুড়া প্রভৃতি; গুজরাটে বারোদা, সুরত, আহমেদাবাদ, রাজকোট, জুনগর প্রভৃতি স্থান। এইসকল স্থান ছাড়াও দিল্লী, মুম্বাই, পুনে প্রভৃতি স্থানেও অনেক সংগীতশিল্পী বসবাস করতেন যারা পেশাদার শিল্পী ছিলেন। কণ্ঠ ও বাদ্য সংগীতের চর্চা ছাড়াও এঁদের মধ্যে নর্তকীও ছিলেন।[২]

ভারতবর্ষে সংগীতের বিকাশ ও ঘরানার উদ্ভব হয় মূলত মুসলমানদের আগমনের মাধ্যমেই। আলাউদ্দীন খিলজীর রাজত্বকালে দুটি ঘরানার উদ্ভবের উল্লেখ পাওয়া যায় তা হলো কলাবন্ত ঘরানা ও কাওয়াল ঘরানা। বৈজুবাওরা কলাবন্ত ঘরানার প্রতিষ্ঠা করেন যার রক্ষক হিসেবে ছিলেন দক্ষিণ ভারতের নায়ক গোপাল লাল। কাওয়াল ঘরানার প্রবর্তন করেন আলাউদ্দিন খিলজীর সভা গায়ক আমীর খসরু। পরবর্তী সময়ে আরো দুটি ঘরানার সৃষ্টি হয় যার একটির উদ্ভাবক সানাই ও তবলা বাদকেরা আর অপরটি রাজদরবারে মহিলা গায়ক এবং নর্তকীদের সাথে সঙ্গতকারী বাদকেরা। এই দুটি ঘরানার ওস্তাদদেরও ভিন্ন নাম ছিল। সানাই ও তবলাবাদক সৃষ্ট ঘরানার শিল্পীদের বলা হতো মীরাসি এবং সঙ্গতকারী বাদক দ্বারা সৃষ্ট ঘরানার শিল্পীদের বলা হতো ঢাঢ়ী।[৩]

তথ্যসূত্র

১) মীনাক্ষী বিশ্বাস, *পরম্পরা*, সপ্তর্ষি প্রকাশন, কলিকাতা: ২০১৩।

২) করুণাময় গোস্বামী, *সংগীতকোষ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা: ১৯৮৫।

৩) উৎপলা গোস্বামী, *ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত*, সলিল সাহা, কলকাতা: ১৩৯৭।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় পরিচ্ছেদ : ঘরানার শ্রেণিবিভাগ

ভারতবর্ষে মুসলমানদের আগমনের পূর্বে যে সংগীত প্রচলিত ছিল তা আসলে জনসাধারণ্যে তেমন বিস্তার লাভ করতে সক্ষম হয়নি। আলাউদ্দিন খিলজীর পূর্বে যে সংগীত রীতি ছিল, পরবর্তী সময়ে তার ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়। তাঁর শাসনামলে সংগীত একটি সুসংবদ্ধরূপ লাভ করে ঘরানারূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সম্রাট আকবরের রাজত্বকালকে বলা হয় সংগীতের স্বর্ণযুগ। মিয়া তানসেন ছিলেন তাঁর দরবারের নবরত্নের শ্রেষ্ঠরত্ন ও কালজয়ী সংগীতজ্ঞ। তানসেনের মৃতুর পরই সেনী ঘরানার জন্ম হয়। এই সেনী ঘরানার তিনটি শাখার উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রথম শাখার উদ্ভব গৌড়বাণী ধ্রুপদের গায়ক তানসেনের কনিষ্ঠ পুত্র বিলাস খাঁ থেকে। দ্বিতীয় শাখার উদ্ভাবক তানসেনের অপরপুত্র সুরত সেন (খাঁ) যিনি ডাগরবাণী ধ্রুপদের গায়ক ছিলেন এবং তৃতীয় শাখার উদ্ভাবক তানসেনের জামাতা বীণকার মিশ্রী সিং যিনি ডাগর ও খাণ্ডার উভয় বাণীর ধ্রুপদেই পারদর্শী ছিলেন।[১]

প্রাচীন ঘরানার সন্ধানে আরো দুটি ঘরানা পাওয়া যায়। পাঞ্জাবের তিলমন্ডী ঘরানা বলে কথিত ঘরানাটি প্রতিষ্ঠা করেন চাঁদ খাঁ ও সুরয খাঁ আর মথুরায় যে ঘরানাটির উদ্ভব হয় তার প্রতিষ্ঠা করেন ডাগরবাণীর বিজচন্দ্র ও সুরদাস। একটি ঘরানায় বিভিন্ন ধারার সংগীতচর্চা হতে পারে। তাই ঘরানার শাখা বা শ্রেণি বিভাগে কোন নির্দিষ্ট বিষয়ের একক শাখাকে বোঝায় না। একই ঘরানার মধ্যে সংগীতের বিভিন্ন বিষয়ের চর্চার ফলস্বরূপ আমরা দেখতে পাই যে, কণ্ঠসংগীতের ঘরানায় বীণা বা সেতার অথবা সরোদের চর্চা চলছে। আবার বাদ্যযন্ত্রের ক্ষেত্রে আনদ্ধ বাদ্যের একই ঘরানায় হচ্ছে পাখোয়াজ বা তবলার চর্চা।

ঘরানার শ্রেণিবিভাগে সাধারণত একে তিনটি ভাগে বিভক্ত করা যায় ১. গায়ক ঘরানা, ২. বাদক ঘরানা, ৩. নর্তক ঘরানা। গায়ক ঘরানায় যেমন খেয়ালের ঘরানা, ধ্রুপদের ঘরানা, ঠুমরী ও টপ্পার ঘরানা রয়েছে তেমনি বাদক ঘরানায় রয়েছে ততবাদক ঘরানা ও আনদ্ধ বাদক ঘরানা। আবার নৃত্যের ক্ষেত্রে কত্থকের তিনটি ঘরানা বোঝায়। তা হলো- ১. লক্ষ্ণৌ কত্থক ঘরানা, ২. জয়পুর কত্থক ঘরানা ও ৩. বারানসী বা বেনারস কত্থক ঘরানা।

কণ্ঠসংগীতের ঘরানার শাখাসমূহ

ধ্রুপদ ঘরানার শাখাসমূহ

সেনী ঘরানা, ডাগর ঘরানা, গোয়ালিয়র ঘরানা, বেতিয়া ঘরানা, তিলমন্ডী ঘরানা, অত্রৌলী ঘরানা, বারানসী ঘরানা, প্রসদ্দু মনোহর ঘরানা, আগ্রা ঘরানা, উদয়পুর ঘরানা, সাহারানপুর ঘরানা, বিষ্ণুপুর ঘরানা।

Dhaka University Institutional Repository

খেয়াল ঘরানার শাখাসমূহ

গোয়ালিয়র ঘরানা, আগ্রা ঘরানা, অত্রৌলী ঘরানা, কিরানা ঘরানা, জয়পুর ঘরানা, পাঞ্জাব ঘরানা, পাতিয়ালা ঘরানা, দিল্লী ঘরানা, বারানসী ঘরানা, রামপুর ঘরানা, তিলমন্ডী ঘরানা, মেওয়াতী ঘরানা, বেতিয়া ঘরানা।

টপ্পা ঘরানার শাখাসমূহ

লক্ষ্ণৌ ঘরানা, বারানসী ঘরানা ও রামপুর ঘরানা।

ঠুমরী ঘরানার শাখাসমূহ

লক্ষ্ণৌ ঘরানা, পাঞ্জাব ঘরানা ও বারানসী ঘরানা।

যন্ত্রের শাখাসমূহ

বীণা ও রবাব যন্ত্রের শাখাসমূহ

সেনী ঘরানা, জয়পুর ঘরানা, গোয়ালিয়র ঘরানা, ইন্দোর ঘরানা, বিষ্ণুপুর ঘরানা, বারানসী ঘরানা, ঢাকা ঘরানা, ইমদাদখানী ঘরানা, দ্বারভাঙ্গা ঘরানা।

সরোদ ঘরানার শাখাসমূহ

গোয়ালিয়র ঘরানা, রামপুর ঘরানা, শাহজাহানপুর ঘরানা, লক্ষ্ণৌ ঘরানা, নিয়ামতউল্লাহ খাঁ'র সরোদ ঘরানা, এনায়েত উল্লাহ খাঁ'র ঘরানা, গোলাম আলীর সরোদ ঘরানা।

সারেঙ্গী ঘরানার শাখাসমূহ

দিল্লী ঘরানা, বারানসী ঘরানা, পাঞ্জাব ঘরানা, কিরানা ঘরানা।

এস্রাজ ঘরানার শাখাসমূহ

বিষ্ণুপুর ঘরানা, লক্ষ্ণৌ ঘরানা, ইটাওয়া ঘরানা, গয়া ঘরানা।

বেহালা ঘরানার শাখাসমূহ

মুম্বাই ঘরানা, এলাহাবাদ ঘরানা।

তবলাবাদক ঘরানার শাখাসমূহ

দিল্লী ঘরানা, লক্ষ্ণৌ ঘরানা, ফররুখাবাদ ঘরানা, অজরাড়া ঘরানা, বারানসী ঘরানা, পাঞ্জাব ঘরানা, বিষ্ণুপুর ঘরানা, ভাটোলা ঘরানা, ঢাকা ঘরানা।

পাখোয়াজ বাদক ঘরানার শাখাসমূহ

গোয়ালিয়র ঘরানা, বান্দা ঘরানা, বরোদা ঘরানা, রামপুর ঘরানা, অযোধ্যা ঘরানা, বারানসী ঘরানা, রেবা ঘরানা, গয়া ঘরানা, কলকাতা ঘরানা, বিষ্ণুপুর ঘরানা, পাঞ্জাব ঘরানা, ইন্দোর ঘরানা, দ্বারভাঙ্গা ঘরানা, ঢাকা ঘরানা।

নর্তক ঘরানার শাখাসমূহ

লক্ষ্ণৌ কত্থক ঘরানা, বারানসী কত্থক ঘরানা ও জয়পুর কত্থক ঘরানা।

এছাড়াও শুষির যন্ত্রবাদকদের ঘরানা রয়েছে অর্থাৎ হারমোনিয়াম ও সানাইয়ের ঘরানা।[২]

সেনী ঘরানার প্রবর্তনের পর তানসেন বংশের নির্মল শাহের শিষ্য বন্দেআলী খাঁ কিরানা ঘরানার সূচনা করেন। তবে কিরানা ঘরানার এই শাখা ছিল যন্ত্রসংগীতের। পরবর্তী কালে কণ্ঠসংগীতের কিরানা ঘরানার প্রতিষ্ঠা করেন আব্দুল করিম খাঁ। কিরানা আব্দুল করিম খাঁ'র জন্মস্থান হওয়ায় তাঁর নামানুসারেই এই ঘরানা কিরানা ঘরানা নামে পরিচিতি লাভ করে।

ধ্রুপদ সংগীতের অন্যতম প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও রচয়িতা রাজা আনন্দমোহন ঊনিশ শতকের ২য় দশক থেকে বিহারের বেতিয়া রাজ্যের রাজদরবারে বেতিয়া ঘরানার সূচনা করেন। সেইসময় রাজা আনন্দমোহনের আমন্ত্রণে অনেক গুণীশিল্পী বেতিয়া রাজদরবারে অধিষ্ঠিত হন যাদের শিষ্য পরম্পরায় ও আনন্দ মোহনের পৃষ্ঠপোষকতায় বেতিয়া ঘরানা বিস্তার লাভ করে। আনন্দকিশোর ও তাঁর ভাই নওল কিশোরের সময়ই বেতিয়া রাজ্যে সংগীতের একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য গড়ে ওঠে।

গোয়ালিয়র ঘরানার নামকরণ সেই অঞ্চলের নামানুসারে গোয়ালিয়র ঘরানা নামে খ্যাত হয়। সংগীতের তীর্থস্থান হিসেবে অনেক প্রাচীনকাল থেকেই গোয়ালিয়র বিখ্যাত ছিল। অঞ্চলটির নাম গোয়ালিয়র রাখার পেছনে কারণ হলো সেইসময় এই অঞ্চলে গোচারণ ভূমি ছিল। গোয়ালিয়র ঘরানার প্রবর্তক হিসেবে গোলাম রসুলের কন্যা বংশের নাম পাওয়া যায়। তিনি কাওয়াল ধারার সাথে সদারঙ্গ প্রবর্তিত ধারার মিশ্রণে খেয়াল পরিবেশন করতেন। তাঁর দৌহিত্র গোয়ালিয়রের বাসিন্দা ছক্কর ও মখ্খন এই ঘরানার প্রবর্তন করেছেন। মখ্খনও সদারঙ্গ প্রবর্তিত খেয়ালের ভক্ত ছিলেন তাই তিনি ধ্রুপদ গায়ক হওয়া সত্ত্বেও খেয়াল গানের চর্চা করতেন। মখ্খনের অকাল মৃত পুত্র হস্সু ও হদ্দু খাঁ খেয়াল পরিবেশনের তিন ধরনের রীতি প্রচলন করেন। তা হলো, কাওয়াল রীতি, খেয়াল রীতি ও খেয়ালের ধ্রুপদ রীতি। ওস্তাদ নিসার হোসেন, বিষ্ণুদিগম্বর পলুস্কর, বিনায়করাও পটবর্ধন সহ অসংখ্য খ্যাতিমান সংগীতজ্ঞের তত্ত্বাবধায়নে

গোয়ালিয়র ঘরানার শিষ্য পরম্পরা গড়ে ওঠে ও বিস্তার লাভ করে। এই ঘরানার অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো ধ্রুপদ অঙ্গের খেয়াল গায়ন।

আগ্রা ঘরানার গায়ক বংশ, শিষ্য তথা এই রীতির খেয়াল গায়নের ইতিহাস আজও অম্লান। তবে এই ঘরানার সূত্রপাতের পশ্চাতে অলকদাস ও মলকদাস নামক ভ্রাতৃদ্বয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। কালক্রমে অসংখ্য গুণীশিল্পীর শিষ্য পরম্পরায় এই ঘরানা সমগ্র ভারতে সম্প্রসারিত হয়।

ভারতের গয়া নামক অঞ্চলের অধিবাসী হরি সিং ও তাঁর পুত্র হনুমান সিংহ কর্তৃক রচিত খেয়াল গায়ন ও এস্রাজ বাদন ধারাকে ঐ অঞ্চলের নামানুসারে গয়া ঘরানা বলে উল্লেখ করা হয়। হরি সিং ছিলেন গোয়ালিয়রের বিখ্যাত খেয়াল গায়ক নারায়ণদাস বাবাজীর শিষ্য। এই ঘরানার উদ্ভবের সময় ঊনিশ শতকের মধ্যভাগ বলে মনে করা হয়। ঠুমরী গায়ন, হারমোনিয়াম বাদন ও টপ্পা গায়নে গয়ার সংগীতকেন্দ্র অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করে।

বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ তানরস খাঁ এবং অনেকের মতে সদারঙ্গ ও অদারঙ্গ হলেন দিল্লী ঘরানার প্রবর্তক। পরবর্তী সময়ে তানরস খাঁ'র পুত্র ওমরাও খাঁ ও মোজাফ্ফর খাঁ এবং তাঁর শিষ্য গিরিজাশংকর চক্রবর্তী, চাঁদ খাঁ প্রমুখ শিল্পী ও তাঁদের শিষ্যমণ্ডলী দ্বারা দিল্লী ঘরানার ব্যাপক প্রচার ও প্রসার ঘটে।

ওস্তাদ আল্লাদিয়া খাঁ কোলাপুরে এক নতুন ঘরানার সৃষ্টি করেন। পিতৃব্য জাহাঙ্গীর খাঁ'র নিকট তালিম গ্রহণের পর তিনি তাঁর সংগীত প্রতিভাগুণে অসংখ্য শিষ্যমণ্ডলী গড়ে তোলেন। স্বতন্ত্র কায়দার সংগীত প্রতিভার দরুণ তাঁর নামানুসারেই এই ঘরানার নামকরণ করা হয় আল্লাদিয়া খাঁ ঘরানা। কেশরবাঈ কেরকার, মোঘুবাই-কুর্দিকর, আজম বাঈ, শংকর রাও সরনায়ক, গোবিন্দরাও টোম্বে, ভূর্জী খাঁ (পুত্র), মল্লিকার্জুন মনসুর সহ আরো অনেক গুণীশিল্পী এই ঘরানার অনুসারী ছিলেন।

পাঞ্জাব ঘরানার প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে স্বামী হরিদাসের শিষ্যবংশীয় বাবা কালিদাসের উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি ডাগর ঘরানার বিখ্যাত শিল্পী বহরম খাঁ'র গুরু ছিলেন। নানা শাস্ত্রে পণ্ডিত বাবা কালিদাস অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে খ্যাতিলাভ করেন। পরবর্তী কালে তাঁর বংশীয় আলী বক্স ও ফতে আলীর মাধ্যমে ঠুমরী ও টপ্পা অঙ্গের গায়কীতে বিখ্যাত পাঞ্জাব ঘরানার ভিত্তি আরো সুদৃঢ়রূপে স্থাপিত হয়।

পাতিয়ালা ঘরানার উদ্ভাবক হিসেবে কালে খাঁ'র নাম পাওয়া যায়। তবে এই ঘরানার প্রবর্তক হিসেবে কালে খাঁ'র বংশীয় আলী বক্স খাঁ ও ফতে আলী খাঁ'র নামও শোনা যায়। অষ্টাদশ শতকে মোঘল সাম্রাজ্যের পতনের পর পাতিয়ালার রাজপরিবারের অনেক সদস্যরাই এই ঘরানার প্রচার ও প্রসারে

সহায়তা করেন। পাতিয়ালা ঘরানার খেয়াল গায়কীর প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে এই ঘরানার বিখ্যাত শিল্পীদের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁরা হলেন আমানত আলী ও ফতে আলী খাঁ এবং বড়ে গোলাম আলী খাঁ। এই ঘরানার প্রবর্তনের সময়কাল বহুপূর্ব হলেও প্রায় ২০০ বছর পূর্বে এই ঘরানা লোকপরিচিতি লাভ করে সর্বসাধারণের কাছে সমাদৃত হয়।

ধ্রুপদ সংগীতের একটি প্রাচীন ঘরানার নাম হলো ডাগর ঘরানা। এই ঘরানার কেন্দ্রস্থল জয়পুর ও কিছুপরে উদয়পুর হলেও ডাগর ঘরানার ধ্রুপদের সংগীতজ্ঞরা এই ঘরানার সৃষ্টি করেছেন বলে একে ডাগর ঘরানা বলা হয়। বহরম খাঁ ও তাঁর পিতার আমলের পূর্বে এই ঘরানার সঠিক ইতিহাস পাওয়া যায় না।

বারানসীর একটি অন্যতম ঘরানার নাম হলো প্রসদ্দু মনোহর ঘরানা। ঐ অঞ্চলের বাসিন্দা হরিপ্রসাদ মিশ্র ও মনোহর মিশ্র ভ্রাতৃদ্বয়ের নামানুসারেই এই ঘরানার নামকরণ করা হয়। হরিপ্রসাদের প্রসাদ থেকে প্রসদ্দু ও মনোহরের নাম যুক্ত হয়ে এই ঘরানার নাম দেয়া হয় প্রসদ্দু মনোহর ঘরানা। এই দুই সহোদর ধ্রুপদে দক্ষ থাকলেও খ্যাতিঅর্জন করেন খেয়ালগান ও টপ্পায়। নেপাল, পাতিয়ালা, লক্ষ্ণৌসহ বিভিন্ন রাজদরবারে তাঁরা নিযুক্ত থেকে এই ঘরানার প্রচার ও প্রসার ঘটান। তবে প্রসদ্দু মনোহর ঘরানার উৎপত্তিস্থল বারানসী হলেও কলকাতায় এর যথার্থ বিকাশ ঘটে।

বাংলার অন্যতম প্রাচীন রাজ্য হলো বিষ্ণুপুর। এই রাজ্যে সংগীতচর্চার ধারাকে বিষ্ণুপুর ঘরানা বলা হয়। বাংলার একমাত্র সংগীত ঘরানা হিসেবে বিষ্ণুপুর ঘরানা পরিচিত। এই ঘরানার সূচনা ও তার ব্যাপক প্রচার ও প্রসার বাংলা সংগীতের ইতিহাসে এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। আদি ধ্রুপদ গুরুদের শিষ্য প্রশিষ্যক্রমে ধ্রুপদের ধারাই এই অঞ্চলের মুখ্য সংগীতচর্চার বিষয় ছিল যা বাংলার রাগসংগীত পরিমণ্ডলকে তার একটি নিজস্ব জায়গায় পৌঁছাতে সক্ষম করে তোলে। এই অঞ্চলে কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীতের বিভিন্ন শাখার উল্লেখযোগ্য চর্চার সূত্রপাত হয়েছিল। ধ্রুপদের পাশাপাশি খেয়াল, টপ্পা, ঠুমরী গানের চর্চার প্রচলনও দেখা যায়। এই ঘরানার প্রভাবেই বাংলায় ধ্রুপদচর্চা বিস্তার লাভ করে এবং বিষ্ণুপুরেই প্রথম বাংলা ভাষায় ধ্রুপদ রচনা শুরু হয়।

প্রকৃতপক্ষে একটি বৃহৎ সেনিয়া ঘরানার শেষ পর্যায়ই হচ্ছে রামপুর ঘরানা। রামপুর দরবারের পৃষ্ঠপোষকতায় রামপুর ঘরানা বিস্তার লাভ করে। তানসেন বংশীয় গুণীদের অবদানে এই ঘরানা গঠিত হয়েছে বলে একে সেনী ঘরানার ভিন্নরূপ বলে মনে করা হয়। রামপুর ঘরানার তানসেন, জামাতা মিশ্র সিং তথা নৌবৎ খাঁ'র অবদান এক্ষেত্রে অনস্বীকার্য। কণ্ঠসংগীতে রামপুর ঘরানা প্রচলিত থাকলেও যন্ত্রসংগীতেও এই ঘরানার চর্চা অব্যাহত থাকে। রামপুরের নবাব ইউসুফ আলী (১৮৪০-৬৪) অত্যন্ত

সংগীতপ্রেমী ছিলেন। তানসেন বংশীয় আমীর খাঁ ও বাহাদুর হোসেন খাঁ সহ আরো কিছু গুণীশিল্পীকে তিনি তাঁর দরবারে নিযুক্ত করেন। তাই তাঁর শাসনামলেই এই ঘরানার সূচনা ঘটে। আমীর খাঁ ছিলেন ধ্রুপদী ও বীণকার। আর বাহাদুর হোসেন খাঁ- ধ্রুপদী সুরশৃঙ্গার বাদক হওয়ার পাশাপাশি তারানা গায়নশৈলীতেও পারদর্শী ছিলেন। এই দুই গুণীশিল্পীর শিষ্যমণ্ডলীর মাধ্যমে রামপুর ঘরানা বিস্তার লাভ করে ও একটি বিশিষ্ট সংগীত ধারার গোড়াপত্তন হয়।[৩]

বাদ্যযন্ত্রের বিভিন্ন ঘরানার শাখাসমূহ:

বন্দে আলী কর্তৃক সূচিত বীণাবাদন ঘরানা ইন্দোর ঘরানা নামে খ্যাত। বন্দে আলী ছিলেন বিখ্যাত বীণকার। কিরানায় জন্মগ্রহণ করলেও জীবনের অধিকাংশ সময় বন্দে আলী ইন্দোরে অবস্থান করেন এবং সংগীতচর্চার মাধ্যমে শিষ্যমণ্ডলী তৈরি করে এই ঘরানার প্রবর্তন করেন বলে তাঁর ঘরানা ইন্দোর ঘরানা নামে খ্যাত হয়।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার অন্তর্গত শিবপুর গ্রামে ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ জন্মগ্রহণ করেন। তানসেন কন্যা বংশীয় ওস্তাদ ওয়াজির খাঁ'র নিকট তিনি বীণায় তালিম নেন। পরবর্তী সময়ে আলাউদ্দিন খাঁ বীণার ঢং-এ সরোদ যন্ত্রের চর্চার মাধ্যমে অত্যন্ত খ্যাতিলাভ করেন। তাঁর নিজস্ব বাদনশৈলী একটি ঘরানায় রূপান্তরিত হয় যা আল্লাদিয়া খাঁ'র ঘরানা নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

বারানসী ঘরানার সূত্রপাত রামসহায় ও তাঁর শিষ্য পরম্পরার মাধ্যমে। একে বারনসী ঘরানা বা বারানসী বাজও বলা হয়। রামসহায় বারানসীর অধিবাসী হওয়ায় অঞ্চলের নামানুসারেই ঘরানার নামকরণ হয়। ১৮৩০ সালে জন্মের পর শৈশবেই পিতার নিকট তবলা শিক্ষা শুরু করে বিস্ময়কর দক্ষতা অর্জন করেন এবং কালক্রমে প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে রামপুর ঘরানার একটি নিজস্ব ধারা উদ্ভাবন করেন।

ভারতের উত্তরপ্রদেশে অজরাড়া নামক স্থানে অজরাড়া তবলা ঘরানার সুত্রপাত। দিল্লী ঘরানার সিতার খাঁ'র শিষ্য কালু খাঁ ও মীর খাঁ ভাতৃদ্বয় দিল্লী ঘরানার বাদন ধারাকে ভেঙ্গে অজরাড়া ঘরানার সূচনা করেন।

দিল্লী তবলা ঘরানার সৃষ্টি করেন প্রখ্যাত তবলাবাদক সুধার (সিদ্ধার) খাঁ। তিনি দিল্লীর অধিবাসী ছিলেন। তাঁর শিষ্য প্রশিষ্যক্রমে বিস্তৃত তবলাবাদন ধারাই দিল্লী তবলা ঘরানা নামে পরিচিত। সুধার খাঁ তাঁর সাধনা

দ্বারা এক অনবদ্য বাদনশৈলীর সূচনা করেন। তাই দিল্লী ঘরানার সুধার খাঁকে পদ্ধতিগত তবলা বাদনের অন্যতম পথিকৃৎ রূপে গণ্য করা হয়।

ওস্তাদ হোসেন বক্স পাঞ্জাব তবলা ঘরানার উদ্ভাবকরূপে চিহ্নিত। পাঞ্জাব ঘরানার বাদনরীতি অন্যান্য ঘরানা থেকে ভিন্ন। এর কারণ হলো অজরাড়া ও লক্ষ্ণৌ ঘরানার জন্ম হয়েছে দিল্লী ঘরানা থেকে আবার বেনারস ঘরানার জন্ম লক্ষ্ণৌ ঘরানা থেকে। ফলে এইসকল ঘরানার বাদনশৈলীতে ভিন্নতা থাকা সত্ত্বেও দিল্লী ঘরানার যথেষ্ট প্রভাব এতে পরিলক্ষিত হয়। এদিক থেকে পাঞ্জাব ঘরানা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি ঘরানা।

লক্ষ্ণৌ ঘরানার প্রতিষ্ঠাতা খলিফা বক্সু খাঁ'র জামাতা হাজী বিলায়েৎ খাঁ হলেন ফররুখাবাদ ঘরানার প্রতিষ্ঠাতা। ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে উত্তরপ্রদেশের ফররুখাবাদ নামক স্থানে এই ঘরানার সূচনা হয় বলে এটি ফররুখাবাদ তবলা ঘরানা নামে পরিচিতি লাভ করে। বিলায়েৎ খাঁ তাঁর নিজ প্রতিভাগুণে লক্ষ্ণৌ ঘরানার বাইরে একটি স্বকীয় বাদনরীতি স্থাপনে সমর্থ হন। শিষ্য গঠনের মাধ্যমে ফররুখাবাদ ঘরানার বিস্তৃতি পরবর্তী কালে ভারতের সর্বত্র বিস্তার লাভ করে।

লক্ষ্ণৌ তবলা ঘরানার সূত্রপাত অষ্টাদশ শতকের শেষদিকে অথবা ঊনিশ শতকের প্রথমার্ধে। তখন লক্ষ্ণৌর রাজদরবারে হাজী বক্স খাঁ অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই দরবারকে কেন্দ্র করেই হাজী বক্স খাঁ তাঁর চর্চার মাধ্যমে এই বাদনশৈলীর প্রচার ও প্রসার করেন যা লক্ষ্ণৌ তবলা ঘরানা নামে খ্যাত।

বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ এমদাদ খাঁ তাঁর বংশ ও শিষ্য পরম্পরা বিশিষ্ট সেতার ও সুরবাহার যন্ত্রের যে বাদন ধারা গড়ে তোলেন তাঁকে এমদাদ খাঁ'র সেতার সুরবাহার ঘরানা বলে। প্রখ্যাত সেতারবাদক সাহাবাদ খাঁ'র পুত্র এমদাদ খাঁ ঊনিশ শতকের মধ্যভাগে মধ্যভারতে জন্মগ্রহণ করেন। সাহাবাদ খাঁ ছিলেন রাজপুত এবং তাঁর নাম ছিল সাহেব সিং। ধর্মান্তরে হন সাহাবাদ খাঁ। এমদাদ খাঁ পিতার নিকট সংগীতশিক্ষার শুরুতে খেয়াল গানের তালিম নিলেও সেতার ও সুরবাহারের প্রতি অত্যন্ত আগ্রহ ও নিষ্ঠার দরুণ তিনি বিভিন্ন সংগীত কেন্দ্রে নানা গুণীশিল্পীর সান্নিধ্যে এই যন্ত্রসংগীতে পারদর্শিতা লাভপূর্বক নিজের একটি বিশিষ্ট ধারা প্রবর্তনে সক্ষম হন।

ভারতবর্ষে সেতারযন্ত্রে সবচেয়ে প্রাচীন ঘরানা বলতে বোঝায় জয়পুর ঘরানাকে। এই ঘরানার প্রবর্তন হয় অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে। তার পূর্বে সেতার বাদন থাকলেও বংশ পরম্পরায় অনুসৃত বাদনরীতি অথবা গুরু-শিষ্য পরম্পরায় গঠিত সেতারী পরিবার জয়পুরের আগে ছিল না। তাই সেতার যন্ত্রসংগীতে জয়পুর ঘরানার নাম সুপ্রসিদ্ধ হওয়ার পাশাপাশি এর স্থানও গুরুত্বপূর্ণ। জয়পুর সেতার ঘরানা সম্পূর্ণত সেনিয়া হলেও কোন সময়ে জয়পুরের রাজদরবারে প্রথম সেনিয়া সেতারীর অবস্থান ছিল সে বিবরণের উল্লেখ

কোথাও পাওয়া যায় না। এমনকি এই ঘরানার আদি সেতারীর নামের ক্ষেত্রেও নির্ভরযোগ্য তথ্যের অভাব রয়েছে। কথিত আছে তানসেন বংশীয় মসিদ খাঁ জয়পুরে অবস্থান করে সেতার শিক্ষা দানের মাধ্যমে সেখানে শিষ্যমণ্ডলী গঠন করেন এবং সেতারী পরিবার গড়ে তোলেন।

গোলাম আলীর সরোদ ঘরানার উদ্ভব হয় ঊনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে। গোলাম আলীর পিতামহের নাম বন্দেগী খাঁ যিনি কাবুলের অধিবাসী ছিলেন। ভাগ্যান্বেষণে ভারতে এসে রবাববাদক বন্দেগী খাঁ মধ্যপ্রদেশের রেবা রাজদরবারে আশ্রয় লাভ করেন। রেবার রাজা কামাক্ষা প্রসাদ সিংহ- বন্দেগী খাঁকে ভারতীয় সংগীতের নানা বিষয়ে জ্ঞান লাভে সহায়তা করেন। বন্দেগী খাঁ'র পুত্র গোলাম আলী পরবর্তী কালে রেবা রাজ্যের সংগীতগুণী নৃপতি বিশ্বনাথ সিংহের আনুকুল্য লাভপূর্বক তাঁর নিকট শিক্ষালাভ করেন। নিষ্ঠা ও কঠোর পরিশ্রমে গোলাম আলী তাঁর এক নিজস্ব বাদনশৈলীর প্রবর্তন করেন যা গোলাম আলীর সরোদ ঘরানা নামে পরিচিতি লাভ করে।

উত্তর ভারতের একটি বিখ্যাত সরোদ ঘরানা হচ্ছে শাজাহানপুর সরোদ ঘরানা। সেইসময় উত্তর ভারতে শাজাহানপুর, ফররুখাবাদ ও বুলন্দসর নামক সরোদযন্ত্র বাদনের তিনটি প্রধান কেন্দ্রের উল্লেখ পাওয়া যায় তন্মধ্যে শাজাহানপুরে ব্যাপক সরোদ চর্চার কারণে সেখানে সরোদবাদকদের এগারটি মহল্লা বা পাড়া গড়ে ওঠে। এই ঘরানার এক শ্রেষ্ঠ সংগীতজ্ঞ হিসেবে এনায়েত আলী খাঁ'র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সরোদ যন্ত্রের আরেক প্রচলিত ঘরানার নাম নিয়ামতউল্লাহ খাঁ'র সরোদ ঘরানা। ঊনিশ শতকের মধ্যভাগে এই ঘরানার প্রচলন দেখা যায়। যে তিনটি অঞ্চলে সরোদের চর্চা ব্যাপক বিস্তার লাভ করে সেই তিনটি ঘরানার পূর্বে যে পূর্ব পুরুষেরা সরোদীরূপে আত্মপ্রকাশ করেন তাঁরা হলেন যথাক্রমে গোলাম আলী, নিয়ামতউল্লাহ ও এনায়েত আলী। পরবর্তী সময়ে যে সকল সরোদবাদকের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁদের অধিকাংশ এঁদের বংশীয়রূপে আত্মপ্রকাশ করে। ঊনিশ শতকে নিয়ামতউল্লাহ খাঁ এক বংশীয় সরোদ বাদনশৈলীর প্রবর্তন করেন যা নিয়ামতউল্লাহ্ খাঁ'র সরোদ ঘরানা নামে পরিচিত ।

গায়ক তথা সারেঙ্গীবাদক বুদ্ধু মিশ্র ঊনিশ শতকের প্রথমার্ধে উদ্ভব করেন কাশীর মিশ্র ঘরানার। বারানসীর প্রসদ্দু মনোহর ঘরানার সঙ্গে মিশ্র বংশের আত্মীয়তা দেখা গেলেও বুদ্ধু মিশ্রের ঘরানা ছিল স্বতন্ত্র একটি ঘরানা। টপ্পা সংগীতচর্চা এবং সারেঙ্গী বাদনে বুদ্ধু মিশ্র কাশীতে একটি স্বতন্ত্র সংগীত ধারার প্রবর্তন করেন যা কাশীর মিশ্র ঘরানা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।[৪]

নৃত্যকলা ও তার ঘরানা

ভারতীয় নৃত্য ও তার ঘরানার বর্ণনায় কত্থক ঘরানারই উল্লেখ পাওয়া যায়। কত্থক নৃত্যের তিনটি ঘরানার উল্লেখ মেলে: (১) লক্ষ্ণৌ ঘরানা, (২) জয়পুর ঘরানা ও (৩) বেনারস ঘরানা। এছাড়া ভরত নাট্যম, ওড়িশী নৃত্য, কথাকলি নৃত্য, মোহিনী আট্যম, মনিপুরী নৃত্য, কুচিপুড়ি নৃত্য ইত্যাদি ভারতীয় নৃত্যের বিভিন্ন শৈলীর বর্ণনা পাওয়া যায়। কিন্তু এইসকল শৈলীর ঘরানা আকারে কোন বর্ণনা মেলে না।

আমরা জানি যে, ঘরানার মূল তত্ত্বই হলো সংগীত পরিবেশনের একটি নিজস্ব ধরন। এই বৈশিষ্ট্যই ঘরানারূপে আখ্যায়িত হয়ে থাকে। সংগীতের আবেদন সর্বদাই সর্বজনীন। এতে না আছে কোন ভৌগোলিক সীমারেখা না আছে ভাষার বাধ্যবাধকতা। একসময় ভারতীয় সংগীতের কেন্দ্রবিন্দু দিল্লীকেন্দ্রিক হলেও পরবর্তী সময়ে তা গোয়ালিয়র, আগ্রা, জয়পুর, কিরানা, লক্ষ্ণৌ, বিষ্ণুপুর, রামপুর, মাইহার, বেনারস প্রভৃতি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এবং এইসকল রাজ্যের সংগীতপ্রিয় নৃপতিরা সংগীতের পৃষ্ঠপোষকতা পূর্বক সংগীতজ্ঞদের তাঁদের দরবারে আশ্রয় দেন, যার ফলেই উদ্ভব হয় বিভিন্ন ঘরানার।[৫]

তথ্যসূত্র

১) অমল দাশ শর্মা, *প্রাচীন ও নবীন সংগীতজ্ঞ এবং ঘরানার ইতিবৃত্ত*, দরবারী প্রকাশন, কলকাতা: ১৯৯৫।

২) করুণাময় গোস্বামী, *সংগীতকোষ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা: ১৯৮৫।

৩) প্রাগুক্ত।

৪) মোবারক হোসেন খান, *সংগীত দর্পণ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা: ১৯৯৯।

৫) প্রাগুক্ত।

তৃতীয় অধ্যায়

সাংগীতিক বৈশিষ্ট্যসহ বিভিন্ন ঘরানার আলোচনা

সংগীতের ক্ষেত্রে পুত্র, কন্যা, স্বজন দ্বারা গঠিত শিষ্য পরম্পরায় ঘরানা প্রবহমান হয় এবং কালক্রমে এর বিস্তৃতির ক্রমবর্ধমান ধারা লক্ষ করা যায়। ঘরানা মূলত বংশানুক্রমিক গঠিত হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে খানদানি শব্দটি বহুল প্রচলিত। খানদানি শব্দের প্রচলন শুরু হয় রাজসভা থেকে। কোন বংশ বা সংগীত সম্প্রদায়ের শিল্পী কোন সম্রাটের দরবারে যাতায়াত করে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করলে তিনি খানদানি মর্যাদা পেতেন এবং তার পরবর্তী বংশধরেরাও এই মর্যাদা বহন করতেন। একসময় খানদানি ও ঘরানা এই দুটি শব্দের অর্থ একই মনে করা হত। তানসেনের দৌহিত্র বংশের প্রখ্যাত গুণী রামপুর স্টেটের ওস্তাদ উজীর খাঁ সাহেব এই খানদানি উপাধি লাভ করেন। তানসেনের পুত্র-পৌত্রদের ধারা পশ্চিম দিকে চলে গিয়ে সেনী ঘরানা নামে আত্মপ্রকাশের পর তাঁদের আর খানদানি বলা হত না কারণ বাদশা বা সম্রাটদের সাক্ষাৎ পৃষ্ঠপোষকতা থেকে ঐ সম্প্রদায় বিচ্যুত হয়ে গিয়েছিল।

বিভিন্ন ঘরানার শিক্ষা পদ্ধতি, ঘরানার বৈশিষ্ট্য ও তালিমের ক্ষেত্রে যথেষ্ট পার্থক্য বিদ্যমান। পূর্বে এই তালিমের নিয়মপ্রণালী গোপন রাখা হত। ঘরানার বিদ্যা ও তালিম পদ্ধতি যাতে অন্য কোন সংগীত সম্প্রদায় বা পরিবারের কাছে না যায় সেদিকে গুরুরা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতেন এবং শিষ্যদেরও সতর্ক করে দিতেন। বিশেষ করে মুসলমান ওস্তাদরা এই সতর্কতা অধিক অবলম্বন করতেন বলে জানা যায়। এই কঠোর নিয়মাবলীর কারণে অনেক ঘরানার বন্দিশ চিহ্নিত হত সেই ঘরানার নিজস্ব সম্পদ বলে। ঘরানাদার শিল্পীরা নিজ ঘরানার বন্দিশ ব্যতীত অন্য ঘরানার গান গাইতেন না কারণ অন্য ঘরানার গান করাকে অসৌজন্য মনে করা হত। শুধু বন্দিশের সুর নয়, বাণী প্রয়োগেও ঘরানা ভেদে পার্থক্য বিদ্যমান। প্রত্যেকটি ঘরানায় কতগুলি বৈশিষ্ট্য এবং বৈচিত্র্য রয়েছে। এই বৈশিষ্ট্যের কারণেই ঘরানা পৃথক করা সহজ হয় এবং ঘরানার সংগীতজ্ঞদেরও পৃথকভাবে চেনা যায়।

কণ্ঠসংগীত, যন্ত্রসংগীত ও নৃত্যের প্রচলিত ঘরানাগুলো নিজ বৈশিষ্টের কারণে একটি অন্যটি থেকে ভিন্ন। ধারাবাহিকতা রক্ষা করাই এইসকল ঘরানার অন্যতম লক্ষণ। আলোচ্য গবেষণায় সাংগীতিক বৈশিষ্ট্যসহ কণ্ঠ, যন্ত্র ও নৃত্যের ঘরানার আলোচনা করা হলো।

কণ্ঠসংগীত ও যন্ত্রসংগীতের ঘরানা

সেনী ঘরানা

সংগীত সম্রাট তানসেন (১৫২০-১৫৮৯) বংশীয় সংগীতজ্ঞদের ঘরানা সেনী ঘরানা নামে পরিচিত। এই বংশে কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীতের অসংখ্য দিগ্বিজয়ী শিল্পী জন্মগ্রহণ করেছেন। যদিও সেনী ঘরানার নির্দিষ্ট পরিচিতি আজ প্রায় লুপ্ত তথাপি ঘরানার বৈশিষ্ট্য আলোচনা এই ঘরানা দিয়েই আরম্ভ করা উচিৎ। এটি প্রধানত: ধ্রুপদ ঘরানা। সংগীত সম্রাট তানসেনের জন্ম ও মৃত্যু নিয়ে অনেক মতভেদ থাকলেও অধিকাংশের মতে তাঁর জন্ম গোয়ালিয়রের নিকটবর্তী বেহট গ্রামে হয়েছিল। তানসেনের হিন্দু নাম ছিল রামতনু পাণ্ডে। তাঁর পিতার নাম ছিল মকরন্দ পাণ্ডে। মাত্র বার বছর বয়সে তিনি স্বামী হরিদাসের শিষ্যত্ব লাভ করে গুরুর সাথে মথুরায় চলে যান এবং শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি গোয়ালিয়রে ফিরে আসেন। তানসেনের সুরেলা কণ্ঠে মুগ্ধ হয়ে রাণী মৃগনয়নী তার সংগীত বিদ্যালয়ে তানসেনকে শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করেন এব সেখানেই সুকণ্ঠী হুসেনী বাক্ষণীর সাথে তাঁর বিবাহ হয়। বিবাহের সময় তানসেন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং তাঁর নামকরণ হয় আতা আলী খাঁ। পরবর্তী সময়ে তিনি রেওয়ার রাজা রামচন্দ্র বঘেলার সভাগায়ক পদে নিযুক্ত হন। জানা যায় দিল্লীর সম্রাট আকবর একবার রেওয়াতে বেড়াতে এসে তানসেনের সংগীতে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে 'তানসেন' উপাধি দেন এবং দিল্লীর রাজসভায় নবরত্নের সদস্যরূপে তাঁকে নিযুক্ত করেন।

তানসেন চারটি তুক্যুক্ত সহস্রাধিক ধ্রুপদ রচনা করেছেন। তিনি যে রাগগুলি রচনা করেছেন তার নামকরণে মিঞা, দরবারী প্রভৃতি শব্দে তাঁর পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন : মিঞা কি টোড়ী, মিঞা কি মল্লার, মিঞা কি সারং, দরবারী কানাড়া ইত্যাদি। আকবরের রাজত্বকালে মোট আটজন 'নায়ক' উপাধি প্রাপ্ত সংগীতজ্ঞ ছিলেন। তাঁরা হলেন- তানসেন, বৈজুবাওরা, মানসিংহ তোমর, গোপাল, বখশু, ভগবান, জৌনপুরের সুলতানা হুসেন শর্কী এবং মালওয়ার রাজবাহাদুর। এঁদের সকলের মধ্যে তানসেন ছিলেন শ্রেষ্ঠ। নায়ক তাঁদেরই বলা হত যাঁরা গায়ক হওয়ার পাশাপাশি বিদ্বান ছিলেন। এঁরা যেমন গাইতেন তেমনি শিষ্যদের সংগীত ও তার তত্ত্বগত দিকগুলোর শিক্ষা দান করতেন। এই নায়ক শব্দের অর্থ এখানে পণ্ডিত বোঝায় না। পণ্ডিত তাদেরকেই বলা হত যারা শুধুমাত্র বিদ্বান ছিলেন। এক্ষেত্রে সংগীতে দক্ষতা না থাকলেও সকল বিদ্বানই পণ্ডিত বলে আখ্যায়িত ছিল।[১]

তানসেনের চার পুত্র যথাক্রমে সুরত সেন, তরঙ্গ সেন, শরত সেন ও বিলাস খাঁ এবং এক কন্যা সরস্বতী। প্রসিদ্ধ বীণাবাদক মহারাজা সমোখন সিংহের পুত্র মিশ্রী সিংহের সাথে তানসেনের কন্যা সরস্বতীর বিবাহ

হয়। আনুমানিক ১৫৮৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তানসেনের মৃত্যু হয় এবং তাঁর ইচ্ছানুযায়ী গোয়ালিয়র ফকির হজরত মহম্মদ গৌসের সমাধির কাছে তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। তানসেনের পুত্র কন্যা সকলেই অত্যন্ত বিচক্ষণ সংগীতজ্ঞ ছিলেন।

তানসেনের মৃত্যুর পরই সেনী ঘরানার উদ্ভব হয়। এই ঘরানায় তিনটি শাখার উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রথম শাখাটির বৈশিষ্ট্য ছিল গৌড়বাণীর ধ্রুপদ এবং এই শাখাটি উদ্ভব করেন তানসেনের কনিষ্ঠপুত্র বিলাস খাঁ। দ্বিতীয় শাখার উদ্ভাবক তানসেন পুত্র সুরত সেন। এই ঘরানার গায়কেরা ডাগরবাণীর ধ্রুপদ গাইতেন এবং এই বংশের অধিকাংশ সদস্যই জয়পুরে বসবাস করতেন। তৃতীয় শাখার উদ্ভাবক তানসেনের জামাতা মিশ্রী সিং (নৌবৎ খাঁ) তিনি সম্রাট আকবরের দরবারের প্রসিদ্ধ বীণকার ছিলেন। তাই তাঁর বংশধরেরাও বীণকার হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ডাগর ও খাণ্ডার এই দুই বাণীর ধ্রুপদের চর্চাই ছিল এই শাখার বৈশিষ্ট্য।

উপর্যুক্ত আলোচনায় স্পষ্ট হয় যে সেনী ঘরানার প্রতিষ্ঠাতা হলেন তানসেনের কনিষ্ঠ পুত্র বিলাস খাঁ। আনুমানিক ১৫৪৮ সালে বিলাস খাঁ'র জন্ম হয়। সম্রাট আকবরের ধারণা মতে তানসেনের পর বিলাস খাঁ-ই ছিলেন শ্রেষ্ঠ গায়ক। তিনি গুণী সংগীতানুরাগী হওয়ার পাশাপাশি অত্যন্ত সহজ সরল ভাবে জীবনযাপন করেছেন। তাঁর নামানুসারেই 'বিলাস খানী টোড়ী' রাগের নামকরণ করা হয়। এই নামকরণের বিষয়ে একটি ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় যে, তানসেন তাঁর পুত্রদের বলেছিলেন যে তাঁর মৃত্যুর পর যেন মৃতদেহের চারপাশে তাঁর চার পুত্র বসে গান গায় এবং যার গান শুনে তাঁর মৃতদেহ নড়ে উঠবে, সেই হবে তানসেনের সংগীতের প্রকৃত উত্তরাধিকারী ও ধারক। পিতার নির্দেশানুযায়ী চারপুত্র মৃতদেহের চারপাশে সংগীত পরিবেশন করেন। শেষ পরিবেশনায় কনিষ্ঠ পুত্র বিলাস খাঁ যখন টোড়ী রাগে রচিত 'কৌন ভ্রম ভুলায়ে মন অজ্ঞানী' ধ্রুপদটি গান তখন নাকি মৃত তানসেনের হাত নড়ে উঠে। সেইসময় থেকেই 'বিলাস খানী টোড়ী' রাগের উৎপত্তি।[২]

বিলাস খাঁ'র বংশের শিল্পী জীবন খাঁ'র দ্বিতীয় পুত্র হৈদর খাঁ ছিলেন অত্যন্ত গুণী বীণাবাদক। বীণাবাদনের পাশাপাশি তিনি ধ্রুপদ গায়করূপেও প্রসিদ্ধ ছিলেন। হৈদর খাঁ বেতিয়া ও লক্ষ্ণৌর রাজদরবারে সভা গায়ক হিসাবে নিযুক্ত থাকার সময় তিনি বেতিয়ার রাজা আনন্দকিশোরকে সংগীতে তালিম দেন। পরবর্তী কালে আনন্দকিশোর বিখ্যাত ধ্রুপদীরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। জীবন খাঁ'র তৃতীয় পুত্রের নাম বাহাদুর খাঁ। তিনি বিষ্ণুপুরের সভার সংগীতজ্ঞ থাকাকালীন অনেক শিষ্যমণ্ডলী গড়ে তোলেন। শোনা যায় যে তাঁর শিষ্য পরম্পরার মাধ্যমেই পরবর্তী কালে বিষ্ণুপুর ঘরানার উৎপত্তি হয়। তবে এই বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে।

জীবন খাঁ'র ভ্রাতা ছজ্জু খাঁ'র জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন জাফর খাঁ। সেনী ঘরানার এই শিল্পী একদিকে যেমন ছিলেন নিপুণ বীণাবাদক অন্যদিকে তেমনি ছিলেন সুদক্ষ ধ্রুপদ গায়ক। বেতিয়া ও রেওয়া রাজ্যের দরবারী গায়ক হিসাবে তিনি নিযুক্ত ছিলেন। 'সুর শৃঙ্গার' বাদ্যযন্ত্রের আবিষ্কারক হিসেবে তাঁর নাম পাওয়া যায়। তাঁর শিষ্যের মধ্যে বংশধর ব্যতিরেকে বাহাদুর সেন, বেতিয়ার রাজা নওল কিশোর, গোয়ালিয়রের গোলাম আলী খাঁ ও রেওয়ার মহারাজা বিশ্বনাথ সিংহের নাম উল্লেখযোগ্য। ছজ্জু খাঁ'র দ্বিতীয় পুত্র প্যার খাঁ একজন প্রতিভাবান সংগীতজ্ঞ ছিলেন। বীণাবাদন ও ধ্রুপদ গায়নে তিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জাফর খাঁ'র মত খ্যাতি অর্জন করেন। তিনিও বেতিয়া ও রেওয়ার দরবারের সভাগায়ক হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। সেইসময় তাঁর শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে রাজা আনন্দকিশোর (বেতিয়া), গোলাম আলী খাঁ (গোয়ালিয়র), তানরস খাঁ (দিল্লী), গুরুপ্রসাদ মিশ্র, বক্তিয়ারজী (বক্তিয়ার খাঁ) ও শিবনারায়ণ মিশ্রের নাম উল্লেখযোগ্য। ছজ্জু খাঁ'র তৃতীয় পুত্র বাসত খাঁ'র জন্ম হয় আনুমানিক ১৭৮৭ সালে দিল্লীতে। পিতা বিখ্যাত গায়ক হওয়া সত্ত্বেও প্রসিদ্ধ রবাববাদক জ্ঞান খাঁ- বাসত খাঁকে দত্তক নিয়ে সংগীতে তালিম দেন। বাসত খাঁ রবাববাদক হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করলেও তিনি ছিলেন একজন দক্ষ গায়ক। তাঁর অনেক শিষ্যের মধ্যে রাজা হরকুমার (কলকাতা) ও ন্যামতুল্লা খাঁ উল্লেখযোগ্য।

সেনী ঘরানার শ্রেষ্ঠ সংগীতজ্ঞের একজন হচ্ছেন বাহাদুর সেন (বাহাদুর হুসেন)। তাঁর মাতামহ ছিলেন ছজ্জু খাঁ। মাতৃকুলের প্রসিদ্ধ সংগীতজ্ঞ জাফর খাঁ, প্যার খাঁ, বাসত খাঁ প্রমুখের কাছে তাঁর সংগীতের শিক্ষা শুরু হয়। প্যার খাঁ নিঃসন্তান থাকায় তিনি বাহাদুর সেনকে দত্তক নেন এবং উত্তম তালিম দেন। বাহাদুর সেন একদিকে যেমন ছিলেন শ্রেষ্ঠ বীণা, রবাব ও সুরশৃঙ্গার বাদক; অন্যদিকে তেমনি ছিলেন অদ্বিতীয় গায়ক, সংগীত রচয়িতা ও গুণী শিক্ষক। বাহাদুর সেন নিঃসন্তান থাকায় জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি সাধনায় ব্যয় করেছেন। তাঁর রচিত অসংখ্য তারানা রয়েছে। বাহাদুর সেনের শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে আবিদ আলী খাঁ, অসদ আলী খাঁ (সরোদ, ধ্রুপদ), গোলাম নবী (শোরি মিঞা), আলী হুসেন খাঁ, মুহম্মদ হুসেন খাঁ (বীণা), ইনায়েত হুসেন খাঁ (ধ্রুপদ, তারানা), হৈদর আলী ও তৎপুত্র সাদাত আলী খাঁ, আলী বক্স খাঁ, ফতে আলী খাঁ (পাঞ্জাব), কুতুব বক্স খাঁ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। ১৮৭০ সালে সেনী ঘরানার এই মহানশিল্পী মৃত্যুবরণ করেন।[৩]

বিলাস খাঁ'র বংশীয় কাজম আলী খাঁ'র পুত্র কাশিম আলী খাঁ সেনী ঘরানার একজন বিখ্যাত শিল্পী হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এছাড়া বাসত খাঁ'র দুইপুত্র মহম্মদ খাঁ (বড়কু মিঞা) ও মহম্মদ আলী খাঁ এই ঘরানার দুই উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাঁরা একাধারে গায়ক, রবাব ও সুরশৃঙ্গার বাদক ছিলেন। এছাড়া তানসেন বংশীয় রাজরস খাঁ'র পুত্র মসীদ খাঁ তৎকালীন শ্রেষ্ঠ সেতার ও সুরবাহার বাদক ছিলেন। সেইসময় সেতারে

তিনটি তার ছিল। মসীদ খাঁ সেই তিন তারের সাথে আরো দুটি তার যুক্ত করে বিলম্বিত ও দ্রুত খেয়ালের ভিত্তিতে মসীদখানী ও রজাখানী বাদনশৈলী প্রবর্তন করেন। এক্ষেত্রে বিলম্বিত খেয়ালের বাদনশৈলীর নাম হয় মসীদখানী এবং দ্রুত খেয়ালের বাদনশৈলীর নাম হয় রজাখানী। তবে কেউ কেউ মনে করেন যে মসীদ খাঁ তাঁর প্রিয় শিষ্য গোলাম রেজার নামেই রজাখানী বাজ সৃষ্টি করেছিলেন। আবার কারো মতে স্বয়ং গোলাম আলীই ছিলেন রজাখানী বাজের আবিষ্কারক। এই দুটি বাদনশৈলীর শ্রেষ্ঠ বাদক হিসাবে মসীদ খাঁ'র দ্বিতীয় পুত্র বাহাদুর খাঁ'র নাম পাওয়া যায়।

সেনী পরম্পরার বাহাদুর খাঁ'র পৌত্র তথা সুখসেনের পুত্র রহিম সেন অত্যন্ত প্রতিভাবান সংগীতজ্ঞ ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর দুলহে খাঁ'র (শ্বশুর) পরামর্শ অনুযায়ী তিনি সেতার চর্চা শুরু করে। সেইসময় সেতার ছিল একটি অপ্রচলিত বাদ্যযন্ত্র। তিনি বিভিন্ন সভায় সেতার বাদন পরিবেশনের মাধ্যমে সেতার যন্ত্রকে অপেক্ষাকৃত জনপ্রিয় করে তোলেন। রহিম সেনের দ্বিতীয় পুত্র অমৃত সেন (১৮১৩-১৮৯৩) সেনী ঘরানার একজন শ্রেষ্ঠ সেতারবাদকরূপে স্বীকৃত। তিনি জয়পুরের মহারাজা সওয়াই রাম সিংহের (১৮৩৫-১৮৮০) দরবারী সংগীতজ্ঞ ও সংগীত গুরু ছিলেন। দরবারে থাকাকালীন অমৃত সেন ক্রমাগত আট সন্ধ্যা মহারাজাকে কল্যাণ রাগ বাজিয়ে শোনান। মহারাজা তাঁর পাণ্ডিত্য এবং প্রতিভার জন্য তাঁকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। তৎকালীন সংগীতজ্ঞদের মধ্যে খ্যাতি, অর্থ ও জনপ্রিয়তার দিক থেকে তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ। মহারাজার মৃত্যুর পর অমৃতসেন দিল্লী যান এবং কিছুদিন আলোয়ারের মহারাজা শিবদীন সিংহের দরবারে নিযুক্ত থাকার পর জয়পুরে ফিরে আসেন ও সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন। জয়পুরে তিনি এক বিশাল শিষ্যমণ্ডলী রেখে গেছেন। সেইসকল সেতার বাদকেরা আজও নিজেদের অমৃত সেনের শিষ্যগোষ্ঠীর অন্তর্গত বলে গর্ববোধ করেন। অমৃত সেনের দত্তক পুত্র নিহাল সেন অত্যন্ত গুণী সেতারবাদক ছিলেন। নেহাল সেনের পিতার নাম ছিল উজীর খাঁ। নিহাল সেন জয়পুরের মহারাজা মাধো সিংহের দরবারে নিযুক্ত থাকাকালীন ভ্রাতা আমীর খাঁ'র দুই পুত্র ফিদা হুসেন ও ফজলে হুসেনের সাথে তাঁর দুই কন্যার বিবাহ দেন এবং দুই জামাতাকেই উত্তমরূপে জয়পুর সেতার ঘরানার তালিম দেন। ৫০ বছর বয়সে ফিদা হুসেন জয়পুরে মারা যান। ফিদা হুসেনের পিতা আমীর খাঁ ছিলেন উজীর খাঁ'র দ্বিতীয় পুত্র। আমীর খাঁ বিখ্যাত সেতারবাদক ছিলেন এবং মাতুল অমৃত সেনের কাছেই সংগীতে তালিম নিয়েছিলেন। পরবর্তী কালে অমৃত সেনের পর আমীর খাঁ'ই শ্রেষ্ঠ সেতারবাদকরূপে স্বীকৃত। সেনী ঘরানার আরেক সেতারবাদক হিসাবে আশীক আলী খাঁ ছিলেন বিখ্যাত। বেনারসের এক সংগীত পরিবারে তাঁর জন্ম। শোনা যায় তাঁর বংশের কেউ পুরস্কার স্বরূপ বেনারসে বসবাস যোগ্য ভূমি পাওয়ায় তাঁরা বেনারসবাসী হন। বরিশ আলী খাঁ, বরকতুল্লা খাঁ প্রমুখ গুরুর নিকট শিক্ষালাভের পর তিনি অতিগুণী সেতারীরূপে দেশজোড়া খ্যাতি

অর্জন করেন। তাঁর শিষ্যের মধ্যে মুস্তাক আলী খাঁ (পুত্র), অমিয় লাল ভট্টাচার্য, সিদ্ধেশ্বরী দেবী, আনোয়ারী বেগম, ড. গোপীনাথ গোস্বামী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

সেনী ঘরানার অন্তিম সেতারবাদক মুস্তাক আলী খাঁ'র জন্ম হয় ১৯১১ সালে। আশীক আলী খাঁ'র নিকট শিক্ষালাভের পর তিনি আকাশবাণীসহ দেশ বিদেশের বিভিন্ন সংগীতানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেন এবং বিভিন্ন পুরস্কারে পুরষ্কৃত হয়। ১৯৮৯ সালের ২১ জুলাই কলকাতায় তাঁর মৃত্যু হয়। অতিশয় উদার প্রকৃতির এই সংগীতজ্ঞের শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে অরুণ কুমার চ্যাটার্জী, নিখিল ব্যানার্জী, শর্মিষ্ঠা সেন, নির্মল কুমার গুহঠাকুরতা, নৃপেন্দ্রনাথ গুহ, বাসনা সেন, অশোক ঘোষ, দেবব্রত চৌধুরী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

বলা বাহুল্য যে সেনী ঘরানার বিকাশের উৎস হচ্ছে তানসেন বংশ। এই বংশের সংগীতজ্ঞেরা এমনভাবে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়েছেন যে বর্তমানকালে তাঁদের প্রকৃত পরিচয় খুঁজে পাওয়া কঠিন। এই ঘরানার শিল্পীরা সর্বত্র বিদ্যমান থাকলেও আজ আর আলাদা করে তাঁদের চিহ্নিত করা যায় না।

সেনী ঘরানার বিখ্যাত সংগীতজ্ঞদের চিত্র:

ওস্তাদ ওয়াজির খাঁ[৪]

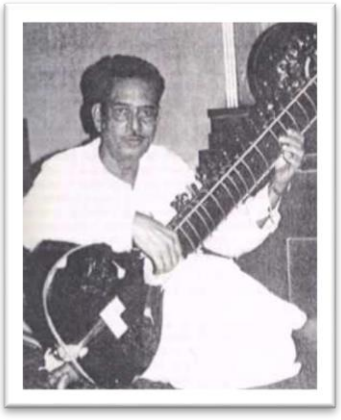

ওস্তাদ মুস্তাক আলী খাঁ[৫]

তথ্য ও চিত্রসূত্র

১) অমল দাশ শর্মা, *প্রাচীন ও নবীন সংগীতজ্ঞ এবং ঘরানার ইতিবৃত্ত*, দরবারী প্রকাশন, কলকাতা: ১৯৯৫

২) দিলীপ কুমার মুখোপাধ্যায়, *ভারতীয় সংগীতে ঘরানার ইতিহাস*, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী প্রা:লি:, কলকাতা: ১৩৮৪

৩) অমল দাশ শর্মা, *প্রাচীন ও নবীন সংগীতজ্ঞ এবং ঘরানার ইতিবৃত্ত*, দরবারী প্রকাশন, কলকাতা: ১৯৯৫

৪) https://en.wikipedia.org /wiki/ Wazir_Khan_ (Rampur)#/ media/File:Des cendant _of_ Naubat_Khan _Chief _Musician_ of_Hamid_ Ali_Khan_of_R ampur%27s_court.jpg

৫) https://www.youtube.com/watch?v=yF0Jd9DsApw

ডাগর ঘরানা

ডাগর ঘরানা সৃষ্টির সঠিক ইতিহাসের বিবরণ না পাওয়া গেলেও জানা যায় যে, বহরম খাঁ ও তাঁর পিতার আমল থেকেই ধ্রুপদ গায়নের এই ঘরানা বিস্তার লাভ করে। সেনী ঘরানা থেকে এটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি ধ্রুপদ সংগীত ঘরানা। বহুপূর্ব হতেই এই বংশের সংগীতজ্ঞরা ডাগরবাণীর ধ্রুপদ সাধক ছিলেন এবং ডাগরবাণীর সাথে বংশানুক্রমে একাত্ম হওয়ার ফলে এই ঘরানার পূর্ব সাধকেরা ডাগর ঘরানাদার হয়েছিলেন। ডাগর ঘরানার যারা ধারক বা বাহক ছিলেন তাঁদের সাথে সেনী ঘরানার সংগীতজ্ঞদের কোন যোগাযোগের সম্পর্ক পাওয়া যায় না। ডাগর ঘরানার শিল্পীরা সেনী ঘরানার তানসেন, বৈজু বাওরা বা গোপাল নায়ক রচিত ধ্রপদের কোন বন্দিশ গেয়ে থাকলেও এঁরা সেনী ঘরানা দ্বারা কোনভাবেই প্রভাবিত ছিলেন না এবং সেনী ঘরানার ওস্তাদদের কাছে কখনোই সংগীতে শিক্ষালাভ করেননি। ডাগর ঘরানার গায়কেরা তাঁদের বংশীয়দের কাছ থেকেই শিক্ষালাভ করেন। কখনো কখনো তাঁরা নিজ বংশ ব্যতিরেকে বৃন্দাবনের কিছু আচার্যের অধীনে শিক্ষালাভের সুযোগ পান। যেহেতু ডাগর ঘরানার পূর্বসূরীরা অনেকটা সময় ব্রজমণ্ডলের অধিবাসী ছিলেন তাই এই ঘরানার সঙ্গে ব্রজধামের সাধু সংগীতাচার্য স্বামী হরিদাসের একটা আত্মিক যোগাযোগ ছিল বলে জানা যায়। ডাগর ঘরানার দিকপাল বলে প্রসিদ্ধ বাবা গোপাল দাস ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার পর তাঁর নাম হয় ইমাম খাঁ। ধর্ম ও নাম পরিবর্তন হলেও অপরিবর্তিত থাকে তাঁর সংগীতজীবন ও বিদ্যাচর্চা। বাবা গোপাল দাস গুণীগায়ক হওয়ার পাশাপাশি শাস্ত্রে তাঁর ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য। বংশীয় ধারায় তিনি ধ্রুপদ চর্চা অব্যাহত রাখেন। তাঁর পূর্ব পুরুষেরা সকলেই সংগীতসাধক ছিলেন। তাঁর পূর্বপুরুষদের মধ্যে প্রথম সংগীতগুণী হিসাবে মঙ্গলপাণ্ডের নাম পাওয়া যায়। জানা যায় যে, গোপাল দাসের পূর্বে প্রায় বিশ পুরুষ ছিলেন যারা সংগীতের চর্চা করতেন এবং গোপাল দাসের পুত্র থেকে বর্তমান ঘরানার আমীনুদ্দীন ডাগর পর্যন্ত ছয় পুরুষ রয়েছে যাদের সংগীত সাধনার কারণেই ডাগর ঘরানা প্রসিদ্ধি লাভ করে। মঙ্গলপাণ্ডের সময় সঠিকভাবে পাওয়া যায় না তবে জানা যায় যে, তিনিই ছিলেন এই ঘরানার আদি গায়ক। মঙ্গলপাণ্ডের পর সত্যদেব পাণ্ডের নাম পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন সাধক গায়ক ও স্বামী হরিদাসের শিষ্য। তারও অনেক পরে পাওয়া যায় ব্রহ্মানন্দের নাম যিনি পণ্ডিত ব্যক্তি ও দক্ষ ধ্রুপদ গায়ক ছিলেন। সংগীতের এইসকল সাধকেরা সকলেই ব্রজমণ্ডলের অধিবাসী ছিলেন।[১]

অনুমান করা হয় যে আঠারো শতকের শেষাংশে জন্মগ্রহণ করেন বাবা গোপাল দাসের পুত্র বহরম খাঁ। ঊনিশ শতকের মধ্যভাগে একজন প্রসিদ্ধ গায়করূপে তাঁর নাম পাওয়া যায়। সমকালীন সংগীতজগতে তিনি এক দিক্‌পাল ধ্রুপদী ছিলেন। তাঁর কাছে রাগবিদ্যা শিক্ষালাভ করেন প্রসিদ্ধ বীণকার বন্দে আলী খাঁ (ভাগিনেয়), সদ্দু খাঁ ও আকবর খাঁ (পুত্র), মহম্মদ জান (ভাতৃষ্পুত্র) এবং পরবর্তী কালে মহম্মদ

জানের দুইপুত্র জাকির উদ্দীন ও আল্লাবন্দে। নিজ বংশ ব্যতিরেকে বহরম খাঁ'র কাছে পাঞ্জাবের আলী বক্স ও ফতে আলী, গোখী বাঈ, আব্দুল খাঁ প্রমুখ প্রসিদ্ধ খেয়ালগায়ক সংগীতশিক্ষা লাভ করেন। এভাবেই ডাগর ঘরানার শতবর্ষজীবী বহরম খাঁ এই ঘরানার ধারক, বাহক ও শিক্ষকরূপে সে যুগে ধ্রুপদী এই পরিবারকে সংহত ও সংগঠিত করেছিলেন। বহরম খাঁ দিল্লীতে কিছুদিন অবস্থানের পর জয়পুরের মহারাজা রামসিংয়ের আমন্ত্রণে সেখানকার দরবারী গায়করূপে নিযুক্ত হন এবং জয়পুরের মহারাজার প্রদত্ত কোঠিতে সপরিবারে বসবাস শুরু করেন। সেখানে বহরম খাঁ শিষ্যদের নিজ বাসস্থানে স্থান দিয়ে এবং সন্তানের মত স্নেহ দিয়ে প্রাচীন গুরুকুলের আদর্শে সংগীতশিক্ষা দিতেন। বহরম খাঁ শাস্ত্রে একজন পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ছিলেন সংস্কৃত পণ্ডিত। বৃন্দাবন থেকে শিক্ষালাভের পর তিনি ব্রজভাষায় অনেক কবিতা রচনা করেন। তাঁর রচিত ধ্রুপদের অনেক বন্দিশ তিনি নিজে গাইতেন। সেইসকল বন্দিশ আজও এই ঘরানায় প্রচলিত আছে। বহরম খাঁ'র দুই পুত্র সদ্দু খাঁ ও আকবর খাঁ, পৌত্র এনায়েত খাঁ, ভাতৃস্পুত্র আল্লাবন্দে খাঁ এবং তাঁর পুত্র নাসির উদ্দিন খাঁ সহ এই বংশের গুণী গায়কেরা বহরম খাঁ'র প্রভাবে গায়ক হওয়ার অতিরিক্ত বিদ্বানরূপেও প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ইসলাম ধর্মের কারণে মঙ্গলপাণ্ডে, সত্যদেব পাণ্ডে, বাবা ব্রহ্মনন্দ কিংবা তাঁর পিতা গোপাল দাসের সঙ্গে বহরম খাঁ'র সংগীতজীবনে কোন তারতম্য ঘটেনি। সেই অবিচ্ছিন্ন ধারার অন্যতম উত্তরসাধক বহরম খাঁ পিতা গোপালদাস ভিন্ন বাবা কালিদাসের কাছেও সংগীতশিক্ষা গ্রহণ করেন। বৃন্দাবন নিবাসী বাবা কালিদাস ছিলেন হরিদাস স্বামীর শিষ্যবংশীয়। বহরম খাঁ দীর্ঘ বিশ বছর বাবা কালিদাসের অধীনে শাস্ত্রচর্চা ও সংগীতশিক্ষা লাভ করেন। সত্যদেব পাণ্ডে হরিদাস স্বামীর শিষ্য আর বহরম খাঁ হরিদাস স্বামী পরম্পরার বাবা কালিদাসের শিষ্য হওয়ায় এঁরা ছিলেন একই ঐতিহ্যের অনুসারী। বহরম খাঁ যেমন তাঁর পূর্বপুরুষদের কাছে যুগপৎ সংগীতের প্রেরণা পেয়েছিলেন তেমনি তিনি নিজেও তাঁর উত্তরসূরীদের সংগীত ও বিদ্যাচর্চার প্রেরণা ছিলেন। সংগীতের সঙ্গে শাস্ত্র চর্চার অনুশীলন এই বংশে বহুপূর্ব হতেই বিদ্যমান থাকায় বহরম খাঁ তাঁর সংগীত সাধনার রীতি ও জ্ঞানবিদ্যার চর্চাতে বংশের ধারাই অবলম্বন করেন। তাঁর পূর্ব-পুরুষেরা যেমন ভগবদ্ উপাসনার মার্গ স্বরূপ ধ্রুপদের সাধনায় নিমগ্ন থাকতেন তেমনি বহরম খাঁ'র ধ্রুপদে তাঁর পূর্বপুরুষদের মত ওম অন্তরম্ তুম, তরণ তারণ তুম্, হে হরিনারায়ণ ওম্ ইত্যাদি আলাপচারী করতেন। বহরম খাঁ তাঁর পুত্র সদ্দু খাঁ ও আকবর খাঁ এবং হৈদর খাঁ'র দুই পৌত্র জাফর উদ্দীন ও আল্লা বন্দে খাঁকে বংশ পরম্পরায় প্রাপ্ত সেই আলাপ সম্বলিত ধ্রুপদ সংগীতের শিক্ষা দেন। বাবা গোপাল দাসের পূর্ব থেকেই ডাগর ঘরানায় যুগলবন্দী ধ্রুপদ গায়নের প্রচলনের কথা শোনা যায়। জাফরুদ্দীন ও আল্লাবন্দে খাঁ বিখ্যাত যুগলবন্দী ধ্রুপদ গায়করূপে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁদের পৌত্র নাসির মৈনুদ্দীন ও নাসির আমিনুদ্দীন ডাগর ভাতৃদ্বয়ের দ্বৈতকণ্ঠে ধ্রুপদ শুধু ভারতবর্ষে নয়, পাশ্চাত্যের অনেক দেশেই জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। বহরম খাঁ বৃন্দাবন ত্যাগ করে দিল্লীতে বসবাস শুরু

করার পর থেকেই এই ঘরানায় বংশধরদের ব্রজভূমিতে বাসেরও ইতি ঘটে। বহরম খাঁ সিপাহী বিদ্রোহের (১৮৫৭) সময় দিল্লী ত্যাগ করেন এবং জয়পুরের রাজদরবারে নিযুক্ত হন। পরবর্তী সময়ে ডাগর ঘরানার বংশধরেরা কয়েকপুরুষ যাবৎ জয়পুর এবং উদয়পুরের দরবারী গায়ক হিসাবে নিযুক্ত থাকেন। জয়পুরে ডাগর ঘরানার একটি শাখা আজও বিদ্যমান। বহরম খাঁ'র ভাগিনেয় বন্দে আলী খাঁ তাঁর নিকট তালিম পান ঠিকই কিন্তু পরবর্তী কালে তিনি আর ডাগর ঘরানাদার থাকেননি। বন্দে আলী খাঁ ইন্দোরের রাজদরবারে বীণাবাদকরূপে নিযুক্ত হওয়ার পর দীর্ঘকাল সেইরাজ্যে বসবাস ও শিষ্যগঠনের মাধ্যমে 'ইন্দোর বীণকার ঘরানা' নামে একটি নতুন ঘরানার প্রবর্তন করেন। পরবর্তী কালে বন্দে আলী খাঁ, বহরম খাঁ'র ভাতৃস্পুত্র মহম্মদ জানের দুইপুত্র জাকির উদ্দীন ও আল্লাবন্দের সাথে তাঁর কন্যাদ্বয়কে বিবাহ দিয়ে ডাগর ঘরানার সাথে একটি পারিবারিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। সেইসূত্রে বীণকার জাকির উদ্দিন শ্বশুর বন্দে আলী খাঁ'র কাছে সংগীতে কিছু তালিম পেলেও ইন্দোর বীণকার ঘরানার অন্তর্ভুক্ত না হয়ে ডাগর ঘরানার সাথেই অবিচ্ছেদ্য থাকেন। বহরম খাঁ'র দুই পুত্র সদ্দু খাঁ ও আকবর খাঁ'র মধ্যে আকবর খাঁ বিদ্যা চর্চার পাশাপাশি ঈশ্বর ভক্তিপরায়ণ ও সাধু ছিলেন আর সদ্দু খাঁ ছিলেন প্রসিদ্ধ গায়ক ও বিদ্বান। সদ্দু খাঁ তাঁর পুত্র এনায়েত খাঁকে সংগীতের উপযুক্ত শিক্ষা দিয়েছিলেন।[২]

এনায়েত খাঁ ছিলেন ডাগর ঘরানার একটি রত্নস্বরূপ– তিনি অনবদ্য ধ্রুপদ গায়ক ছিলেন। ব্রজভাষায় তিনি অসংখ্য কবিতা ও গান রচনা করেন। তাঁর রচিত ধ্রুপদের বন্দিশ আজও এই ঘরানায় গাওয়া হয়ে থাকে। বংশীয় ব্যতিরেকে তাঁর শিষ্যদের মধ্যে ভিণ্ডীবাজার ঘরানার কালে খাঁ ও নাজির খাঁ (খেয়াল), তজম্মুল খাঁ ও আলতাফ খাঁ (খেয়াল), জয়পুরের ধ্রুপদী সেতারী ইমাম বক্সের নাম উল্লেখযোগ্য। এনায়েত খাঁ'র পুত্র রিয়াজুদ্দীন ছিলেন বিখ্যাত কবি ও গীত রচনাকার। তিনিও এই ঘরানায় বহু বন্দিশ রচনা করেন। আল্লাবন্দে খাঁ'র পুত্র নাসিরুদ্দীনের অকাল মৃত্যুর পর তাঁর পৌত্র মৈনুদ্দীন ও আমিনুদ্দীনকে তিনি তালিম দেন। ডাগর ঘরানার চার পুরুষ বহরম খাঁ, সদ্দু খাঁ, এনায়েত খাঁ ও রিয়াজুদ্দীন জয়পুর দরবারে নিযুক্ত থেকে সেখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। রিয়াজুদ্দীন নিঃসন্তান থাকায় এখানেই বহরম খাঁ'র পুত্র বংশের ইতি ঘটে।

বহরম খাঁ আরো তালিম দেন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হৈদর খাঁ'র পুত্র মহম্মদ জানকে। তাঁর তালিমে মহম্মদ জান ধ্রুপদ গুণী হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। মহম্মদ জানের পুত্র ধ্রুপদী ও বীণাবাদক জাকিরুদ্দীন উদয়পুরের রাজদরবারে যোগ দেওয়ার কারণে উদয়পুর নিবাসী হন। জাকিরুদ্দীনের জ্যেষ্ঠপুত্র জিয়া মহিউদ্দীন ধ্রুপদ গায়ন ও বীণাবাদনে অত্যন্ত দক্ষতা অর্জন করেন। গায়নঅঙ্গে তিনি বীণা বাজাতেন এবং পাখোয়াজ সঙ্গতে উপজের কাজ করতেন। জয়পুর নিবাসী জিয়া মহিউদ্দীনই বর্তমানে ডাগর ঘরানার একমাত্র বীণকার।

আল্লাবন্দের চারপুত্রের মধ্যে নাসিরুদ্দীন সবচেয়ে বেশি খ্যাতি অর্জন করেন। প্রায় ২০ বছর প্রতিদিন ১৫/১৬ ঘণ্টা ধ্রুপদ সাধনার ফলে তিনি সর্বভারতে গুণী ধ্রুপদ গায়করূপে সম্মানের আসন পান। পিতা ব্যতীত চাচা জাকিরুদ্দীনের নিকটও তিনি তালিম পান। মাত্র ৪৭ বছর বয়সে তাঁর অকাল মৃত্যু হয়। আল্লাবন্দের দ্বিতীয় সন্তান ছিলেন ডাগর ঘরানার প্রবীনতম শিল্পী রহিমুদ্দীন। পরিবারেই সংগীতশিক্ষা গ্রহণের পর তিনি অসংখ্য বন্দিশ রচনা করেন। আল্লাবন্দের তৃতীয় সন্তান ইমামুদ্দীন ১৯৬৬ সালে মৃত্যুবরণ করেন এবং কনিষ্ঠ সন্তান হোসেনুদ্দীন আনুষ্ঠানিকভাবে পুনরায় হিন্দু ধর্ম গ্রহণ পূর্বক তানসেন পাণ্ডে নামে আমৃত্যু হিন্দুরূপে কলকাতায় অবস্থান করেন।

তানসেন বা সত্যদেব পাণ্ডের জীবিতকালেই ডাগর ঘরানার দুইজন উত্তর সাধকের পরিচয় পাওয়া যায়, তাঁরা হলেন নাসির মৈনুদ্দীন ও নাসির আমিনুদ্দীন। আল্লাবন্দের পৌত্র ও নাসিরুদ্দীনের পুত্র এই ভাতৃদ্বয় সংগীত সমাজে ডাগরভ্রাতা বলে সুপ্রসিদ্ধ। পিতার মৃত্যুর সময় তাঁদের বয়স ছিল যথাক্রমে ১৭ ও ১৩ বছর। পরবর্তী কালে এঁরা রিয়াজুদ্দীন ও জিয়াউদ্দীনের নিকট তালিম প্রাপ্ত হন। খুব অল্পসময়ের মধ্যেই এই ভাতৃদ্বয় স্বীয় প্রতিভাগুণে যুগলবন্দী পরিবেশনার মাধ্যমে প্রাচীন এই ঘরানার মুখোজ্জল করেন এবং ধ্রুপদ আবার ফিরে পায় তাদের লুপ্ত গৌরব ও প্রতিষ্ঠা। মৈনুদ্দীন ও আমিনুদ্দীনের ডাগর বংশ পরম্পরায় সম্পূর্ণ অঙ্গের আলাপ, অলংকার ও শুদ্ধ বাণীর ধ্রুপদ গায়নের মাধ্যমে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশে ভারতীয় সংগীতের জয়যাত্রা হয়। তাঁদের পিতা নাসিরুদ্দীনের সময় থেকেই ডাগর ঘরানার সাথে বাংলার সংযোগ ঘটে। তাঁর বাঙালি শিষ্য ছিলেন বিখ্যাত ধ্রুপদ গায়ক রমেশ চন্দ্র চক্রবর্তী। ১৯৬৬ সালে মৈনুদ্দীন ডাগরের মৃত্যুর পর আমিনুদ্দীন ডাগরই বাংলায় ডাগর ঘরানার উত্তরাধিকার রূপে বিদ্যমান থাকেন। ভ্রাতার স্মৃতিতে ১৯৭৫ সালে তিনি 'ওস্তাদ নাসির মৈনুদ্দীন ডাগর ধ্রুপদ সংগীত আশ্রম' প্রতিষ্ঠা করেন। এই ঘরানার পূর্বপুরুষ বাবা গোপাল দাস যেমন তাঁর সংগীতজীবনে ব্রজভূমিতে বিনামূল্যে শিষ্যদের সংগীতশিক্ষা দেন অথবা বহরম খাঁ জয়পুর কোঠির শিক্ষা মন্দিরে বিনাপারিশ্রমিকে সন্তানতুল্য মনে করে ছাত্রদের শিক্ষাদেন তেমনি আমিনুদ্দীন ডাগর নিঃস্বার্থ ও উদার হৃদয়ে বংশের ধারায় ধ্রুপদ সংগীত প্রচারের লক্ষে বিনামূল্যে শিষ্যদের নিয়মিত ধ্রুপদ শিক্ষা দেন।

ডাগর ঘরানার অন্যতম সাংগীতিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে আলাপচারীতে ওম অন্তরম তুম এর জায়গায় পরবর্তী কালে এইসকল বাণী পরিণত হয় নোম, তোম, তানা, দেরে না ইত্যাদি অর্থহীন শব্দে। বিলম্বিত ও দ্রুত উভয় লয়ই এই ঘরানার আলাপে বিদ্যমান। স্বরের ভাষায় রাগের সম্পূর্ণ আলাপের পর বাণী সম্বলিত গান শুরু হয়। ডাগর ঘরানায় যে ধ্রুপদ গাওয়া হয় তা ঈশ্বর আরাধনার মার্গ। এই ঘরানার গানে মেরুখণ্ড প্রয়োগ করা হয়। এমনি নানা লক্ষণের জন্য ডাগর ঘরানার গান সমগ্র ভারতে জনপ্রিয়তা অর্জনে সক্ষম হয়েছে।

ডাগর ঘরানার বিখ্যাত সংগীতজ্ঞদের চিত্র:

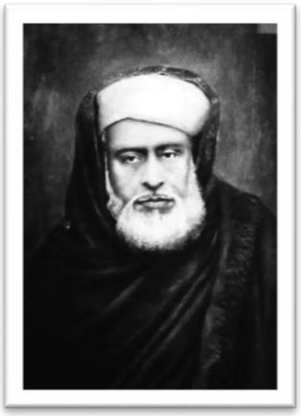

ওস্তাদ বহরম খাঁ [৩]

ওস্তাদ আল্লাবন্দে খাঁ [৪]

ওস্তাদ নাসির উদ্দিন খাঁ [৫]

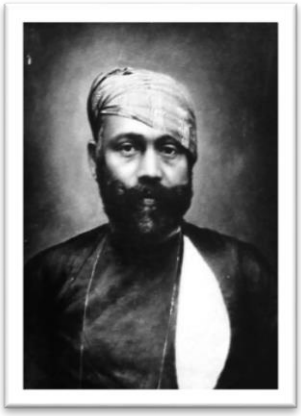

ওস্তাদ জাকিরউদ্দিন খাঁ [৬]

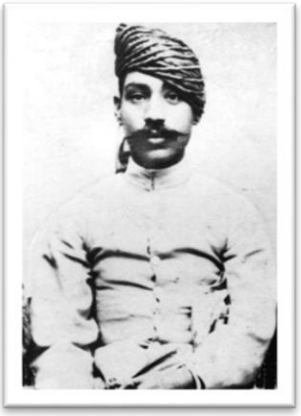

ওস্তাদ জিয়া উদ্দিন খাঁ [৭]

তথ্য ও চিত্রসূত্র

১) করুণাময় গোস্বামী, *সংগীতকোষ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা: ১৯৮৫

২) দিলীপ কুমার মুখোপাধ্যায়, *ভারতীয় সংগীতে ঘরানার ইতিহাস*, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী প্রা:লি:, কলকাতা: ১৩৮৪

৩) https://sama66.github.io/q3/maestros/baba-behram-khan

৪) http://www.dhrupad.info/allabande.htm

৫) http://www.dhrupad.info/nasiruddin.htm

৬) http://www.dhrupad.info/zakiruddin.htm

৭) http://www.dhrupad.info/ziauddin.htm

প্রসদ্দু মনোহর ঘরানা

প্রসদ্দু মনোহর ঘরানার ঐতিহ্য প্রায় দু'শ বছরের প্রাচীন। এই ঘরানার উৎসস্থল বারানসী। উনিশ শতকে এই ঘরানার উদ্ভব হয় এবং পরবর্তী কালে ক্রমে এটি ভারতের একটি বিখ্যাত সংগীত পরিবার হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। হরিপ্রসাদ মিশ্র এবং মনোহর মিশ্র নামক এই পরিবারের দুই সহোদরের নামে এই ঘরানার নামকরণ হয়েছে। এঁদের মধ্যে হরিপ্রসাদ কনিষ্ঠ থাকা সত্ত্বেও স্বীয় প্রতিভাগুণে তিনি অনেক খ্যাতিলাভ করেন এবং এরপরই তাঁর নাম সংক্ষিপ্ত আকারে প্রসদ্দু রূপে প্রচলিত হয়। পরিবারের সদস্য ছাড়াও অসংখ্য শিষ্য তৈরীর মাধ্যমে ধীরে ধীরে এই ঘরানা বিস্তার লাভ করে। মনোহর ও হরিপ্রসাদের পুত্র রাজকুমার, শিউসহায় ও রামসেবক তাঁদের যোগ্য উত্তরসূরী রূপে বংশধরদের সঙ্গে শিষ্য গঠন করার ফলে কণ্ঠসংগীত ও যন্ত্রসংগীতে এই ঘরানা আরো প্রসারিত হয়।

প্রসদ্দু মনোহর ঘরানার সূত্রপাত বারানসীতে হলেও এর উত্তরসূরীদের কলকাতায় যুক্ত থাকতে দেখা যায়। সেইজন্য এই ঘরানার উত্তরাধিকার বর্তায় বাঙালিদের মাঝে। মনোহর, হরিপ্রসাদ এবং তাঁদের পিতামহ জগমন মিশ্রের জন্ম এবং সংগীতশিক্ষা উভয়ই হয় বারানসীতে। তাঁদের আদিনিবাস প্রথমে বলরামপুর থাকলেও পরে তাঁরা বৃন্দাবনে চলে যান। জানা যায় তখন থেকেই তাঁদের সংগীতচর্চার সূত্রপাত। এই সূত্রপাতের উৎসের সময় ধরা হয় তাঁদের প্রপিতামহ দিলারাম মিশ্রের সময় থেকে। দিলারাম মিশ্ররা সাত ভাই ছিলেন এবং তাঁরা সকলেই বলরামপুরে বাস করতেন। তাঁদের একভাই ছিলেন স্থানীয় মঠের অধিপতি। জানা যায়, মুসলমানদের আক্রমনে মঠ লুণ্ঠিত হয় এবং মঠাধীশ ভ্রাতা নিহত হন। ভ্রাতার মৃত্যুরপর তাঁরা বলরামপুর ত্যাগ করে বৃন্দাবনে বসবাস শুরু করেন। তাঁদের মধ্যে সেবক নামে প্রসিদ্ধ হন দিলারাম মিশ্র। দীর্ঘকাল সংগীত সাধনার পর দিলারাম মিশ্রই প্রথম বৃন্দাবন থেকে কাশীবাসী হন। অন্য ভ্রাতাদের মধ্যে চিন্তামন মিশ্র দিল্লী নিবাসী হন এবং বাকীরা সংগীতজীবন অবলম্বন করে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে চলে যান। দিলারাম মিশ্রের পুত্র জগমন মিশ্র বারানসীতেই তাঁর পিতার নিকট ধ্রুপদ ও বিষ্ণুপদ সংগীতশিক্ষা লাভ করেন এবং পিতার সাথে কাশীবাসী হন। জগমনের পুত্র ঠাকুরদাস কাশীতেই পারিবারিক ঐতিহ্য থেকে সংগীতশিক্ষা লাভের পর কয়েকবছর অন্যত্র অবস্থান করেন এবং সেইসময় তিনি তানসেন বংশীয় কোন গুণীর কাছে শিক্ষালাভের সুযোগ পান। ঠাকুর দাসের তিনপুত্র মনোহর, হরিপ্রসাদ ও বিশ্বেশ্বর। এঁদের সকলের জন্ম বারানসীতে। পিতার নিকট সকলেই সংগীতশিক্ষার সুযোগ পেলেও সবচেয়ে প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন হরিপ্রসাদ বা প্রসদ্দু। হরিপ্রসাদ এই ঘরানায় টপ্পা সংগীতচর্চার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। শোরী মিঞার শিষ্য হামদুনের ধারায় টপ্পা শিখে তিনিই প্রথম এই ঘরানায় টপ্পা চর্চা যুক্ত করেছিলেন। মনোহর ও প্রসদ্দু সংগীতজীবনে ঐকান্তিক সহযোগী ছিলেন। তাঁরা

বিভিন্ন দরবারে একসঙ্গে নিযুক্ত থাকতেন এবং সংগীত পরিবেশন করতেন। তাঁদের সময় থেকেই এই ঘরানা বারানসীর বাইরে এবং বৃহত্তর সংগীতক্ষেত্রে খ্যাতিলাভ করে। তাঁরা নেপাল, পাতিয়ালা ও লক্ষ্ণৌ দরবারে যুক্ত থাকেন। এই পরিবারে যুগলবন্দী অনুষ্ঠানের রেওয়াজ শুরু হয়েছে তাঁদেরই যুক্ত সংগীতজীবনের মাধ্যমে। মনোহর ও প্রসদ্দু ধ্রুপদে অভিজ্ঞ হলেও খেয়াল গায়করূপে অধিক খ্যাতিলাভ করেন। নবাব ওয়াজেদ আলীর সময়ে এই দুই সহোদর লক্ষ্ণৌ দরবারের শতাধিক গুণীর মধ্যে বিশিষ্ট ছিলেন। নেপাল দরবারে থাকাকালীন মহারাজার অনুজ মনোহর প্রসদ্দুর কাছে সংগীতশিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। পাতিয়ালা দরবারে মনোহরের চেয়ে প্রসদ্দু বেশীদিন থাকেন এবং এই দরবার থেকেই তিনি 'সংগীত নায়ক' উপাধি লাভ করেন বলে জানা যায়। সেই সময় পাতিয়ালায় একটি বড় আকারের সংগীত অধিবেশনে আমন্ত্রিত বিভিন্ন সংগীত কেন্দ্রের কলাবৎদের নিয়ে একটি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় আর সেই আসরে বিচারকদের দৃষ্টিতে প্রসদ্দু শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হন। প্রসদ্দু অনেক পুরষ্কার প্রাপ্তি ছাড়াও নাভা, কর্পূরথালা, পাতিয়ালা ও শিয়ালকোটসহ বিভিন্ন পাঞ্জাব রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। পাঞ্জাব কেশরী রনজিৎ সিংহের দরবার এবং মারাঠা নামক ভোঁসলের নাগপুর দরবারেও প্রসদ্দুর আসর বসানো হয় এবং সেখানে তিনি প্রশংসিত হন। মনোহর, হরিপ্রসাদ ও বিশ্বেশ্বর এই তিন ভ্রাতা একসময়ে শেষ বাদশা বাহাদুর শাহের দিল্লীর দরবারে নিযুক্ত ছিলেন। শোনা যায় সেইসময় সম্ভবত সেতারী রেজা খাঁ'র নিকট বিশ্বেশ্বর সেতারশিক্ষা গ্রহণ করেন। হরিপ্রসাদের প্রপৌত্র এবং কলকাতার বিখ্যাত গায়ক রামকিষণ মিশ্র মনে করেন যে মিশ্র বংশে সেতারের চর্চা সেইসময় থেকেই আরম্ভ হয়েছে।[১]

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মনোহর ও প্রসদ্দুর সঙ্গে কলকাতার সংযোগ ঘটলেও বাংলায় কোন শিষ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়না। তবে মনোহরের ঘনিষ্ট জনের মধ্যে গঙ্গানারায়ণ চট্রপাধ্যায়ের নাম পাওয়া যায়। জানা যায় যে মনোহরের পরামর্শেই গঙ্গাধর চট্টোপাধ্যায় সংগীতশিক্ষার উদ্দেশ্য আনুমানিক ১৮৩২/৩৩ সালে পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করেন এবং কলকাতার গুণী ধ্রুপদ শিল্পীরূপে প্রতিষ্ঠিত হন।

প্রসদ্দু মনোহর ঘরানার সঙ্গে বাংলাদেশের সংগীতচর্চার নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হয় তাঁদের পুত্রদের সময় থেকে। উনিশ শতকেই বাংলার সংগীত ক্ষেত্রে এই ঘরানা ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে যা সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত বিদ্যমান। বাংলার বেশ কয়েকজন গুণীশিল্পী প্রসদ্দু মনোহর ঘরানার কাছে সংগীতের বিভিন্ন বিভাগে শিক্ষালাভ করে টপ্পা অঙ্গে অতিশয় গুণীশিল্পীরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। তাঁদের মধ্যে মহেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রসদ্দু মনোহর ঘরানার পরম্পরাগত বিকাশ এবং বাংলায় প্রসারের ক্ষেত্রে মনোহর ও প্রসদ্দুর পুত্ররা যে শিষ্যমণ্ডলী গঠন করেন তার পরিচয় বিবৃত করা হল:

মনোহরের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজকুমার মিশ্র ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। তিনি একাধারে ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল ও টপ্পা অঙ্গে অত্যন্ত গুণী গায়ক, বীণাবাদক এবং আচার্যরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। মনোহর ও প্রসদ্দু উভয়ের কাছেই তিনি তালিম নেন। পেশাদার সংগীতজীবনে প্রথম চৌদ্দ বছর নেপালের প্রধানমন্ত্রীর পুত্রের আশ্রয়ে নেপালে অবস্থান করেন এবং পরবর্তী সময়ে জীবনের অবশিষ্ট সময় কলকাতাবাসী হন। এই সময় তাঁর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন দর্পনারায়ণ ঠাকুর বংশীয় কালীকৃষ্ণ ঠাকুর, যার সংগীত সভাতেই তিনি জীবনের শেষপর্যন্ত নিযুক্ত থাকেন। রাজকুমার মিশ্র গায়ক অপেক্ষা সংগীতের আচার্যরূপেই বাংলাদেশে অধিক স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর অনেক বাঙালি শিষ্য আছেন যাঁরা সংগীতে অনেক কৃতিত্ব অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন।

টপ্পাচার্য মহেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় রাজকুমার মিশ্রের অন্যতম শিষ্য বলে বিবেচিত। তিনি 'মহেশ ওস্তাদ' নামে সুপরিচিত ছিলেন। উচ্চশ্রেণীর টপ্পাগায়ক হিসেবে মহেশচন্দ্র বাংলায় টপ্পা চর্চায় অন্যতম ভূমিকা পালন করেন। চন্দন নগরের রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কলকাতার টপ্পাগায়ক সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রানা ঘাটের বিখ্যাত টপ্পাগুণী নগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের মত গুণীশিষ্য গঠন করে তিনি নিজে একটি সংগীত প্রতিষ্ঠানরূপে সমাদৃত হন। বাংলা ভাষায় টপ্পা রীতির বেশকিছু উৎকৃষ্ট গানের রচয়িতা ছিলেন মহেশচন্দ্র।[২]

রাজকুমার মিশ্রের আরেক অন্যতম শিষ্য ছিলেন বাংলার শ্রেষ্ঠগায়ক লক্ষ্মীনারায়ণ বাবাজী। তিনি বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, ঠুমরী, পাখোয়াজ, তবলা, বীণা, এসরাজ ইত্যাদি শিক্ষাগ্রহণ করে তিনি বিভিন্ন অঙ্গের গায়ক বাদকরূপে সংগীতজগতে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি প্রায় বারো বছর রাজকুমার মিশ্রের অধীনে ধ্রুপদ ও খেয়ালের তালিম নেন।

বাংলার প্রসিদ্ধ দু'জন শিল্পী (দুই ভগিনী) কিরণময়ী ও সুরমা-রাজকুমার মিশ্রের শিষ্য ছিলেন। বাংলার শ্রেষ্ঠ বাইজীদের মধ্যে এই দুই ভগিনী অন্যতম। তণ্মধ্যে কিরণময়ী-রাজকুমার মিশ্রের শিক্ষায় খেয়াল ও টপ্পা অঙ্গে কলাবতী গায়িকারূপে প্রতিষ্ঠিত হন।

সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার ছিলেন বিখ্যাত টপ্ খেয়াল গায়ক। তিনি বিভিন্ন ওস্তাদের সান্নিধ্য লাভ করলেও প্রধানত রাজকুমারেরই শিষ্য ছিলেন। ভগলপুর নিবাসী বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই সৌখীন শিল্পী কর্মজীবনে ডেপুটি কালেক্টর ছিলেন। তাঁর শিষ্যের মধ্যে ভগিনীপতি হরেন্দ্রলালের কনিষ্ঠভ্রাতা কবি নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, দ্বিজেন্দ্রলালের পুত্র দিলীপকুমার রায়ের নাম উল্লেখযোগ্য।

রাজকুমার মিশ্রের আরো কয়েকজন বাঙালি শিষ্যের মধ্যে জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারের হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা প্রতিভা দেবী ও পুত্র হিতেন্দ্রনাথ, তুলসীদাস চট্টোপাধ্যায়, কালিপ্রসন্ন ঘোষ, চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, নিবারণ কত্থক, যোগীন্দ্রনাথ ঘোষ, শম্ভুচরণ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

রাজকুমারের তিন পুত্রেরই সংগীতজীবন অতিবাহিত হয় কলকাতায়। পিতার অধীনে শিক্ষাগ্রহণের পর তাঁরা তাঁদের অনেক যোগ্য উত্তরসূরী গঠন করেছিলেন। এঁরা হলেন গোবিন্দ দাস, লছমীপ্রসাদ এবং কেশবদাস। এঁদের মধ্যে গোবিন্দ দাস অবিবাহিত ছিলেন আর কেশব দাস ছিলেন নিঃসন্তান। লছমীপ্রসাদ ছিলেন তাঁর যোগ্য উত্তরসাধক। লছমীপ্রসাদ দীর্ঘকাল কলকাতা তথা বাংলার সংগীত সমাজে আচার্যরূপে এবং বেশ কিছুদিন ভবানীপুর সংগীত সম্মিলনীর সংগীতশিক্ষা বিভাগের অধ্যক্ষরূপে বিদ্যমান থাকেন। তিনি ধ্রুপদ, ধামার, হোরি, খেয়াল, টপ্পা ইত্যাদি অঙ্গের গায়ক ও বীণা, সেতার, পাখোয়াজ, তবলা, ইত্যাদি অঙ্গের বাদকরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। কলকাতায় তিনি অনেক শিষ্য তৈরী করেন যাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন গায়ক ও তবলাবাদক অনাথনাথ বসু। তিনি সাত বছর লছমীপ্রসাদের নিকট খেয়াল, টপ্পা, ঠুমরী ও তবলায় তালিম নেন। লছমীপ্রসাদের অন্যান্য শিষ্যের মধ্যে বিখ্যাত ধ্রুপদী ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (টপ্পা), বুন্দি মিশ্র, পচা পাল (তবলা ও সেতার), বিনায়ক মিশ্র (খেয়াল), যোগেশচন্দ্র ঘোষ, মদনমোহন মিশ্র, শ্যামচরণ বসু প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। তবে লছমীপ্রসাদের শ্রেষ্ঠ শিষ্য ও উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন তাঁর একমাত্র পুত্র হরিদাস। পিতার জীবিতকালেই হরিদাসের অকাল মৃত্যু হয়। তিনি ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পাগান এবং বীণা, সেতার ও পাখোয়াজ বাদনে বাংলার সংগীতজগতে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। ৭ ফেব্রুয়ারি ১৯২৯ সালে ৭০ বছর বয়সে কলকাতায় লছমীপ্রসাদ মৃত্যুবরণ করেন এবং এভাবেই মনোহর মিশ্রের ধারায় এই ঘরানা বংশানুক্রমে বাংলাদেশে বিস্তার লাভ করে।

হরিপ্রসাদ মিশ্র (প্রসদ্দু) কাশীতে অবস্থান কালে তাঁর দুইপুত্র শিবসহায় ও রামসেবককে তালিম দেন। শোনা যায় সেই একইসময় হরিপ্রসাদের আত্মীয় দুই সহোদর শিবনারায়ণ ও গুরুপ্রসাদ মিশ্রও তাঁর কাছে সংগীতশিক্ষা গ্রহণ করেন। তবে শিবনারায়ণ ও গুরুপ্রসাদ বারানসীর সন্তান হলেও বেতিয়া ঘরানাদার রূপেই সংগীত সমাজে পরিচিত ছিলেন। হরি প্রসাদের দুই পুত্রের মধ্যে শিবসহায় ছিলেন টপ্পা গানে বিশেষ পারদর্শী। বলা হয় যে তিনিই পিতার টপ্পা সম্পদ উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্তির পর একজন প্রতিষ্ঠিত টপ্পাগায়ক হিসেবে প্রসিদ্ধি পেয়েছিলেন। বাংলায় তাঁর অনেক শিষ্য রয়েছে। শিবসহায়ের কাছে বাঙালিরাই অধিক লাভবান হন। তাঁর যোগ্য শিষ্যের মধ্যে বাংলার টপ্পাগুণী মহেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য।

হরিপ্রসাদের কনিষ্ঠ পুত্র রামসেবক একদিকে যেমন ছিলেন খেয়াল গানে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠগায়ক অন্যদিকে আবার ঘরানার ধ্রুপদের সঙ্গে সেতার ও তবলা বাদনেও ছিলেন অনবদ্য। পিতার কাছে শিক্ষার অতিরিক্ত রামসেবক প্রতাপ মিশ্রের কাছে তবলার তালিম পান। এছাড়া নেপালের দরবারে অবস্থান কালে তিনি তানসেন পুত্র বংশীয় বাসৎ খাঁ'র জ্যেষ্ঠ পুত্র আলী আহম্মদ বড়কু মিঞার কাছে সুরযন্ত্রের তালিম পান। তবে পুত্র ব্যতিত তাঁর অন্য কোন শিষ্যের উল্লেখ পাওয়া যায় না। তিনি একজন শিক্ষিত শিল্পী ছিলেন। বারানসীর কুইন্স কলেজ থেকে এফ এ উত্তীর্ণ হন। বাংলা, সংস্কৃত ও ফারসি ভাষায় তিনি অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। রামসেবক তবলাবাদন বিষয়ে হিন্দি ভাষায় একটি গ্রন্থ লেখেন *তাল প্রকাশ ঔর তবলা বিজ্ঞান* নামে। নেপালের দরবারে নিযুক্ত থাকার সময় রামসেবক দরবারের সংগীত বিভাগের প্রধান ছিলেন এবং রাজপরিবারেই সংগীতশিক্ষা দান করতেন। ৭৭ বছর বয়সে কাশীধামে তাঁর মৃত্যু হয়। রামসেবকের শিষ্যের মধ্যে তাঁর দুই পুত্র পশুপতিসেবক ও শিবসেবক মিশ্র কলকাতায় দীর্ঘকাল বসবাস করেন এবং বাংলার সংগীত ক্ষেত্রে বিশেষ পরিচিত হন। তাঁরা যদিও কলকাতায় স্থায়ীভাবে থাকেননি তথাপি তাঁদের বংশধরগণ বাংলার অধিবাসী বলেই গণ্য হন। শিব-পশুপতি কলকাতায় এবং অন্যান্য সংগীতাসরে দ্বৈত ধ্রুপদ গায়ক রূপে সুপরিচিত ছিলেন। পূর্বপুরুষ প্রসদ্দু মনোহরের মত এই দুই সহোদরও সংগীতজীবনে এবং বিভিন্ন আসরে যুগ্ম ভাবে সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে সংগীত সমাজে শিব পশুপতি নামে যুক্তভাবে উল্লেখিত হতেন। প্রসদ্দু মনোহর ঘরানার প্রধান একটি বৈশিষ্ট্য হল তালাধ্যায়ে অসামান্য দক্ষতা এবং সে বিষয়ে শিব-পশুপতি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী । এই দুই ভ্রাতারই জন্মস্থান নেপাল এবং সেখানেই তাঁদের সংগীতশিক্ষা শুরু হয়। নেপালে থাকাকালীন শিবসেবক সুপ্রসিদ্ধ টপ্-খেয়াল গায়ক এনায়েত হোসেন খাঁ'র কাছে টপ্-খেয়ালে তালিম নেন। উভয় ভ্রাতাই বংশের অতিরিক্ত অন্যান্য গুণীজনের কাছেও শিক্ষালাভ করেছিলেন। তাঁদের সংগীতজীবনের ভিত্তি নিজ ঘরানা বিদ্যায় গঠিত ছিল। শিব সেবক প্রধানত ধ্রুপদ, খেয়াল ও হোরি গানের গায়ক হিসেবে সুদক্ষ ছিলেন। হায়দ্রাবাদ অঞ্চলের কেশবনগর রাজ্যের রাজা সীতারাম ভূপাল তাঁকে 'সংগীতাচার্য' উপাধি দেন। অন্যদিকে পশুপতিসেবক সেতার, সুরবাহার ও বীণাবাদনে দক্ষতার পাশাপাশি গুণী ধ্রুপদী ছিলেন এবং তাঁর ভান্ডারে ছিল অসংখ্য খেয়াল, টপ্পা, সাদ্‌রা ও হোরি গান। সেতার বাদনে পশুপতি সেবক ছিলেন অনবদ্য। নানা প্রকার অলংকার, বিভিন্ন প্রকারের ছন্দের প্রয়োগ, নির্ভুল কারুকার্য, তাল ও লয়ের অসাধরণ মেলবন্ধন, শ্রোতাদের অনুরোধ অনুযায়ী যে কোন মাত্রা থেকে যে কোন ছন্দের তান তোড়া তোলা এসব কিছুর জন্যই তিনি সংগীত সমাজে সম্মানিত ছিলেন। শিব সেবকও তাঁর ভ্রাতার ন্যায় তাল লয়ে সুদক্ষ ছিলেন। তিনি এমন বাঁট ও তোড়ার প্রয়োগ করতেন এবং তাঁর বাদনে তিনি এমন কৌশল অবলম্বন করতেন যে খুব কম সংখ্যাক সঙ্গতকারই তাঁর সঙ্গে বাজাতে পারতেন। শিব পশুপতি ১৯১৮ সালে কলকাতায় আসার

পর থেকে বাংলার সাথে এত নিবিড়ভাবে যুক্ত থাকেন যে পরবর্তী কালে তাঁদের সংগীতের উত্তরাধিকার রক্ষিত হয় বাঙালিদের মধ্যেই। যুগ্ম সংগীতজীবনের মত তাঁদের যুগ্ম শিষ্যমণ্ডলীও গঠিত হয়। পশুপতি সেবক ছিলেন নিঃসন্তান। আর শিব সেবকের ছিল তিনপুত্র - রামকিষণ, ভবানী ও বিষ্ণু। এঁরা সবাই পিতার কাছে তালিম পান। এঁদের মধ্যে ভবানী ছিলেন অধিক প্রতিভাবান এবং শিব পশুপতির শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকারী। অকাল মৃত্যুর কারণে এই প্রতিভাবান শিল্পীর সংগীতজীবনের সমাপ্তি ঘটে।[৩]

শিব পশুপতি এই ঘরানার ধারক বাহক যে শিষ্যমণ্ডলী গঠন করেন তার মধ্যে শিব সেবকের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামকিষণ মিশ্র (খেয়াল, ধ্রুপদ ও টপ্পা গায়ক), সুধীন্দ্রনাথ মজুমদার ও ললিতমোহন দাস (গায়ক), বিজয় দাস পাকাড়ে (সেতারী), বিষ্ণু সেবক মিশ্র (বিভিন্ন রীতির গায়ক ও তবলাবাদক), ক্ষেত্রমোহন ঠাকুর (বীণা), অভয়পদ চট্টোপাধ্যায় (গায়ক), অনিলকৃষ্ণ রায়, সতীশচন্দ্র দে, পশুপতি রায় চৌধুরী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

একথা অনস্বীকার্য যে মনোহর ও প্রসন্দুর সংগীতজীবনে যে ঘনিষ্ঠতা ছিল পরবর্তী সময়ে তা আর দেখা যায় না। এই দুই ভ্রাতার বংশধরদের সংগীতজীবন তাঁদের পূর্বপুরুষদের মত দৃষ্টান্ত রাখতে পারেনি। তবে প্রসন্দু মনোহর ঘরানা বা বারানসীর এই মিশ্র ঘরানার উত্তরাধিকার ও ঐতিহ্য বহন করছে বাংলার সংগীত শিল্পীরা। ঘরানার উৎসস্থল বারানসীর সঙ্গে তার আজ আর কোন বিশেষ সম্পর্ক নেই।

প্রসন্দু মনোহর ঘরানার বিখ্যাত সংগীতজ্ঞদের চিত্র:

দিজেন্দ্রলাল রায়[৪]

দিলীপকুমার রায়[৫]

তথ্য ও চিত্রসূত্র

১) দিলীপ কুমার মুখোপাধ্যায়, *ভারতীয় সংগীতে ঘরানার ইতিহাস*, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী প্রা:লি:, কলকাতা: ১৩৮৪

২) করুণাময় গোস্বামী, *সংগীতকোষ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা: ১৯৮৫

৩) দিলীপ কুমার মুখোপাধ্যায়, *ভারতীয় সংগীতে ঘরানার ইতিহাস*, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী প্রা:লি:, কলকাতা: ১৩৮৪

৪) http://en.banglapedia.org/index.php?title=File:RoyDwijendralal.jpg

৫) https://en.wikipedia.org/wiki/Dilipkumar_Roy#/media/File:Dilipkumarroy.jpg

বেতিয়া ঘরানা

ভারতবর্ষে ধ্রুপদ চর্চার জন্য যে কয়েকটি ঘরানা প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, বেতিয়া ঘরানা তাদের মধ্যে অন্যতম। বেতিয়া রাজ্য বিহারের চম্পারণ জেলার অন্তর্গত চন্দ্রাবতী নদীর তীরে অবস্থিত। এই অঞ্চলে বেত জঙ্গল বেশি থাকায় সম্ভবত এর নামকরণ হয়েছে 'বেতিয়া'। তৎকালীন জমিদাররা রাজ্যের বিশেষ উৎসবগুলোতে সংগীতানুষ্ঠানের আয়োজনের চেয়ে শিকার, মল্লযুদ্ধ অথবা প্রতিদ্বন্দিতাকারী বিভিন্ন ক্রীড়ার আয়োজনেই অধিক আগ্রহী ছিলেন। সম্ভবত সম্রাট শাহজাহানের (১৬২৭-১৬৫৮) রাজত্বকালে বেতিয়া রাজ্যের জমিদার উগ্রসেন সিংহ (১৬২৭-১৬৫৯) 'রাজা' উপাধি লাভ করেন। মোঘলদের শাসনামল যখন ধ্বংস হয়ে যায় তখন বেতিযার রাজারা নিজ শক্তির গুণে স্বাধীন হয়ে ওঠেন। পরবর্তী কালে বৃটিশ আমলের প্রথমদিকে বেতিয়া রাজ্যে বৃটিশ শাসন শুরুর সময় বেতিয়ার রাজা ছিলেন রাজা ধুরূপ সিংহের দৌহিত্র যুগল কিশোর সিংহ (১৭৬২-১৭৮৩)। তাঁর সময় থেকেই বেতিয়ার রাজদরবারে সংগীত শিল্পীদের আশ্রয় তথা সংগীতসভা আয়োজনের প্রথা শুরু হয়। তিনি অত্যন্ত সংগীতপ্রেমী একজন রাজা ও উত্তম পাখোয়াজবাদক ছিলেন। তাঁর পুত্র বীরেন্দ্র কিশোর সিংহ (১৭৮৩-১৮১৬) ধ্রুপদ শিল্পী হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন এবং তাঁর সময় থেকেই রাজপরিবারের সদস্যরা বিশিষ্ট সব গুণীশিল্পীদের সান্নিধ্য লাভ পূর্বক তাঁদের নিকট শিক্ষালাভের সুযোগ পান। বীরেন্দ্র কিশোরের পুত্র রাজা আনন্দকিশোর (১৮১৬-১৮৩২) বেতিয়া ঘরানার একজন দক্ষ ধ্রুপদ ও ধামার গায়ক হওয়ার পাশাপাশি উৎকৃষ্ট সংগীত রচয়িতা ও প্রসিদ্ধ পাখোয়াজবাদক হিসাবে খ্যাতিলাভ করেন। আনন্দকিশোর সেনী ঘরানার হায়দার খাঁ ও প্যারে খাঁকে বেতিয়ার রাজদরবারে আশ্রয় দেন এবং তাঁদের নিকট সেনী ঘরানার ধ্রুপদ শিক্ষালাভ করেন। তাই অনেকে মনে করেন যে, বেতিয়া ঘরানার গায়কীতে সেনী ঘরানার প্রভাব ছিল। কারণ, আনন্দকিশোরের সময়কালকেই বেতিয়া ঘরানার সূচনারূপে গণ্য করা হয়। বৃটিশ সরকারকে সাহায্য প্রদানের পুরস্কার স্বরূপ তৎকালীন বৃটিশ গভর্ণর জেনারেল বেন্টিক দ্বারা আনন্দকিশোর 'মহারাজা বাহাদুর' উপাধি প্রাপ্ত হন।[১]

আনন্দকিশোরের সহোদর রাজা নওল কিশোর সিংহ (১৮৩২-১৮৫৫) বিখ্যাত ধ্রুপদ গায়ক এবং ধ্রুপদ রচয়িতা হিসাবে প্রতিষ্টিত হন। সেনী ঘরানার জাফর খাঁ ও সাদিক আলী খাঁ'র কাছে তিনি তালিম নেওয়ার পর বেতিয়া ঘরানার সাথে সেনী ঘরানার যোগাযোগ অধিক মজবুত হয়। সাদিক আলী খাঁ নওল কিশোরের রাজত্বকালে কিছুদিন বেতিয়া রাজদরবারে নিযুক্ত ছিলেন। আনন্দকিশোর ও নওল কিশোরের মিলিত ধ্রুপদ রচনা ও চর্চার ফলে ১৯ শতকে বেতিয়া রাজ্য ধ্রুপদ-ধামার গানের একটি বিশেষ কেন্দ্ররূপে সমগ্র ভারতে খ্যাতি অর্জন করে। নওল কিশোরের পুত্র রাজেন্দ্র কিশোরও সিপাহী বিদ্রোহের সময় বৃটিশদের

সহায়তার কারণে বৃটিশ সরকার কর্তৃক 'মহারাজা' উপাধি লাভ করেন। রাজেন্দ্র কিশোরের নিঃসন্তান পুত্র হরেন্দ্র কিশোর ছিলেন বেতিয়ার শেষ রাজা। স্বাধীন ভারতে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ হওয়ার সাথে সাথে বেতিয়া রাজ্যও বিলুপ্ত হয়ে যায়।

বেতিয়ার দরবারে সামগ্রিকভাবে উচ্চমানের সংগীতচর্চা হত রাজা আনন্দকিশোর ও রাজা নওল কিশোরের শাসনামলে। এই দুই সহোদর ব্যতীত বেতিয়া ঘরানার অন্যান্য বিখ্যাত গায়কদের মধ্যে বক্তিয়ারজী, শিবদয়াল মিশ্র, সদাশিব রাও ভট্ট, গুরুপ্রসাদ মিশ্র ভাতৃদ্বয় প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। সময়কাল ভিন্ন হলেও এইসকল শিল্পীরা সকলেই বেতিয়া ঘরানার শিক্ষা পান এবং বেতিয়া কেন্দ্রের সাথে যুক্ত থাকেন। বেতিয়া ঘরানার প্রচার ও প্রসারে বেতিয়ার রাজভ্রাতাদের অবদান অনস্বীকার্য। জানা যায় নওল কিশোর ও আনন্দকিশোর ভাতৃদ্বয় বারানসীর কত্থক সম্প্রদায়ের কিছু গায়ককে শিক্ষাদানের ফলে পরবর্তী কালে তাঁরা বেতিয়া রাজ্যের বাইরে বাংরা ও অন্যান্য অঞ্চলে সংগীতচর্চা করে বেতিয়া ঘরানাকে আরো প্রসারিত করেন। কত্থক সম্প্রদায় ভুক্ত বারানসীর সন্তান শিবনারায়ণ ও গুরুপ্রসাদ মিশ্র ভাতৃদ্বয় দীর্ঘসময় কলকাতায় অবস্থান করে শিষ্য গঠনের ফলে বেতিয়া ঘরানা বাংলায় পরিচিতি লাভ করে। শিবনারায়ণ ধ্রুপদের চর্চা এবং শিষ্যদের শুধুমাত্র ধ্রুপদ ধামারের শিক্ষা দিলেও তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা গুরুপ্রসাদ ধ্রুপদের পাশাপাশি খেয়াল গাইতেন ও শিষ্যদের খেয়ালের তালিম দিতেন। বাংলায় ধ্রুপদের যে চর্চা শুরু হয় তা বেতিয়া ঘরানারই দান।[২]

এই ঘরানার প্রসিদ্ধ শিল্পীদের মধ্যে বিনোদ গোস্বামী, শ্যামসুন্দর মিশ্র, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়, গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, শশিভূষণ দে, জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী, ভূতনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিজাশংকর চক্রবর্তী, ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, কিশোরী মোহন ভাস্কর প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। তবে শিবনারায়ণ ও গুরুপ্রসাদের যোগ্য উত্তরাধিকারী শিষ্য ছিলেন রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী। বাংলায় বেতিয়া ঘরানার প্রচার, প্রসার ও বিস্তারে শিবনারায়ণ ও গুরুপ্রসাদ ভাতৃদ্বয়ের সাথে রাধিকাপ্রসাদের নামও স্মরণীয়।

বেতিয়া ঘরানার একটি বিখ্যাত ধ্রুপদ হলো 'ভবানী দয়ানী মহাবাকবানী'-যা বর্তমানে বন্দিশ হিসেবে অধিক প্রচলিত। এ প্রসঙ্গে বিনয় চক্রবর্তী লিখেছেন-

"ভবানী দয়ানী মহাবাকবানী- সারা ভারতে শাস্ত্রীয় সংগীত মহলে বহুল প্রচলিত একখানি প্রিয় গান। ভৈরবী-ঝাঁপতাল নিবদ্ধ এই গানখানি সাদ্‌রা বা খ্যাল রূপে শুধু স্থায়ী ও অন্তরা গীত হয়ে থাকে। পঃ ভাতখণ্ডে *ক্রমিক পুস্তক মালিকা*তে (২য় খণ্ড, পৃঃ ৪১৫) গানখানি সাদ্‌রা হিসাবে স্বরলিপিবদ্ধ করে

রেখেছেন। এই স্বরলিপি ও গানের পদ প্রামাণিক হিসাবে সারা ভারতে সংগীত মহলে স্বীকৃত। ইদানীং কালে কোনও শিল্পী ভজন আখ্যা দিয়ে গানখানি রেকর্ডও করেছেন। এমতাবস্থায় গানখানি যে খণ্ডিত পদ ও বিকৃত সুরে সংগৃহীত হয়েছে একথা বলা দুঃসাহসিকতার পরিচয়জ্ঞাপক। এটি যে বিখ্যাত একখানি ধ্রুপদ গান এবং চারতুক বিশিষ্ট পূর্ণ ধ্রুপদ একথা কে বিশ্বাস করবে?

বেতিয়া ঘরানাতে এই লুপ্ত গানখানি অন্যতম ধ্রুপদ হিসাবে পরিচিত ছিল। বেতিয়ার মহারাজা আনন্দকিশোর এই গানখানির রচয়িতা। তাঁদের গান রচনার পটভূমিকার খবর যেটুকু জানি তা-হলো মহারাজা আনন্দকিশোর ও তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা নওলকিশোর উভয়েই উচ্চ কোটীর ধ্রুপদ গায়ক ও রচয়িতা ছিলেন। পারিবারিক সূত্রে তাঁরা শাক্ত ছিলেন। রাজবাড়ীর প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ ছিল সিংহবাহিণী দেবী দুর্গা। উভয় ভ্রাতা নিত্য স্নানান্তে ইষ্টদেবীকে প্রণাম করার সময় এক এক খানি ধ্রুপদ রচনা করে দেবী দুর্গাকে অর্ঘ্য দিতেন। এভাবে মহারাজা আনন্দকিশোর রচিত ষোলোশত এবং নওলকিশোর রচিত নয়শত মোট পঁচিশ শত ধ্রুপদ কালক্রমে বেতিয়া ঘরানার অন্যতম সম্পত্তি হিসাবে পরিণত হয়। তাঁদের রচিত সব ধ্রুপদেই দেবী দুর্গা, চণ্ডী, কাঁলী বা অন্য দেবতাদের গুণকীর্ত্তন-যুক্ত বর্ণনা রয়েছে।

'ভবানী দয়ানী' মূল গানখানি বোধ হয় আর কোন কালেই ধ্রুপদ হিসাবে গীত হবে না, কিউরিও (curio) হিসাবে থাকা ছাড়া এটির কোনও গত্যন্তর নেই মনে করে গানখানি অনাদরে রেখেছিলাম। প্রায় দুই বছর পূর্বে বয়োজ্যেষ্ঠ মিত্রবর নিত্যশিক্ষার্থী শ্রীনিদানবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় (রামপুরের লোকান্তরিত উস্তাদ মেহেদী হোসেন খাঁ সাহেবের শিষ্য) কথা প্রসঙ্গে জানিয়েছিলেন, গয়ার বিখ্যাত ধ্রুপদী পঃ রামুজীর কাছে যখন তিনি তালিম নিচ্ছিলেন, তখন তাঁর কাছে চার তুকের সম্পূর্ণ ধ্রুপদখানি শুনেছেন। পঃ রামুজী তাকে বলেও ছিলেন- 'সিখ্‌লে বেটা, ইয়ে গানা কহী নহি মিলেগা।' খামখেয়ালীতে গানখানি তখন তিনি শেখেননি! তারপর দীর্ঘকাল কেটে গেছে। ইতিপূর্বে সুরছন্দায় প্রকাশিত আমার কোনও এক লেখা থেকে যখন তিনি জানতে পারলেন সম্পূর্ণ ধ্রুপদখানি আমার কাছে রয়েছে, তখন তাঁর পরিচিতদের বলেছিলেন, তাহলে গানখানি আমি অবশ্যই পাবো। তারপর বছর দুই কেটে গেছে। ঘটনাটা প্রায় ভুলেই গেছি। ইতিমধ্যে আবার তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়াতে বিষয়টি মনে করিয়ে দিলেন, তাঁর কথাতে প্রেরণাও পেলাম।

বাংলাতে এখনও ধ্রুপদ গানের সামান্য আদর আছে, ধ্রুপদীরাও রয়েছেন। তাঁরা হয়ত শাস্ত্রীয় সংগীত মহলে প্রচার করতে সক্ষম হবেন যে, গানখানি সাদ্‌রা, খ্যাল্ বা ভজন নয়; এটি চার-তুকের একটি সম্পূর্ণ ধ্রুপদ। এ আশা নিয়ে দুর্লভ গানখানির স্বরলিপি পাঠালাম। এ প্রসঙ্গে বেতিয়া ঘরানার ধ্রুপদ সম্বন্ধে সামান্য বক্তব্য রাখছি-

পঃ ভাতখণ্ডে প্রণীত *ক্রমিক পুস্তক মালিকার* বিভিন্ন খণ্ডে বেতিয়া ঘরানার কয়েকটি গান স্বরলিপিবদ্ধ করা রয়েছে। সেসব গানের পৃষ্ঠা পরিচিতি দিয়ে আমাদের সামান্য জিজ্ঞাসা তুলে ধরছি।

১) জগতজননী জগদম্বা ভবানী– ২য় খণ্ড, ২৮৭ পৃঃ রাগ মারোয়া–ত্রিতাল (মধ্যলয়) গানের স্থায়ী তিন আবর্তন ও অন্তরা তিন আবর্তনযুক্ত। রচনাকারের নাম নেই।

২) দুর্গে মহারাণী দেবী– ৩য় খণ্ড, ১৮৯ পৃঃ রাগ বেহাগ-ত্রিতাল (মধ্যলয়) গানের স্থায়ী তিন আবর্তন ও অন্তরা চার আবর্তনযুক্ত। রচনাকার আনন্দকিশোর।

৩) চন্ডী চামণ্ড যে দলমলী– ৪র্থ খণ্ড, ২৩৩ পৃঃ রাগ শংকরা–আড়াচৌতাল (মধ্যলয়) গানে স্থায়ী তিন আবর্তন ও অন্তরা দুই আবর্তনযুক্ত। রচনাকারের নাম নেই।

৪) পশুপতি গিরিজাপতি-৪র্থ খণ্ড ৩৮০ পৃঃ রাগ বসন্ত–একতাল (মধ্যলয়) স্থায়ী পাঁচ আবর্তন ও অন্তরা চার আবর্তন যুক্ত। রচনাকার নওলকিশোর।

বলা বাহুল্য উক্ত ত্রিতাল গানগুলিও ধ্রুপদ। একতালের গানটি চৌতাল হবে।

প্রাথমিক সূত্রে বলা যায়, পঃ ভাতখণ্ডেজী বেতিয়া ঘরানার গান সংগ্রহের জন্য বেতিয়ার অন্যতম ধারক পঃ জয়করণ মিশ্রের বাড়ীতে কাশীতে গিয়েছিলেন। জয়করণ মিশ্রজী পঃ ভাতখণ্ডের উদ্যম শুনে তাঁকে সাধুবাদ জানিয়েছিলেন। কিন্তু স্বরলিপি করে গান সংগ্রহের ব্যাপার শুনে বলেছিলেন- আমি স্বরলিপি পদ্ধতিতে বিশ্বাসী নই। স্বরলিপিতে গানের প্রাণ নষ্ট হয়ে যায়। হ্রস্ব, দীর্ঘ উচ্চারণ ও সুরে নিক্ষেপ স্বরলিপিতে ধরে রাখা যায় না। আপনি বরং আপনার পছন্দমত যত ইচ্ছা গান কণ্ঠে তুলে নিন.....। ফলস্বরূপ পণ্ডিত ভাতখণ্ডেজীকে শূন্য হাতে ফিরতে হয়েছিল। আমাদের জিজ্ঞাস্য উপর্যুক্ত গানগুলি কি বেতিয়া ঘরানার ? যদি বেতিয়া ঘরানার হয়ে থাকে তাহলে পঃ ভাতখণ্ডেজী উক্ত গানগুলি কোথা থেকে সংগ্রহ করেছেন? সম্পূর্ণ গানটি এবং সুর কি সঠিক সংগৃহীত হয়েছে? বেতিয়া ঘরানার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল এই ঘরের গানগুলির শতকরা ৯৮ ভাগ চার তুকের ধ্রুপদ। উপর্যুক্ত গানগুলিতে শুধু স্থায়ী ও অন্তরা রয়েছে। শুধু ২নং ও ৪নং গানের রচনাকারের নাম রয়েছে। আমরা জানি আনন্দকিশোর ও নওলকিশোর রচিত সব গানে তাদের নাম যুক্ত করে রেখেছেন। উভয়ের ধ্রুপদ রচনার বিষয়বস্তু ও কাব্যশৈলী ভারতের অন্যান্য ঘরানার রচিত ধ্রুপদ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক ধরনের। উপর্যুক্ত গানগুলি পদ ও সুর যে বিকৃতভাবে সংগৃহীত হয়েছে এ জাতীয় সন্দেহ আমাদের রয়েছে। পঃ ভাতখণ্ডেজীর ঘনিষ্ট এবং বর্ষীয়ান শিষ্যবর্গ যাঁরা এখনও জীবিত আছেন তাঁরা কি উপর্যুক্ত গানগুলির ব্যাপারে যথাযথ তথ্যাদি উপস্থাপিত করে আমাদের সন্দেহ ও সংশয় দূর করতে সমর্থন হবেন?"[৩]

বেতিয়া ঘরানার গানের সাংগীতিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল অল্প বাণীতে অধিক সুর ব্যবহৃত হওয়া। বিস্তার ও কারুকার্য সম্পন্ন আলাপ, সরগম এই গায়কীর বৈশিষ্ট্য। বৃহত্তর সেনী ঘরানা বেতিয়া ঘরানার উৎপত্তির মূল হলেও নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের কারণে বেতিয়া ঘরানা বিশেষ সমাদৃত।

বেতিয়া ঘরানার বিখ্যাত সংগীতজ্ঞদের চিত্র:

পণ্ডিত রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী [৪]

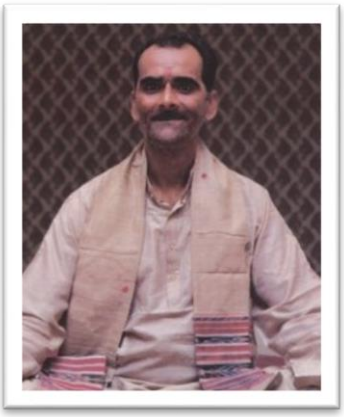

পণ্ডিত ইন্দ্রকিশোর [৫]

ফাল্গুনী মিত্র [৬]

তথ্য ও চিত্রসূত্র

১) দিলীপ কুমার মুখোপাধ্যায়, *ভারতীয় সংগীতে ঘরানার ইতিহাস*, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী প্রা:লি:, কলকাতা: ১৩৮৪

২) করুণাময় গোস্বামী, *সংগীতকোষ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা: ১৯৮৫

৩) *পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত আকাদেমি পত্রিকা*, সংস্কৃতি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত আকাদেমি, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা: ২০০২, পৃ: ৯৩-৯৪

৪) http://www.dhrupad.info/radhika_prasad_goswami.htm

৫) http://swaratala.blogspot.com/2011/05/indra-kishore-mishra-vintage-flavo ur-of.html

৬) https://www.thehindu.com/todays-paper/tp-features/tp-fridayre view/restor ing-bettiah-gharanas-glory/article8310578.ece

গোয়ালিয়র ঘরানা

গোয়ালিয়র মধ্যপ্রদেশের একটি অতি প্রাচীন নগর। এই অঞ্চল প্রায় দুই হাজার বর্গ মাইল প্রসারিত, এর জলবায়ু শুষ্ক এবং তাপমাত্রা শীতকালে শূন্য ডিগ্রী থেকে গ্রীষ্মকালে আটচল্লিশ ডিগ্রী পর্যন্ত বৃদ্ধি পায়। পূর্বে এর নাম ছিল গোপ পর্বত, গোপাদ্রি প্রভৃতি। এই নামকরণ সম্পর্কে জানা যায় যে, রাজা সুরজ সেন নির্মিত গোয়ালিদ্বার দূর্গ থেকেই এই নামকরণ হয়েছে। বিশাল এই দূর্গের জন্য সেসময় এই অঞ্চল বিশেষ পরিচিতি লাভ করে। ভারতীয় সংগীতের অন্যতম প্রধানকেন্দ্র হিসেবে গোয়ালিয়র বিখ্যাত। উত্তর ভারতীয় সংগীতের ক্ষেত্রে যে কটি ঘরানা শীর্ষস্থান অধিকার করেছে গোয়ালিয়র তাদের মধ্যে অন্যতম। এখানে তোমর বংশের রাজারা সকলেই সংগীতানুরাগী ছিলেন। অদ্বিতীয় সংগীতবিদ হিসাবে রাজা মানসিংহ তোমরের (১৪৮৫-১৫১৮) অবদান স্মরণীয়। তিনি ধ্রুপদ গানের পুনরুদ্ধারক ও প্রচারক এবং গোয়ালিয়র ঘরানার প্রবর্তক হিসেবে উল্লেখযোগ্য।[১]

যদিও গোয়ালিয়র ঘরানা বলতে সচরাচর সেখানকার খেয়াল গানের চর্চা ও ধারার কথাই মনে করা হয় তবে ধ্রুপদেরও একটি বৃহৎ পরম্পরা গোয়ালিয়রে ছিল এবং আজও তা বর্তমান। গোয়ালিয়রে খেয়াল ঘরানা প্রবর্তনের অন্তত তিন শতাব্দ আগে রাজা মানসিংহ তোমরের সভায় ধ্রুপদরীতি প্রচলিত হয়। সভা সংগীতজ্ঞদের সহায়তায় রাজা মানসিংহ তোমর *মানকুতুহল* নামক একটি বিশাল সংগীতগ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে সাংগীতিক রীতি পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়। সংগীতের বিভিন্ন ব্যকরণাদিসহ তৎকালীন প্রচলিত বহু রাগ-রাগিণীর পরিচয় এই গ্রন্থে বিদ্যমান। গ্রন্থটির ফরাসি অনুবাদ করেছেন ফকিরুল্লা সাহেব যাতে তিনি মানসিংহের সংগীত প্রতিভার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন এবং গ্রন্থটির নাম দিয়েছেন *সংগীত দর্পণ*। রাজা মানসিংহ তোমরের প্রায় অর্ধশতক পরে গোয়ালিয়রের সন্তানরূপে সংগীতজগতে সুপ্রতিষ্ঠিত হন স্বনামধন্য ধ্রুপদ শিল্পী তানসেন। মাতৃবংশীয় ধ্রুপদের গুণীশিল্পী গদাধর মিশ্র গোয়ালিয়রের নিকটস্থ বিহট গ্রামনিবাসী হলেও তিনি ছিলেন গোয়ালিয়রের সাথে সম্পৃক্ত। উনিশ শতকে গদাধর মিশ্রের বংশীয় বলে পরিচিত চিন্তমন মিশ্র গোয়ালিয়রে দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়, নারায়ণশাস্ত্রী ও দেবজী বুয়াকে নিয়ে ধ্রুপদী শিষ্যমণ্ডলী গঠন করেছিলেন। পরবর্তী পর্যায়ে ধ্রুপদীরূপে লালজী বুয়া, কেশব রাও আপটে, বিষ্ণুপন্থ ছত্রসহ আরো অনেকে বিখ্যাত হয়েছিলেন। বস্তুত উনিশ শতকের প্রথম ভাগেই গোয়ালিয়রে খেয়াল ঘরানার প্রচলন শুরু হয় এবং তা উনিশ শতকের মধ্যভাগে প্রসিদ্ধি লাভ করে ।[২]

১৮ শতকের প্রথম দিকে গোলাম রসুল ও মিয়া জানি জন্ম গ্রহণ করেন। এই দুই সহোদর তৎকালীন সময়ের শ্রেষ্ঠ সংগীতজ্ঞ ছিলেন। গোলাম রসুল লক্ষ্ণৌর নবাব সুজাউদ্দৌলার সভাগায়ক ছিলেন। পরবর্তী কালে তিনি সুজাউদ্দৌলার পুত্র আসাফউদ্দৌলার সভাগায়ক হিসেবে নিযুক্ত হন। গোলাম রসুলের জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলেন অত্যন্ত প্রতিভাবান গায়ক এবং টপ্পা গীতরীতির উদ্ভাবক ওস্তাদ গোলাম নবী ওরফে

শোরী মিঞা। তিনি তাঁর পিতার নিকট এবং রামপুরের ওস্তাদ বাহাদুর সেনের নিকটেও তালিম গ্রহণ করেছিলেন। কথিত আছে যে শোরী নামক তাঁর প্রেমিকা অথবা স্ত্রী ছিলেন যাঁর নাম তিনি তাঁর অধিকাংশ রচনায় ব্যবহার করেছেন।

গোয়ালিয়র ঘরানার খেয়াল গায়নের যে পরিবারের কথা জানা যায় তার আদি পুরুষ ছিলেন নত্থন পীর বক্স ওরফে মখ্খন। তিনি গোয়ালিয়রের অধিবাসী ছিলেন না, লক্ষ্ণৌতে বাস করতেন এবং গোলাম রসুলের শিষ্যরূপে সংগীতে খ্যাতিলাভ করেন। কেউ কেউ মনে করেন যে নত্থন পীর বক্সের পিতা ছিলেন মখ্খন। কিন্তু নত্থন পীর বক্সের পুত্র কাদের বক্স এবং গোলাম রসুলের শিষ্য জামাতা শক্কর খাঁ'র পুত্র বড়ে মোহম্মদ সমসাময়িক ছিলেন। তাই নত্থন পীর বক্স ও মখ্খনকে দুই ভিন্ন ব্যক্তিরূপে গণ্য করাই যুক্তিযুক্ত। এই ঘরানার বড়ে মহম্মদ খাঁ ছিলেন অসাধারণ প্রতিভাবান একজন গায়ক। তিনি রেওয়া ও গোয়ালিয়রের রাজসভায় সভাগায়ক হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। হস্সু খাঁ, হদ্দু খাঁ তথা মুবারক আলী খাঁ সহ আরো অনেক বিখ্যাত শিল্পীরা তাঁর তত্ত্বাবধানে শিক্ষালাভ করেন। তিনিই প্রথম গানে তান, বোলতানসহ আরো অনেক নবীনতা প্রদর্শন করেন।

হস্সু খাঁ ও হদ্দু খাঁ এই ঘরানার প্রসিদ্ধি লাভের জন্য কৃতিত্বের অধিকারী। তাঁদের পুত্র গুলে ইমাম ও ছোটে মহম্মদ এবং রহিমৎ এই ঘরানার যোগ্য উত্তরসূরী হন কিন্তু তাঁদের সঙ্গেই এই বংশ লুপ্ত হয়ে যায়। তবে বংশ লুপ্ত হলেও হস্সু খাঁ ও হদ্দু খাঁ'র মহারাষ্ট্রীয় শিষ্যগণ দ্ধারা গোয়ালিয়রের খেয়াল চর্চা অক্ষুন্ন থাকে, যে ধারা আজও বর্তমান।

গোলাম রসুলের প্রিয় শিষ্য শক্কর খাঁ ও মখ্খন খাঁ'র মধ্যে পরবর্তী কালে মতবিরোধ দেখা দেয়, ফলে মখ্খন খাঁ লক্ষ্ণৌ ত্যাগ করে গোয়ালিয়রে বসবাস শুরু করেন। তাঁর পুত্র অত্যন্ত প্রতিভাবান সংগীতজ্ঞ কাদের বক্স ছিলেন গোয়ালিয়রের মহারাজা ভিকুঁজিরাও সিন্ধিয়ার সভাগায়ক। অতি অল্প বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। কাদের বক্সের পুত্রদ্বয় হস্সু খাঁ ও হদ্দু খাঁ অত্যন্ত সুমধুর কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। পিতামহ নত্থন পীর বক্সের নিকট থেকেই তাঁরা সংগীতের শিক্ষা অর্জন করে গোয়ালিয়রে প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁরা অত্যন্ত তরুণ বয়সেই গোয়ালিয়রের সভাগায়ক নিযুক্ত হন। তাঁদের প্রতি স্নেহশীল মহারাজা জয়াজী রাও সিন্ধিয়ার ইচ্ছা ছিল এঁরা বড়ে মহম্মদ খাঁ'র কাছে গায়ন শিক্ষা গ্রহণ করুক কিন্তু এই প্রস্তাবে বড়ে মহম্মদ খাঁ অস্বীকৃতি জানালে মহারাজা এই ভাতৃদ্বয়কে বড়ে মহম্মদ খাঁ'র অভ্যাস কালের সময় তা পর্দার আড়াল থেকে শোনার ব্যবস্থা করে দেন। যার ফলে খুব অল্পসময়ের মধ্যেই তাঁরা মহম্মদ খাঁ'র গায়নশৈলী অনুকরণ করে খেয়াল গানে যুগান্তকারী নতুনত্ব প্রদর্শন করেন। হস্সু ও হদ্দু খাঁ'র পিতামহ নত্থন পীর বক্স যেমন গুণী গায়ক ছিলেন তেমনি ছিলেন যোগ্য শিক্ষক। খগ্গে খুদাবক্স আগ্রা থেকে গোয়ালিয়রে এসে তাঁর কাছে তালিম নেন। জানা যায় যে, নত্থন পীর বক্সের কাছে কণ্ঠ সাধনের কালেই খুদাবক্সের কর্কশ কণ্ঠ পরবর্তী কালে পরিশোধিত হয়। নত্থন পীর বক্সের পৌত্র হস্সু ও হদ্দু খাঁ গোয়ালিয়র ঘরানার শ্রেষ্ঠ

সংগীতজ্ঞ ছিলেন বলে মনে করা হয়। যদিও দুজনের শিক্ষা একত্রে হয়েছিল এবং অনেক আসরেও তাঁরা একত্রে গাইতেন তথাপি হস্‌সু খাঁ ছিলেন প্রবাদ প্রতিম গায়ক। হস্‌সু খাঁ'র কতগুলি বৈশিষ্ট্য ছিল। তিনি তিন সপ্তকেরও অধিক গ্রামে সাবলীল ভাবে গাইতে পারতেন। বোলতানে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। বিভিন্ন আসরে তিনি কড়ক বিজলীর মত কঠিন তান বিদ্যুৎ গতিতে পরিবেশন করতেন। কিন্তু অত্যন্ত অল্পবয়সে তিনি বেদনাদায়ক মৃত্যুবরণ করেন। কথিত আছে যে আনুমানিক ১৮৫৪ (মতান্তরে ১৮৫৯) সালে একটি আসরে বড়ে মহম্মদ খাঁ'র অনুরোধে একাধিকবার কড়ক বিজলী তান প্রয়োগের ফলে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। শোনা যায় যে এই ঘটনায় মর্মাহত হয়ে বড়ে মহম্মদ খাঁ গোয়ালিয়র ত্যাগ করে রেওয়া চলে যান এবং সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। হস্‌সু খাঁ'র মৃত্যুর প্রায় ২৪ বছর পর্যন্ত হদ্দু খাঁ জীবিত থাকেন এবং সমকালীন প্রায় অপ্রতিদ্বন্দী খেয়ালিয়ারূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। হস্‌সু খাঁ ও হদ্দু খাঁ উভয়ই শিক্ষক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তাঁদের কাছে শিক্ষার্থীরা আসতেন। জয়াজীরাও সিন্ধিয়া ১৮৪৪ সালে গোয়ালিয়ারের সিংহাসনে আরোহন করেন এবং ১৮৮৬-তে তিনি মারা যান। তাঁর গানের শখ অত্যন্ত প্রবল থাকায় তিনি হস্‌সু ও হদ্দু খাঁ'র ভ্রাতা নত্থু খাঁ'র কাছে গান্ডা বাঁধেন। হস্‌সু খাঁ'র অন্যান্য শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে ছিলেন বাসুদেব বুয়া যোশী (১৮২৯-৮২), দেবজী বুয়া বা রামকৃষ্ণ বুয়া (১৭৯৮-১৮৭৬), বালকৃষ্ণ বুয়া (প্রথম) ও বাবা দীক্ষিত। শোনা যায় যে হস্‌সু খাঁ'র নিকট খেয়াল শিক্ষার বিনিময়ে দেবজী বুয়া- খাঁ সাহেবের পুত্র গুলে ইমাম খাঁ ও ভ্রাতা নত্থু খাঁকে ধামার ও টপ্পা শিক্ষা দিয়েছিলেন।

এঁদের অনেকেই আবার হদ্দু খাঁ'র কাছেও শিক্ষালাভ করেন। বালকৃষ্ণ বুয়া, বাসুদেব রাও যোশী, বাবা দীক্ষিত দেবজী বুয়া, শংকর পণ্ডিত এঁরা সকলেই হদ্দু খাঁ'র কাছেও তালিম নেন যার বেশির ভাগই ছিলেন মারাঠী ব্রাহ্মণ। বালকৃষ্ণ বুয়া ইচলকরঞ্জীকর তালিম পেয়েছিলেন বাসুদের রাও যোশীর কাছে আর ইচলকরঞ্জীকরের কাছে তালিম নিয়েছিলেন ইঙ্গলে বুয়া, অনন্ত মনোহর যোশী, বিষ্ণু দিগম্বর প্রমুখ। বিষ্ণু দিগম্বরের শিষ্যদের মধ্যে ছিলেন ওমকার নাথ ঠাকুর, পটবর্ধন, নারায়ণ রাও ব্যাসসহ আরো অনেকে। এভাবে পুরো মহারাষ্ট্রে গোয়ালিয়রের গায়কী ছড়িয়ে পড়ে। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হলেন রামকৃষ্ণ বুয়া ভাজে, বিষ্ণু দিগম্বর, অনন্ত মনোহর বা অন্তবুয়া। খেয়াল গায়কীতে মারাঠী নাট্য সংগীতের প্রভাবের কারণে পটবর্ধন ও নারায়ণ রাও ব্যাসের গায়কীর সাথে গোয়ালিয়রের পণ্ডিত পরিবারের গায়কীর অনেক পার্থক্য পাওয়া যায়। হদ্দু খাঁ'র আরেকজন প্রিয়শিষ্য ছিলেন বিষ্ণুপন্থ ছত্রে। কথিত আছে যে হদ্দু খাঁ তাঁর সন্তানকে যেসংখ্যক বন্দিশের তালিম দিয়েছিলেন তার চেয়ে অধিক সংখ্যক বন্দিশের তালিম এই প্রিয় শিষ্যকে দিয়েছিলেন। হদ্দু খাঁ'র দুই পুত্র ছোটে মহম্মদ খাঁ ও রহমত খাঁ ছিলেন তাঁর যোগ্য উত্তরাধিকারী। ছোটে মহম্মদ খাঁ অসাধারণ গায়ক ও পাখোয়াজবাদক ছিলেন। তিনি নানাসাহেব পানকের নিকট পাখোয়াজ শিক্ষালাভ করেন। কিছুদিন বরোদার রাজদরবারে নিযুক্ত থাকার পর তিনি মুম্বাই চলে যান। কথিত আছে পিতার জীবিতকালেই তিনি প্রাণ হারান এবং সেই শোকেই এক বছরের মধ্যে পিতা হদ্দু

খাঁ মৃত্যুবরণ করেন। আরেক পুত্র রহমত খাঁ এই ঘরানার গুণী গায়করূপে সমগ্র উত্তর ভারতে খ্যাতি অর্জন করেন। জানা যায় যে, সংগীতজীবনের গৌরবোজ্জ্বল মধ্যাহ্নে রহমত খাঁ'র মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে যায়। তিনি ছিলেন অদ্বিতীয় গায়ক এবং উত্তর ভারতীয় সংগীতের বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত। ভ্রাতা ছোটে মহম্মদ খাঁ-এর সাথে তিনিও পিতার কাছেই সংগীতের তালিম পান এবং গোয়ালিয়র ঘরানার গায়নশৈলী সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভ করেন। স্বল্প ব্যবধানে রহমত খাঁ পিতা ও ভ্রাতার মৃত্যুতে শোকাহত হয়ে গোয়ালিয়র ত্যাগ করেন এবং দীর্ঘসময় বিভিন্নস্থানে সন্ন্যাসীর মত কাটিয়ে অবশেষে গুরুভাই বিষ্ণুপন্থ ছত্রের বিশেষ যত্ন ও সহায়তায় স্বাভাবিক জীবনযাপন শুরু করেন। তিনি কোন শিষ্যকে তালিম না দিলেও ওস্তাদ আব্দুল করিম খাঁ, ভাস্কর রাও বখলেসহ আরো অনেকে তাঁর সংগীতে প্রভাবিত হয়েছিলেন। পণ্ডিত ওমকারনাথ ঠাকুর তাঁর সঙ্গে তানপুরা বাজাতেন। শেষ বয়সে তিনি কিছুদিন কুরুন্দবার রাজদরবারে আশ্রয় লাভ করেন এবং সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

কাদের বক্স খাঁ'র দত্তক পুত্র নত্থু খাঁ ধ্রুপদ ও খেয়াল ছাড়াও তারানার অত্যন্ত গুণী গায়ক ছিলেন। তাঁর কোন পুত্র না থাকায় শ্যালিকাপুত্র নিসার হুসেনকে দত্তক পুত্র নেন এবং তাকে সংগীতশিক্ষা দান করেন। পরবর্তী কালে নিসার হুসেন গোয়ালিয়র ঘরানার বিখ্যাত গায়করূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হন। তাঁর শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে গোয়ালিয়রের শংকর পণ্ডিত, ভাউরাও যোশী, রামকৃষ্ণ বুয়া ভজে ও শংকরাও হর্দেকর, শংকর পণ্ডিতের পুত্র বর্ষীয়ান খেয়ালিয়া কৃষ্ণরাও পণ্ডিত প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

নিসার হুসেন খাঁ ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল, টপ্পা, ঠুমরী প্রভৃতি সকলপ্রকার গানেই পারদর্শী ছিলেন এবং পিতা নত্থু খাঁ'র সঙ্গে গোয়ালিয়রের রাজদরবারে নিযুক্ত ছিলেন। পরবর্তী কালে গোয়ালিয়রেই পরিণত বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে শংকররাও পণ্ডিত, একনাথ পণ্ডিত, রামকৃষ্ণ বুয়া, ভাউরাও যোশী, শংকররাও হরদেকর প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

গোয়ালিয়র ঘরানার আরেকজন বিখ্যাত শিল্পী ছিলেন গুলে ইমাম খাঁ'র পুত্র ওস্তাদ মেহেদী হুসেন খাঁ। তিনি অত্যন্ত সুমধুর কণ্ঠের অধিকারী ছিলেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে বলবেজী পুছওয়ালে এবং মোঘুবাঈ কুর্দিকর উল্লেখযোগ্য। ১৯২০ সালের কাছাকাছি গোয়ালিয়রে এই শিল্পী মৃত্যুবরণ করেন।

হদ্দু খাঁ'র আরেক শিষ্য বাসুদেব বুয়া যোশী ১৮১৯ সালে (সম্ভবত) মুম্বাইয়ের থানে জেলার নগাঁও গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। অসাধারণ সংগীত প্রতিভার অধিকারী এই শিল্পী মাত্র ১৬ বছর বয়সে সংগীতশিক্ষার উদ্দেশ্যে গোয়ালিয়র যান এবং হদ্দু খাঁ'র শিষ্যত্ব লাভের পর সাধনা ও একাগ্রতার গুণে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ গায়করূপে খ্যাতি অর্জন করেন। বিভিন্নসময় তিনি গোয়ালিয়র দরবারে হদ্দু খাঁ'র সহযোগী শিল্পী হিসেবে সংগীত পরিবেশন করেন। কৃষ্ণশাস্ত্রী শুক্লা, লক্ষণ রাও, বালকৃষ্ণ বুয়া, ইচলকরঞ্জীকর প্রমুখ ছাড়াও তাঁর

পুত্র ভাইয়া যোশী ছিলেন তাঁর শিষ্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। জানা যায় যে এই সংগীতশিল্পী ১৮৯০ সালে গোয়ালিয়রে মৃত্যুবরণ করেন।

১৮৪৯ সালের দিকে কোলাপুরের নিকটবর্তী চন্দুর গ্রামে বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ রামচন্দ্র বুয়ার পুত্র বালকৃষ্ণ বুয়া ইচলকরঞ্জীকর জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শিক্ষকমণ্ডলীর মধ্যে ছিলেন হস্‌সু খাঁ, হদ্দু খাঁ, বাসুদেব বুয়া যোশী, ভাউজী বুয়া, দেবজী বুয়া, যোশী বুয়া, রামকৃষ্ণ বুয়া প্রমুখ। ধীরে ধীরে তিনি প্রখ্যাত সংগীতকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। কিছুদিন তিনি মিরাজ, অউন্ধ ও নেপালের রাজদরবারে নিযুক্ত থাকার পর অন্ধ্রপ্রদেশের ইচলকরঞ্জীকর রাজ্যে চলে আসেন এবং সেখানে নিযুক্ত হন। তখন থেকেই তাঁর নামের সঙ্গে ইচলকরঞ্জীকর শব্দটি যুক্ত হয়ে যায়। তিনি '*সংগীত দর্পন*' নামক সংগীত পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন এবং 'গায়ন সমাজ' নামে মুম্বাই এ একটি সংগীত সংস্থার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে অনন্তমনোহর যোশী ও তাঁর পুত্র গজাননরাও যোশী, পণ্ডিত বিষ্ণুদিগম্বর পলুষ্কর, নীলকণ্ঠবুয়া, যশবন্ত বুয়া প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। এই মহান সংগীতজ্ঞ ১৯২৬ সালের দিকে মৃত্যুবরণ করেন।

মহারাষ্ট্রের কুরুন্দবাড় (বেলগাঁও) নামক স্থানে ১৮৭২ সালে গোয়ালিয়র ঘরানার আরেক শ্রেষ্ঠ শিল্পী বিষ্ণু দিগম্বর পলুষ্করের জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম দিগম্বর গোপাল। এঁদের বংশধরেরা কীর্তন গায়করূপে প্রসিদ্ধ ছিল। বাল্যকাল থেকেই বিষ্ণু দিগম্বর পলুষ্করের সংগীতের প্রতি প্রবল আকর্ষণ ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত মাত্র ১২ বছর বয়সে তিনি তাঁর দৃষ্টি শক্তি হারান এবং তখন সংগীত সাধনাই তাঁর জীবনের একমাত্র ব্রত হয়ে ওঠে। তাঁর পিতা তাকে হস্‌সু-হদ্দু খাঁ'র শিষ্য ইচলকরঞ্জীকরের কাছে সংগীতশিক্ষার জন্য পাঠান। সংগীত শিক্ষাকালীন তিনি কঠোর পরিশ্রম করেন। কথিত আছে যে তিনি খুঁটির সাথে টিকি বেঁধে সারারাত সাধনা করতেন। পাঁচ সপ্তক পর্যন্ত তাঁর স্বর সীমা ছিল এবং মন্দ্র সপ্তকে যখন তিনি তান করতেন তখন অদ্ভুত এক কম্পন অনুভূত হত। তাঁর গায়ন সম্পর্কে আরো শোনা যায় যে, মল্লার জাতীয় রাগ যখন তিনি গাইতেন তখন মেঘের গর্জন অনুভূত হত। সংগীতের প্রচার এবং প্রসারের জন্য তিনি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে যান এবং তাঁর প্রচেষ্টায় ভারতের বিভিন্ন স্থানে সংগীত কেন্দ্র স্থাপিত হয়। যেমন- নাসিক-এ 'সোমনাথ আধার' আশ্রম স্থাপন করে বৈদিকযুগের আশ্রম প্রণালীতে সেখানে শিক্ষার্থীদের সংগীতশিক্ষা দান করেন। ১৯০১ সালে তিনি লাহোরে গন্ধর্ব মহাবিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং এর আরেক শাখা ১৯০৮ সালে মুম্বাইয়ে স্থাপিত হয়। তাঁর অসংখ্য যোগ্য শিষ্যের মধ্যে- ওমকার নাথ ঠাকুর, অনন্তমনোহর যোশী, নারায়ণ রাও ব্যাস, শংকররাও ব্যাস, গোখলে বুয়া, ভি.এ কসলকর, বিনায়ক রাও পটবর্ধন, এ.টি হারলেকর প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। ১৯৩১ সালে গোয়ালিয়র ঘরানার এই বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর রচিত সংগীত বিষয়ক গ্রন্থের মধ্যে ৫০টি গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়। এর মধ্যে *রাগ প্রবেশ (২০খণ্ড)*, *সংগীত বালবোধ*, *বালপ্রকাশ সংগীত তত্ত্বদর্শক*, *ভজনামৃত লহরী*, *স্বল্পালাপ গায়ন*, *মহিলা সংগীত*, *রাষ্ট্রীয় সংগীত* প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।[৩]

অনন্তমনোহর যোশী (অন্তবুয়া) ১৮৭৮ সালে মহারাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মনোহর বুয়া। পিতার নিকটই তাঁর সংগীতশিক্ষার প্রারম্ভ হয়। পরবর্তী কালে তিনি বিষ্ণু দিগম্বর পলুস্করের নিকট সংগীতশিক্ষা লাভ করেন এবং প্রসিদ্ধ ঘরানাদার গায়করূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৯৫৫ সালে তিনি রাষ্ট্রীয় পুরষ্কারে সম্মানিত হন। তাঁর প্রধান শিষ্যদের মধ্যে গজানন রাও যোশী (পুত্র) ও নন্দকিশোর উল্লেখযোগ্য। তাঁর পুত্র গজানন রাও যোশী ১৯১০ সালে মুম্বাইয়ে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে তিনি পিতার কাছেই শিক্ষাগ্রহণ শুরু করেন। পরবর্তী কালে বালকৃষ্ণ বুয়া ইচলকরঞ্জীকর, আল্লাদিয়া খাঁ এবং তাঁর পুত্র মঞ্জী খাঁ'র কাছে শিক্ষালাভ করেন। পরবর্তীতে গজানন রাও যোশী নিজেকে বেহালা বাদকরূপে প্রতিষ্ঠিত করে দুইবার নাট্যসংগীত একাডেমী পুরষ্কার লাভ করেন। কৌশল্যা-মাঞ্জেকর, ডি. আর নিম্বাগী, শ্রীধর পার্শেকর প্রমুখ তাঁর শিষ্য ছিলেন। ১৯৮৭ সালের ২৮ জুন তাঁর মৃত্যু হয়।

পণ্ডিত ওমকারনাথ ঠাকুর ছিলেন গোয়ালিয়র ঘরানার আরেক দিকপাল। ১৮৯৭ সালের ২৪ জুন প্রাক্তন বরোদা রাজ্যের কামার জেলার ঝাজ গ্রামে ভারতবর্ষের এই অন্যতম শ্রেষ্ঠ গায়ক জন্মগ্রহণ করেন। অসাধারণ সংগীত প্রতিভার অধিকারী এই শিল্পী পণ্ডিত বিষ্ণু দিগম্বর পলুস্করের শিষ্যত্ব লাভ করে খুব অল্পসময়ের মধ্যেই প্রতিভা ও নিষ্ঠার গুণে গুরুর প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। পণ্ডিত বিষ্ণু দিগম্বর পলুস্কর ১৯১৭ সালে পণ্ডিত ওমকারনাথ ঠাকুরকে গন্ধর্ব মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। ফলে তিনি বিভিন্ন সংগীত সম্মেলনে অংশগ্রহণ করার সুযোগ লাভ করেন এবং বিভিন্ন স্থানে সংগীত পরিবেশনার মাধ্যমে সমগ্রদেশে তাঁর সুনাম প্রতিষ্ঠা করেন। শাস্ত্রগত এবং ক্রিয়াত্মক উভয় বিষয়েই তাঁর যে গভীর জ্ঞান ছিল তা সচরাচর দেখা যায় না। তাঁর রচিত গ্রন্থ গুলির মধ্যে *সংগীতাঞ্জলি (৬ খণ্ড)*, *প্রণব ভারতী* ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। খেয়াল গায়ক হলেও ধ্রুপদ, ঠুমরী, ভজন, প্রভৃতিতে তিনি অত্যন্ত সাবলীল ছিলেন। বিশেষ করে ভজন গানে তিনি এক নবীন শৈলী প্রবর্তন করেন। পৃথিবীর বহুদেশে তিনি সংগীত পরিবেশন করে ভারতীয় সংগীতের সম্মান বৃদ্ধি করেন। তিনি ১৯৪৩ সালে কাশীর বিশুদ্ধ সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় কর্তৃক সংগীত সম্রাট, ১৯৫৫ সালে পদ্মশ্রী, ১৯৬৩ সালে বানারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এবং ১৯৬৪ সালে রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট উপাধি লাভ করেন। ১৯৬৭ সালের ২৯ ডিসেম্বর এই মহান শিল্পীর মৃত্যু হয়। তাঁর শিষ্যের মধ্যে ড. এন রাজন, বলবন্ত রাও, ড. প্রেমলতা শর্মা প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

গোয়ালিয়র ঘরানার বিস্তার লাভে বিখ্যাত গায়ক আমীর খাঁ'র তৃতীয় পুত্র সিন্ধে খাঁ'র নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি সাধু প্রকৃতির গায়ক ছিলেন। যে কোন স্থানে তিনি গান গাইতে বসে যেতেন। পূর্বে বন্দিশ লিপিবদ্ধ হত না বিধায় এগুলো সংগ্রহ করতে হত। পণ্ডিত বিষ্ণু দিগম্বর, ড. বি. আর. দেওধর প্রমুখ সংগীতজ্ঞরা তাঁর কাছ থেকে সংগীত সংগ্রহ করেছেন বলে জানা যায়।

গোয়ালিয়র ঘরানার প্রসিদ্ধ খেয়াল ও তারানা গায়ক বিনায়ক রাও পটবর্ধন ১৮৯৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পিতৃব্য কেশব রাও পটবর্ধনের কাছেই তাঁর সংগীতের প্রাথমিক শিক্ষালাভ করেন। ১৯০৯ সালে পণ্ডিত

বিষ্ণু দিগম্বর পলুস্করের নিকট শিক্ষালাভের সুযোগ প্রাপ্ত হন। অতি উচ্চ সপ্তকে দ্রুতগতিতে গাইবার ক্ষমতা রাখতেন বলে খুব অল্পসময়েই তিনি দেশজোড়া খ্যাতি অর্জন করেন। অদ্বিতীয় তারানা গায়ক হওয়ায় অধিকাংশ অনুষ্ঠানে তিনি তারানা পরিবেশন করতেন। তাঁর পুত্র নারায়ণ রাও পরবর্তী কালে বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। সংগীত বিষয়ক বহু গ্রন্থ তিনি রচনা করেন যার মধ্যে *রাগ বিজ্ঞান (৬ খণ্ড)* বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯৭৫ সালের ২৩ আগষ্ট তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর শিষ্যের মধ্যে দত্তাত্রেয় বিষ্ণু (ডি.ভি) পলুস্কর, সুনন্দা পট্টনায়ক, নারায়ণ রাও (পুত্র) ও বিনয়চন্দ্র মৃদগল্য উল্লেখযোগ্য। দত্তাত্রেয় বিষ্ণু (ডি.ভি) পলুস্কর ছিলেন পণ্ডিত বিষ্ণু দিগম্বর পলুস্করের দ্বাদশ সন্তান। তিনি ১৯২১ সালে ২৮ মে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র দশ বছর বয়সে পিতার মৃত্যু হওয়ায় অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী এই বালক তাঁর পিতার কাছে শিক্ষালাভের সুযোগ হতে বঞ্চিত হন। প্রথমদিকে পিতৃব্য চিন্তামন রাও এবং পরবর্তী কালে নারায়ণ রাও ব্যাস ও বিনায়করাও পটবর্ধনের কাছে তিনি সংগীতশিক্ষা লাভ করেন। অত্যন্ত সুমধুর কণ্ঠস্বরের অধিকারী এই শিল্পী ১৯৩৫ সালে জলন্ধরে 'হরবল্লভ মেলা'র সংগীত সম্মেলনে সংগীত পরিবেশন করে বিশিষ্ট শিল্পীর সম্মান অর্জন করেন এবং ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গায়করূপে প্রতিষ্ঠিত হন। কিন্তু মাত্র ৩৫ বছর বয়সে এই মহান শিল্পীর অকাল মৃত্যু ঘটে। এছাড়াও গোয়ালিয়র ঘরানার একজন প্রসিদ্ধ কীর্তন গায়ক ছিলেন বিষ্ণুপণ্ডিত। তিনি একজন গোঁড়া ব্রাহ্মণ হলেও দরবারী গায়ক হস্‌সু খাঁ, হদ্দু খাঁ ও নত্থু খাঁ'র সাথে সুসম্পর্ক ছিল। যদিও তখনকার ওস্তাদেরা নিজের আত্মীয় ব্যতিরেকে অন্য কাউকে তালিম দেওয়ার বিরোধী ছিলেন তথাপি হস্‌সু, হদ্দু ও নত্থু খাঁ- বিষ্ণু পণ্ডিতের পুত্র শংকর ও একনাথ কে তালিম দেন। নিসার হুসেন খাঁ বহুদিন পণ্ডিত পরিবারে বসবাস করে এই ভাতৃদ্বয়কে সংগীতশিক্ষা দেন। বিষ্ণু পণ্ডিতের তৃতীয় পুত্র শংকররাও ছিলেন অতিগুণী ধ্রুপদ, ধামার, টপ্পা ও তারানার গায়ক। তিনি গোয়ালিয়রে গন্ধর্ব বিদ্যালয় স্থাপন করে সংগীত প্রচারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন। তাঁর বেশ কিছু শিষ্য পরবর্তী সময়ে গোয়ালিয়র ঘরানার প্রতিষ্ঠিত শিল্পীরূপে প্রতিষ্ঠা পান যেমন: গনপতরাও গুণে, রাজাভাই পুছওয়ালে, কৃষ্ণ রাওভুলে, মহেশ্বররাও বুয়া প্রমুখ। বিষ্ণু পণ্ডিতের চতুর্থ পুত্র একনাথ রাও পণ্ডিত ১৮৭০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সেতার, বীণা ও তবলা বাদক ছিলেন। তিনি হদ্দু খাঁ ও নিসার হুসেন খাঁ এবং অগ্রজ শংকর রাওয়ের কাছে কণ্ঠসংগীতে, বাবু খাঁ'র কাছে সেতার, মুজাফ্‌ফর খাঁ'র কাছে বীণা এবং জোরাবর সিংহের কাছে তবলা শিক্ষালাভ করেন। তাঁর ভাণ্ডার ছিল অসংখ্য রাগের জ্ঞান ও অফুরন্ত বন্দিশে পূর্ণ। পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে একনাথ রাওয়ের নিকট হতে আড়াইশতকের অধিক গান সংগ্রহ করে তাঁর *ক্রমিক পুস্তক মালিকা (৬ খণ্ড)* গ্রন্থে প্রকাশ করেন।[৪]

গোয়ালিয়র ও সাতারার দরবারী সংগীতজ্ঞ সুবিখ্যাত গায়ক কৃষ্ণরাও শংকর পণ্ডিত ১৮৯৩ সালের ২৬ জুলাই গোয়ালিয়রের লস্কর নগরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা শংকর রাও এবং নিসার হোসেনের কাছে তিনি তালিম নেন। পিতার মৃত্যুর পর পারিবারিক সংগীত সংস্থার নামকরণ করেন শংকর গন্ধর্ব বিদ্যালয়। তাঁর

রচিত গ্রন্থের মধ্যে *সংগীত প্রবেশ*, *সংগীত সরগমসার*, *সংগীত আলাপ সঞ্চারী* ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ১৮৮২ সালের ১২ আগস্ট গোয়ালিয়রের লস্কর নগরে জন্মগ্রহণ করেন গোয়ালিয়র ঘরানার সুবিখ্যাত গায়ক ও শাস্ত্রকার রাজাভাইয়া পুছওয়ালে। তাঁর পূর্বপুরুষ বুলেন্দখন্ডের পুছ নগরের জায়গীরদার ছিলেন বলে তাঁর নামের সঙ্গে পুছওয়ালে পদবীর সংযোজন হয়েছে। ক্রমে তিনি গুণী গায়করূপে প্রতিষ্ঠিত হন এবং মহারাজা মাধবরাও সিন্ধিয়ার সভায় নিযুক্ত হন। তিনি *তান মালিকা (৪ খণ্ড)*, *ঠুংরী তরঙ্গিনী*, *ধ্রুপদ ধামার গায়ন* প্রভৃতি সংগীত বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেছেন। ১৯৫৬ সালের ১ এপ্রিল তাঁর মৃত্যু হয়।

বাংলার সাথেও গোয়ালিয়র ঘরানার যোগসূত্র লক্ষ করা যায়। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের আনুকূল্যে গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী গোয়ালিয়রে অবস্থান করে এই ঘরানার খেয়াল আয়ত্ত করেন এবং হদ্দু খাঁ'র কাছে শিক্ষালাভের সুযোগ পান। পরবর্তী কালে গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সংগীতসভায় প্রধান সভাগায়ক নিযুক্ত হন। বাংলার লক্ষ্মী নারায়ণ বাবাজী গোয়ালিয়র ঘরানার হায়দার খাঁ'র কাছে খেয়ালের তালিম নেন। কারো কারো মতে, হায়দার খাঁ ছিলেন হদ্দু খাঁ'র পুত্র। এর পরবর্তী কালে বাংলার আরেক গুণীগায়ক বেহালা নামক স্থানের বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় গোয়ালিয়র ঘরানার খেয়াল শিল্পীরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। তিনি শুধুই খেয়াল চর্চা করতেন অন্যদিকে গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী ও লক্ষ্মী নারায়ণ বাবাজী খেয়াল ছাড়াও ধ্রুপদ, টপ্পা ইত্যাদির চর্চাও করতেন।

একথা অনস্বীকার্য যে মহারাষ্ট্রীয় গায়কমণ্ডলী গোয়ালিয়র ঘরানার উত্তরাধিকার অনেকখানি পেয়েছেন। যার ফলে আমরা দেখতে পাই মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন সংগীতকেন্দ্রে এবং গোয়ালিয়রে হস্‌সু খাঁ'র খেয়াল সংগীতের ঐতিহ্য বর্তমানেও বহন করে চলেছেন মহারাষ্ট্রীয় সংগীত গুণীরা। প্রবীণ ঘরানাদার কৃষ্ণরাও শংকর পণ্ডিতের নাম এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

গোয়ালিয়র ঘরানার গায়নরীতির অন্যতম সাংগীতিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর গাম্ভীর্যপূর্ণ ভাব ও ভারী চালের খেয়াল গায়ন। রাগ নির্বাচনেও এই ঘরানার শিল্পীরা জনপ্রিয় রাগগুলোকেই বেছে নেন। ফলে শ্রোতারা রাগনির্ণয়ের জটিলতা থেকে রেহাই পান। খেয়ালে 'বহলওয়া' নামক এক বিশিষ্ট রীতির স্বরবিস্তার এই ঘরানার গানের বৈশিষ্ট্য। ধ্রুপদ অঙ্গের খেয়াল, খোলা কণ্ঠ, আকারে আলাপ, গমকের প্রাধান্য, সুরের সুগভীর বিন্যাস ও স্বর বিস্তারে কুশলতা, রাগরূপের বিস্তৃত পরিবেশন, অবরোহ গতিতে জটিল তান, খেয়ালের শেষ পর্যায়ে তারানা গায়ন, সপাট তান ও সুন্দর লয়কারীতে বোলতানের প্রয়োগ এই ঘরানার গানের অন্যতম প্রধান সাংগীতিক বৈশিষ্ট্য।

গোয়ালিয়র ঘরানার বিখ্যাত সংগীতজ্ঞদের চিত্র:

বিষ্ণু দিগম্বর পলুস্কর[৫]

অনন্ত মনোহর যোশী[৬]

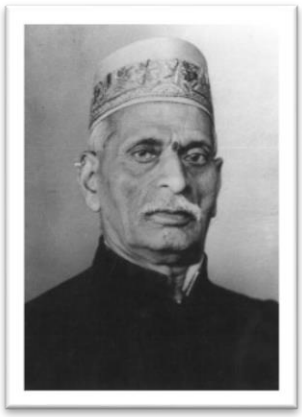

পণ্ডিত কৃষ্ণরাও শংকর[৭]

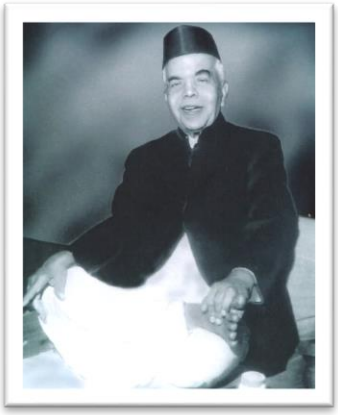

পণ্ডিত গুরুরাও দেশপাণ্ডে[৮]

তথ্য ও চিত্রসূত্র

১) অমল দাশ শর্মা, *প্রাচীন ও নবীন সংগীতজ্ঞ এবং ঘরানার ইতিবৃত্ত*, দরবারী প্রকাশন, কলকাতা: ১৯৯৫

২) করুণাময় গোস্বামী, *সংগীতকোষ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা: ১৯৮৫

৩) অমল দাশ শর্মা, *প্রাচীন ও নবীন সংগীতজ্ঞ এবং ঘরানার ইতিবৃত্ত*, দরবারী প্রকাশন, কলকাতা: ১৯৯৫

৪) দিলীপ কুমার মুখোপাধ্যায়, *ভারতীয় সংগীতে ঘরানার ইতিহাস*, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী প্রা:লি:, কলকাতা: ১৩৮৪

৫) https://en.wikipedia.org/wiki/Gwalior_gharana#/media/File:Vishnu_Diga mbar_Paluskar.jpg

৬) https://www.youtube.com/watch?v=WIbsumNSmvY

৭) http://www.meetapandit.com/pt-krishnarao-shankar-pandit/

৮) https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gururao_Deshpande_1.jpg

আগ্রা ঘরানা

যমুনার দক্ষিণে দিল্লী থেকে ২০০ কিলোমিটার দুরে প্রাচীন আগ্রা নগরী অবস্থিত। ১০১৮ সালে গজনীর সুলতান মাহমুদ দ্বারা এই নগর ধ্বংসের পর ১৫০৪ সালে আগ্রা নগরীর সামরিক গুরুত্ব উপলব্ধি করে লোদি বংশের সুলতান সিকন্দার গাজি (১৪৮৮-১৫১৭) যমুনার তীরবর্তী এই নতুন নগর স্থাপন করেন। পরবর্তী কালে মোঘল সম্রাট আকবর (১৫৫৬-১৬০৫) আগ্রা দূর্গ নির্মাণ করে এই নগরীর উন্নতি বিধানে সহায়ক ভূমিকা রাখেন। আগ্রা ভারতের উত্তরপ্রদেশে অবস্থিত ১৯০০ বর্গ মাইল আয়তনের একটি জেলা শহর। সংগীত ব্যতীত কার্পেট, শতরঞ্জি, মার্বেল পাথরের সামগ্রী, রেশমের কারুকার্য যন্ত্র, কাঁচ ও কাঁচের চুড়ি ইত্যাদি বিভিন্ন সামগ্রীর জন্য আগ্রা বিখ্যাত। তবে মোঘল সাম্রাজ্যের রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত হওয়ায় এই অঞ্চলের সংগীতজ্ঞদের সাথে মোঘল দরবারের খুব একটা সম্পর্ক স্থাপিত হয় না।[১]

আগ্রা ঘরানা বলতে এই অঞ্চলের সংগীতজ্ঞ ও তাঁদের বংশ পরম্পরা এবং শিষ্যমণ্ডলী দ্বারা অনুশীলিত ধ্রুপদ ধামার ও খেয়াল গানের বিশিষ্ট রীতিকে বোঝায়। খেয়াল গানের উপর ধ্রুপদ ধামারের এবং ধ্রুপদ ধামারের উপর খেয়াল গানের গভীর প্রভাব এই ঘরানায় বিদ্যমান। খেয়ালের অন্যান্য ঘরানায় ধ্রুপদ ধামারের গুরুত্ব কম থাকলেও আগ্রা ঘরানায় ধ্রুপদ ধামারকে সমান গুরুত্ব দেওয়া হয়। যদিও পরবর্তী কালে খেয়াল গানই এই ঘরানার মূল ধারা হয়ে ওঠে। প্রায় দু'শো বছর ধরে এই ঘরানার খেয়াল ভারতীয় সংগীতজগতে প্রচলিত। রাগের নিয়ম, বিশুদ্ধ বাণীর প্রয়োগ ও শুদ্ধরাগ রূপায়ণ এই ঘরানার খেয়াল গায়কীর একটি অন্যতম সাংগীতিক বৈশিষ্ট্য। এই ধারায় গানের বাণীকে নানারকম ছন্দে গাওয়া হয়। গানের বাণী অথবা রাগের স্বর অস্পষ্ট হওয়ার আশংকায় অতিদ্রুত তান না গেয়ে বোলতানের প্রয়োগ করা হয় যা ধ্রুপদের মতই দ্বিগুন, চৌগুন ও আটগুন হয়ে থাকে।

পূর্বে এই ঘরানার প্রধান ধারা ছিল ধ্রুপদ ও ধামার এবং এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল নওহর বাণীর। ধারণা করা হয় যে আগ্রায় রাজপুত জনবসতি ছিল এবং রাজস্থানের রাজপুত সুজানসিংহ ছিলেন নওহর বাণীতে অত্যন্ত দক্ষ একজন শিল্পী। পরবর্তী কালে সুজানসিংহ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মক্কা-মদিনা ভ্রমন করেন এবং তাঁর নাম হয় হাজী সুজান খাঁ। তানসেনের সমসাময়িক হাজী সুজান খাঁ ও বিচিত্রা খাঁ সেইসময় সম্রাট আকবরের দরবারে নিযুক্ত ছিলেন। সম্রাট আকবর তাঁকে 'দীপক জ্যোতি' উপাধি দেন বলে একটি ধ্রুপদে উল্লেখ রয়েছে। মক্কা-মদীনা ভ্রমনের পর তিনি যোগ রাগে বিখ্যাত ধ্রুপদ 'প্রথম মন আল্লাহ' রচনা করেন। এটি পরবর্তী কালে আগ্রা ঘরানার ওস্তাদদের একটি পছন্দের ধ্রুপদে পরিণত হয়। সুজান খাঁকে সম্রাট আকবর গোন্তপুর নামক স্থানে একটি গ্রামে জায়গীর দেন। সিপাহী বিদ্রোহ পর্যন্ত তাঁর বংশধরেরা সেখানে বসবাস করেন। এই বংশের পূর্বপুরুষেরা হিন্দু ছিলেন একথা স্বীকৃত হলেও সুজান

সিংহ যে অলক দাস, খলক দাস, মলক দাস ও লবঙ্গ দাসের বংশধর সে বিষয়ে সুস্পষ্ট কোন ধারণা পাওয়া যায় না। এই ঘরানায় ছন্দনামে অনেক শিল্পী গান রচনা করতেন। শ্যামরঙ্গ ও সরসরঙ্গ নামে গুণীশিল্পীর এগুলো ছদ্মনাম বলে মনে করা হয়। সুজান খাঁ এঁদের বংশধর ছিলেন কিনা তা জানা যায় না।

শ্যামরঙ্গ ও সরসরঙ্গ অত্যন্ত গুণী ধ্রুপদ গায়ক ছিলেন। ১৮শ শতাব্দীতে আগ্রায় অবস্থিত কাশীর মহারাজা বীরভদ্র সিংহের দরবারে এই দুই ভাতৃদ্বয় নিযুক্ত থাকার সুবাদে আগ্রায় বসতি স্থাপন করে বংশধরদের তালিম দেন।

আগ্রা ঘরানা বলতে যে বিখ্যাত খেয়াল ঘরানাকে বোঝায় তার প্রবর্তক হচ্ছেন খগ্‌গে খুদাবক্‌স। শ্যামরঙ্গের (কইয়াম খাঁ) পুত্র খগ্‌গে খুদাবক্‌সের জন্ম অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে। বাল্যকালে খুদাবকস্‌ের কণ্ঠস্বর কর্কশ হওয়ায় তা সংগীতের উপযোগী ছিল না বলে তাঁকে সংগীতশিক্ষার জন্য নিরুৎসাহিত করা হয়। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তিনি গোয়ালিয়র চলে যান এবং গোয়ালিয়রের বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ নত্থন পীরবক্‌সের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। জানা যায় যে, নত্থন পীরবক্‌স সকলের অজ্ঞাতে একটি ভূগর্ভস্থ গোপন কক্ষে খুদাবক্‌সকে সংগীতে তালিম দেন এবং একটানা চৌদ্দ বছর প্রতিদিন দশ থেকে বারো ঘণ্টা স্বরবিন্যাসের অনুশীলন করান। ফলে ধীরে ধীরে তাঁর কণ্ঠস্বর মধুর হয় এবং কালে তিনি একজন প্রসিদ্ধ গায়করূপে আত্মপ্রকাশ করেন। সংগীতে প্রতিষ্ঠা লাভের পর তিনি জয়পুরের মহারাজা সওয়াইরাম সিংহের দরবারে সভাগায়ক হিসাবে নিযুক্ত হন। অপ্রচলিত রাগের প্রতি খুদাবক্‌সের অধিক আগ্রহ ছিল। তিনি অসংখ্য খেয়াল গান রচনা করেছেন। তাঁর রচিত বেহাগ রাগে 'কৈসে সুখ সোবে' বন্দিশটি অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র গোলাম আব্বাস, ভাতৃস্পুত্র শের খাঁ, আলী বক্‌স ও শিউদিন উল্লেখযোগ্য।[২]

খুদাবক্‌সের জ্যেষ্ঠ পুত্র গোলাম আব্বাস খাঁ একজন বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ ছিলেন। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে তিনি সভা গায়কের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর সুরেলা ও লয়দার গায়নশৈলীতে অতিদ্রুত শ্রোতারা মুগ্ধ হয়ে যেতেন। ভোজন রসিক ও কঠোর নিয়মনীতি অনুসরণকারী এই মহান শিল্পী উর্দূ ও ফারসি ভাষায় বার্তালাপে অত্যন্ত নিপুণ ছিলেন। তাঁর শিষ্যের মধ্যে চন্দন চৌবে, ফৈয়াজ হুসেন খাঁ (দৌহিত্র), কল্লন খাঁ ও মহম্মদ খাঁ ভাতৃদ্বয়, নত্থন খাঁ (ভাতৃস্পুত্র) ও বিলায়েত হুসেন খাঁ (দৌহিত্র) উল্লেখযোগ্য।

গোলাম আব্বাসের দুই কন্যার মধ্যে বড়কন্যা আব্বাসী বেগমের বিবাহ হয় সেকেন্দার রঙ্গিলা ঘরানার ওস্তাদ সরদার খাঁ'র সঙ্গে ও ছোট মেয়ে কাদরী বেগমের বিবাহ হয় গোলাম রসুল খাঁ'র পিতা মথুরার 'সরসপিয়া'র (কালে খাঁ) সঙ্গে । খুদাবক্‌স খাঁ'র দ্বিতীয় পুত্র অত্যন্ত গুণী গায়ক মহম্মদ বক্‌স খাঁ জয়পুরের

মহারাজা মাধো সিংহের সভায় নিযুক্ত ছিলেন। তিনি নিঃসন্তান ছিলেন বলে পৌত্র বিলায়েত হুসেন খাঁকে দত্তকপুত্র রূপে গ্রহণ করে তাঁকে সংগীতে তালিম দেন। পরিবারের সদস্য ব্যতিরেকে তিনি বিশ্ববিখ্যাত সানাইবাদক বিস্‌মিল্লাহ্‌ খাঁকে তালিম দেন।

খুদাবক্‌স খাঁ'র তৃতীয় পুত্রের নাম কল্লন খাঁ। এই কল্লন খাঁ'র প্রকৃত নাম ছিল হৈদর খাঁ। অত্যন্ত সুমধুর কণ্ঠস্বরের অধিকারী আগ্রা ঘরানার এই প্রতিভাবান গায়কের সংগীতশিক্ষা হয় প্রধানত অগ্রজ গোলাম আব্বাসের নিকট। গুরুভ্রাতা পণ্ডিত বিশ্বম্ভর সিংহের কাছেও তিনি তালিম নেন। তাঁর শিষ্যের মধ্যে তাসাদ্দুক হুসেন খাঁ (পুত্র), বিলায়েত হুসেন খাঁ, বশীর আহমদ খাঁ, খাদিম হুসেন খাঁ, আনবর হুসেন খাঁ, অসদ আলী খাঁ (জয়পুর, বীণা), ফিরদৌসী বাঈ, বিব্বো বাঈ (জয়পুর), নজীর খাঁ, গফুর খাঁ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। কল্লন খাঁ তাঁর পিতা খুদাবক্‌সের মৃত্যুর পর জয়পুরের দরবারে নিযুক্ত হন। সেইসময় তাঁর অগ্রজ গোলাম আব্বাস খাঁ আগ্রাতেই থেকে যান। কল্লন খাঁ'র পুত্র তাসাদ্দুক হুসেন খাঁ ছিলেন একজন বিখ্যাত গায়ক। বংশীয় গুরুজনদের কাছেই তাঁর সংগীতশিক্ষা হয়। জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি কলকাতায় অতিবাহিত করেন। তিনি কবিরূপে অত্যন্ত সুনাম অর্জন করেন এবং 'বিনোদপিয়া' ছদ্মনামে অসংখ্য কবিতা রচনা করেন। তাঁর শিষ্যবর্গের মধ্যে অসদ আলী খাঁ, দীপালী নাগ চৌধুরী, ললিতমোহন সেন, লতফৎ হুসেন খাঁ, রায়বাহাদুর সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার উল্লেখযোগ্য।

১৮৮১ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি আগ্রা জেলার সেকেন্দ্রাতে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গায়ক ফৈয়াজ হুসেন খাঁ'র জন্ম হয়। জন্মের তিনমাস পূর্বেই পিতা সবদর হুসেন খাঁ'র মৃত্যু হওয়ায় মাতামহ গোলাম আব্বাস খাঁ তাঁর শিক্ষা ও লালন পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। গোলাম আব্বাস খাঁ এবং কিছুটা কল্লন খাঁ'র কাছে তিনি তালিম পান। তাঁর গায়কীতে ধ্রুপদ ধামারের মীড় ও লয়কারীর সঙ্গে বিলম্বিত খেয়ালে গোয়ালিয়র ঘরানার মত লরজদার তানের মিশ্রণ পরিলক্ষিত হয়। বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বরের অধিকারী হওয়ায় তাঁর সংগীত পরিবেশনায় আধুনিক ইলেকট্রিক যুগের মাইক্রোফোনের প্রয়োজন হত না। তিনি মুখবন্ধ করে 'সা' লাগালে মনে হতো যেন মীরাজের জোড়া তানপুরা বাজছে। মাতামহ গোলাম আব্বাস খাঁ তাঁকে বার বছর কোন পাল্টা অলংকার, রাগ বা বন্দিশ শেখাননি। শুধু সা রে গ ম প ধ নি সাঁ সপ্তকের এই স্বরের তীব্র ও কোমল রূপ রেওয়াজ করিয়েছেন। ১৯৩৪ সালে একশো নয় বছর বয়সে গোলাম আব্বাসের মৃত্যুকালে ফৈয়াজ খাঁ'র বয়স ছিল পঞ্চাশের উর্ধ্বে। গোলাম আব্বাস ফৈয়াজ খাঁকে এতটাই ভালবাসতেন যে, ফেয়াজ খাঁ কোন আসরে গান গাওয়ার সময় গোলাম আব্বাস খাঁ ঘরে বসে তস্‌বীহ হাতে আল্লাহর নাম জপতেন। ফৈয়াজ খাঁ ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল, টপ্পা, ঠুমরী, কাজরী, দাদ্‌রা, গজল, কাওয়ালী প্রভৃতি সব প্রকারের গানেই পারদর্শী ছিলেন। সুবিখ্যাত ঠুমরী গায়ক মৌজুদ্দিন খাঁ'র প্রভাবে তিনি ঠুমরী গানে

আকৃষ্ট হন। তিনি 'প্রেম পিয়া' ছদ্মনামে অসংখ্য গান রচনা করেছেন। তাঁর রচিত ঠুমরী 'বাজুবন্দ খুল খুল যায়', জয়জয়ন্তী রাগে রচিত ঠুমরী 'মোরে মন্দিরবা লো নহী আয়ে', যোগ রাগে রচিত 'সাজন মোরে ঘর আয়ে', ললিত রাগে রচিত 'তরপত হুঁ জৈসে জল বিন মীন', বেহাগ রাগে 'ঝনঝন ঝনঝন পায়েলিয়া' ইত্যাদি ঠুমরী অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। সৌখিন ও বিলাসী এই শিল্পী বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রাজ্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি অনেক সম্মান ও খেতাবে ভূষিত হন। ১৯১১ সালে মহীশুরের মহারাজা তাঁকে 'আফতাবে মৌসিকী' (সংগীত সূর্য) খেতাব দেন। ১৯২৫ সালে পণ্ডিত ভাতখণ্ডে আয়োজিত লক্ষ্ণৌ সংগীত সম্মেলনে 'সংগীত চূড়ামনি', এলাহাবাদ সংগীত সম্মেলনে 'সংগীত সরোজ' ও 'সংগীত ভাস্কর' উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৯২১ সালে ইন্দোরের মহারাজা তুকাজী রাও আয়োজিত সংগীত সম্মেলনে সমগ্র ভারতের পাঁচশত শিল্পীর মধ্যে ফৈয়াজ খাঁকে ভারতের শ্রেষ্ঠ গায়করূপে তৎকালীন বাইশ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হয়। ১৯৫০ সালে এই মহান শিল্পী মৃত্যুবরণ করেন। শিষ্যদের তালিম দেওয়া পছন্দ না করলেও ফৈয়াজ খাঁ'র অসংখ্য শিষ্য ছিল যাদের সংগীতশিক্ষার গুরু দায়িত্ব নেন ফৈয়াজ খাঁ'র শ্যালক আতা হুসেন খাঁ। ফৈয়াজ খাঁ নিঃসন্তান হওয়ায় আতা হুসেন খাঁকে তিনি পুত্র স্নেহ করতেন। ফৈয়াজ খাঁ'র শিষ্যবর্গের মধ্যে আতা হুসেন খাঁ, অজমত হুসেন খাঁ, দীপালী নাগ চৌধুরী, দিলীপ চন্দ্র বেদী, ধ্রুবতারা যোশী, বশীর খাঁ (হারমোনিয়াম), কুন্দন লাল সায়গল, লতফৎ হুসেন খাঁ, মোহন সিংহ, শরাফৎ হুসেন খাঁ, রতনজনকর, স্বামী বল্লভ দাস, সুনীল বসু, শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।[৩]

দক্ষিণ ভারতে এই ঘরানার প্রচলন করেন নত্থন খাঁ'র কণিষ্ঠ ভ্রাতা আবদুল্লা খাঁ এবং দক্ষিণ ভারতে এই ঘরানার উত্তরাধিকারী শিল্পী হলেন রমারাও নায়ক। দক্ষিণী হয়েও রমারাও-ফৈয়াজ খাঁ ও আতা হুসেনের নিকট উত্তর ভারতীয় সংগীতের শিক্ষালাভ করেন।

আগ্রা ঘরানার মূল কেন্দ্র আগ্রাতে এই ঘরানার চর্চা বজায় রেখেছিলেন ওয়াকিল আহম্মদ ও সাব্বির আহম্মদ। এই ভাতৃদ্বয় ছিলেন ওস্তাদ বসির খাঁ'র প্রথম ও দ্বিতীয় পুত্র।

ওস্তাদ শরাফৎ হুসেন খাঁ ১৯৩০ সালে ভারতের অত্রৌলী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা লিয়াকত হোসেন খাঁ ছিলেন জয়পুরের রাজসভার সংগীতজ্ঞ। শরাফৎ হুসেন খাঁ ছিলেন ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ'র অন্যতম শিষ্যদের মধ্যে একজন। তিনি ছিলেন বিলায়েত হুসেন খাঁ'র জামাতা। অতিঅল্প বয়সেই তিনি সংগীতে দক্ষতা অর্জন পূর্বক ভারত সরকার কর্তৃক 'পদ্মশ্রী' পুরস্কার ও 'তানসেন' পদক লাভ করেন। ১৯৮৫ সালে আগ্রা ঘরানার এই মহান শিল্পী ইন্তেকাল করেন।

ভারী চালের খেয়াল গায়ন এই ঘরানার একটি অন্যতম সাংগীতিক বৈশিষ্ট্য। সর্বসম্মতিক্রমে আগ্রা পদ্ধতির খেয়াল অনেকাংশে গোয়ালিয়র ঘরানার খেয়ালের অনুরূপ। আগ্রা ঘরানার উৎপত্তি পর্যায়ে গোয়ালিয়র ঘরানার ওস্তাদদের প্রভাব রয়েছে বলেই এই দুই ঘরানার মধ্যে কিছুটা সাদৃশ্য হয়ত বিদ্যমান। এই ঘরানায় রাগরূপের সহজ প্রকাশ, নোমতম সহকারে আলাপ এবং সুললিত স্বরসহযোগে বিস্তৃত স্বরস্থানে তান করা হয়। গানের বন্দিশগুলো সুন্দর হওয়া স্বত্ত্বেও এই ঘরানার প্রবীণ সংগীতজ্ঞরা বন্দিশের বাণীর ইচ্ছাকৃত অস্পষ্ট উচ্চারণ করতেন। অপেক্ষাকৃত বিলম্বিত লয়েই এই ঘরানার বন্দিশ গাওয়া হয়। এভাবেই আগ্রা ঘরানার খেয়ালের ধারা বর্তমান কালেও ভারতের নানা কেন্দ্রে প্রবহমান রয়েছে।

আগ্রা ঘরানার বিখ্যাত সংগীতজ্ঞদের চিত্র:

ওস্তাদ ফৈয়াজ খাঁ[৪]

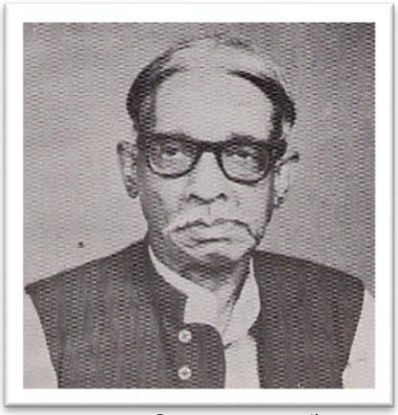

ওস্তাদ খাদিম হোসেন খাঁ[৫]

ওস্তাদ বেলায়েত হোসেন খাঁ[৬]

তথ্য ও চিত্রসূত্র

১) অমল দাশ শর্মা, *প্রাচীন ও নবীন সংগীতজ্ঞ এবং ঘরানার ইতিবৃত্ত*, দরবারী প্রকাশন, কলকাতা: ১৯৯৫

২) দিলীপ কুমার মুখোপাধ্যায়, *ভারতীয় সংগীতে ঘরানার ইতিহাস*, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী প্রা:লি:, কলকাতা: ১৩৮৪

৩) কুমার প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, *কুদরত রঙ্গি বিরঙ্গী*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলিকাতা: ১৪০২

৪) https://www.surgyan.com/faiyazkhan.htm

৫) https://www.parrikar.org/vpl/?page_id=424

৬) http://www.itcsra.org/TributeMaestro.aspx?Tributeid=28

বিষ্ণুপুর ঘরানা

বাংলার অন্যতম একটি প্রাচীন রাজ্য হচ্ছে বিষ্ণুপুর। বাংলাদেশের পশ্চিমাংশে অবস্থিত এই অঞ্চলের সংগীত ধারাকে 'বিষ্ণুপুর ঘরানা' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। অঞ্চলের নামানুসারে এই ঘরানার নামকরণ হয়েছে। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে এই অঞ্চলের সংগীতের সাথে হিন্দুস্থানী শাস্ত্রীয় সংগীতের পরম্পরার যোগসাধনের ফলে ক্রমে বিষ্ণুপুর বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রীয় সংগীত কেন্দ্র ও বহুগুণীর সাধনার লীলানিকেতনে পরিণত হয়। এই সংগীতচর্চা পরবর্তী কালে গুরুশিষ্য পরম্পরায় একটি পদ্ধতির মধ্য দিয়ে বিকাশ লাভ করে এবং বিষ্ণুপুর ঘরানা নামে পরিচিতি লাভ করে। এই ঘরানায় কণ্ঠ ও যন্ত্র উভয় সংগীতেরই প্রচার ও প্রসার হয়। তবে বিষ্ণুপুর ঘরানা বলতে ঐ কেন্দ্রের ধ্রুপদ ঘরানাকেই অধিক বোঝানো হয়ে থাকে কারণ কণ্ঠসংগীতের মধ্যে বিষ্ণুপুরের ধ্রুপদই ছিল সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। এই অঞ্চলেই প্রথম ধ্রুপদ গানের ধারাবাহিক চর্চা শুরু হয়। এর আগে ধ্রুপদ চর্চা হতো-তবে এতটা শৃঙ্খলভাবে নয়। মধ্যযুগের শেষভাগে বিষ্ণুপুর ব্যতীত বাংলার পশ্চিমপ্রান্তে অবস্থিত বারানসী, মথুরা, বৃন্দাবন এবং দিল্লীর সংগীত কেন্দ্রের সাথে এখানকার রাজসভাগুলোর যোগসূত্র স্থাপিত হয় এবং বিভিন্ন সংগীত শিল্পীরা এইসকল রাজসভায় নিযুক্ত হন। ফলে সাংস্কৃতিক আদান প্রদানে বিষ্ণুপুর-বাংলা তথা ভারতীয় সংগীতের অন্যতম পীঠস্থান হিসাবে পরিণত হয়।[১]

বিষ্ণুপুর রাজবংশের উৎপত্তিকাল নিয়ে ঐ অঞ্চলের প্রাচীন রাজারা মনে করেন যে তাঁদের রাজবংশের উৎপত্তির সময় ভারতবর্ষে কোন মুসলমান রাজা ছিলনা এবং দিল্লীর রাজসভায় কেবলমাত্র হিন্দু রাজাদের অবস্থান ছিল। বখ্‌তিয়ার খিলজীর বঙ্গ বিজয়ের পূর্বপর্যন্ত এই রাজবংশ বাংলার পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত অঞ্চলগুলির রাজা হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। বিষ্ণুপুর অঞ্চলের রাজারা 'মল্লরাজ' নামে খ্যাত ছিল। তাঁরা ছিলেন ক্ষত্রিয়। বিষ্ণুপুর রাজবাড়ীতে রক্ষিত পুঁথি থেকে জানা যায় আদিমল্ল ছিলেন এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা, যিনি অষ্টম শতকের প্রথমার্ধে লাউ গ্রামে তেত্রিশ বছর রাজত্ব করেছিলেন। অষ্টম শতক থেকে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত রাজপরিবারে রক্ষিত ওইসকল গ্রন্থপুঞ্জি ব্যতিরেকে রাজবংশের ইতিহাস সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য ও ধারাবাহিক কোন তথ্য পাওয়া যায়না। এই বংশের ৪৮ জন নৃপতি কারো কাছে বশ্যতা স্বীকার ব্যতিরেকে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন। ৪৯তম রাজা হিসাবে বীর হাম্বীরের নাম পাওয়া যায়। বীর হাম্বীর মোঘল সম্রাটদের এক লক্ষ সাত হাজার টাকা বার্ষিক কর প্রদান করতেন । তিনিই প্রথম মল্ল যার সম্পর্কে সেইসময়ের মুসলমান ঐতিহাসিকরা বিস্তৃতভাবে লিখে গিয়েছেন এবং তাঁর সময় থেকেই বিষ্ণুপুর রাজকুলের ইতিহাস নির্ভরযোগ্যতার দাবি রাখে। বীর হাম্বীরের পর রঘুনাথ সিং রাজা হন। রঘুনাথ সিং-

এর সময় থেকেই মল্ল রাজারা সিং পদবীর ব্যবহার শুরু করেন। সিং একটি ক্ষত্রীয় পদবী যা তৎকালীন মোঘল সুবেদারদের দেওয়া হত।

মহারাজা রঘুনাথ সিং ছিলেন সংগীতপ্রেমী। সেইসময়ের মোঘল সম্রাট ঔরঙ্গজেব তাঁর জীবনে স্বধর্মকে স্থান দিয়েছিলেন সবার উপরে। তাই ঔরঙ্গজেব সংগীতকলার প্রতি আকৃষ্ট থাকলেও ধর্মের অনুশাসন অনুযায়ী তাঁর রাজ্যে গীত-বাদ্যকে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করেন। অন্যদিকে রাজা রঘুনাথ সেই নিষিদ্ধ কলাকে তাঁর রাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করাকেই ধর্মরূপে গ্রহণ করেন। সম্রাট ঔরঙ্গজেবের আদেশে ভারতের সংগীতজ্ঞরা অত্যন্ত অবহেলা ও অনাদরে কাল কাটান। সেইসময় কোন রাজদরবারেই তারা আশ্রয়ের অনুমতি পাননি। রাজা রঘুনাথ সিং ঔরঙ্গজেবের আদেশ ও ক্রোধ উপেক্ষা করে বিপুল অর্থব্যয়ে দিল্লী থেকে তানসেন বংশীয় বাহাদুর সেনকে বিষ্ণুপুর নিয়ে আসেন এবং ঢোল সহযোগে রাজ্যের চারিদিকে ঘোষণা দেন যে সুমধুর কণ্ঠের অধিকারী ব্যক্তি বিনাপারিশ্রমিকে বাহাদুর সেনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে পারবে এবং এদের মধ্যে যারা দরিদ্র ছাত্র তাদের ভরণপোষণের ব্যবস্থাও করা হবে। যারদরুণ সেইসময় বিষ্ণুপুরে বাহাদুর সেনের এক বিশাল শিষ্যমণ্ডল তৈরি হয়। সংগীতবিদ্যায় পারদর্শী এইসকল শিষ্যের মধ্যে গদাধর চক্রবর্তী, অনন্তলাল চক্রবর্তী, দ্বারিকানাথ চক্রবর্তী, নিতাই নাজির, বৃন্দাবন নাজির প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি উৎকর্ষ লাভ করেন গদাধর চক্রবর্তী। ফলে বাহাদুর সেনের পর তিনিই বিষ্ণুপুর রাজদরবারের সংগীতাচার্যের আসনে অধিষ্ঠিত হন। গদাধর চক্রবর্তী সংগীতশিক্ষা দান করেন রাম ভট্টাচার্যকে। যিনি শিষ্য ও প্রশিষ্যক্রমে এই ঘরানার প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তী কালে কৃষ্ণ মোহন গোস্বামী, রামশংকর ভট্টাচার্য, যদুভট্ট প্রভৃতি সংগীতজ্ঞের সাধনায় ও শিষ্য পরম্পরায় বিষ্ণুপুর সংগীতকেন্দ্র বাংলা সংগীতের এক অমূল্য সম্পদরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করে।[২]

রঘুনাথ সিং-এর পর বিষ্ণুপুরের সবচেয়ে প্রজাবৎসল রাজা হিসাবে চিহ্নিত বীর সিং সিংহাসনে আরোহণ করেন। এরপর দূর্জন সিং ও দ্বিতীয় রঘুনাথ পর্যায়ক্রমে রাজা হন। এইসকল মল্ল রাজাদের শাসনামলে বিষ্ণুপুর কেন্দ্রের শ্রীবৃদ্ধি হয় এবং এর রাজকীয় বৈভব ইন্দ্রপুরীকেও ছাড়িয়ে যায়।

তবে বিষ্ণুপুর ঘরানায় তানসেন বংশীয় বাহাদুর সেনের (খাঁ) আগমনের বিষয়ে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে। প্রথমত সেনী ঘরানার কোন সংগীতজ্ঞ যদি বিষ্ণুপুর আসতেন তাহলে বিষ্ণুপুর ঘরানার গায়কদের মধ্যে সেনী ঘরানার প্রভাব অবশ্যই থাকত। তাই ধারণা করা হয় বাহাদুর সেন বা তানসেন বংশীয় কোন সংগীতজ্ঞই বিষ্ণুপুর আসেননি। বিষ্ণুপুর ঘরানার যে গায়নশৈলী তাতে ধ্রুপদ গানে প্রযুক্ত গমক, বাঁট, অলংকার ইত্যাদি অত্যন্ত সরলভাবে প্রয়োগ করা হয় এবং স্বর প্রয়োগও অপেক্ষাকৃত দুর্বল। কোন কোন রাগের রূপও সেনী ঘরানা থেকে ভিন্ন। গদাধর চক্রবর্তী নামে বিষ্ণুপুরে কোন গায়ক ছিল বলে যথেষ্ট

মতভেদ আছে। রমেশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের পিতৃদেবের উপদেশ অনুসারে সংকলিত গ্রন্থ *বিষ্ণুপুর* এ প্রায় ৫০ জন প্রখ্যাত ও অখ্যাত সংগীতজ্ঞের (গায়ক-বাদক) সংক্ষিপ্ত পরিচয়ে গদাধর চক্রবর্তীর নাম কোথাও উল্লেখ নেই। তাই ধারণা করা যেতে পারে যে, বিষ্ণুপুর সংগীত কেন্দ্রে গদাধর চক্রবর্তী নামে কোন সংগীতজ্ঞ ছিলেন না। যদি বাহাদুর সেন (খাঁ) দ্বারা বিষ্ণুপুর ঘরানার শিষ্যমণ্ডলী গঠিত হত তবে এই ঘরানার ধ্রুপদ সেনী ঘরানার ধ্রুপদ বলে স্বীকৃত হত। ধারণা করা হয় যে, পণ্ডিতজী নামক মথুরা বৃন্দাবনের সংগীতকেন্দ্রের আচার্য স্থানীয় গায়ক তীর্থ যাত্রার সময় বিষ্ণুপুর রাজদরবারে অবস্থানকালে রাজার সভাপণ্ডিত গদাধর ভট্টাচার্যের পুত্র রামশংকর ভট্টাচার্যকে ধ্রুপদে অনুপ্রাণিত করেন এবং সংগীতশিক্ষা দান করেন। সেইসময় থেকেই রামশংকরের ধ্রুপদ চর্চা শুরু হয় এবং তাঁর সুদীর্ঘ ৯২ বছরের আয়ুষ্কাল পর্যন্ত তা নিরবিচ্ছিন্ন থাকে। তাঁর শিষ্যমণ্ডলী দ্বারাই পরবর্তী কালে বিষ্ণুপুরে ধ্রুপদী সম্প্রদায় গড়ে ওঠে। রামশংকর থেকে বিষ্ণুপুরের ধ্রুপদী ঘরানা অনুসরণ করলে কোন অসঙ্গতি থাকেনা কারণ রামশংকর ও তাঁর শিষ্যমণ্ডলীর প্রত্যেকজন যারা বিষ্ণুপুর নিবাসী ছিলেন তাদের সকলের সন-তারিখ সহকারে সংগীতজীবনের ইতিহাস পাওয়া যায়।[৩]

এই গবেষণায় একাধিকবার আলোচিত হয়েছে ব্যক্তি নামকে কেন্দ্র করে ঘরানার নাম যেমন প্রচলিত আছে তার চেয়ে অধিক প্রচলিত রয়েছে স্থানের নামকে কেন্দ্র করে । সংগীতের প্রসিদ্ধ ঘরানাগুলো স্থানের নামকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। যেমন আগ্রা, গোয়ালিয়র, কিরানা, পাতিয়ালা, রামপুর, জয়পুর, বেতিয়া ইত্যাদি। বিষ্ণুপুর ঘরানাও এরকম স্থানের নামকে কেন্দ্র করেই প্রচলিত ও প্রসারিত হয়েছে। বিষ্ণুপুর ঘরানার ভাণ্ডারে রয়েছে প্রায় সমস্ত রাগের ধ্রুপদাঙ্গের বড়বাণীর চারপদী চৌতালের প্রায় তিনশত গান, দুইশত ধামার, তালের গান (পঞ্চম সওয়ারী, আড়া চৌতাল, সুর ফাঁকতাল, ব্রহ্মতাল, ঝাঁপতাল, রূপক, তেওরা প্রভৃতি) রয়েছে প্রায় শতাধিক, বহুরাগের উপর ধ্রুপদাঙ্গের গান, প্রায় তিনশত বিলম্বিত ও দ্রুত খেয়াল, টপ্পা, ঠুমরী, হোরী, কাজরী, ভজন ইত্যাদি।

রামশংকর ভট্টাচার্য আমৃত্যু বিষ্ণুপুরে অবস্থান করে সংগীতচর্চা করলেও তাঁর শিষ্যরা ক্রমে বাংলার বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েন। বিষ্ণুপুর নিবাসী রামশংকরের শিষ্যদের মধ্যে রামকেশব ভট্টাচার্য (পুত্র), কেশবচন্দ্র চক্রবর্তী, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী, যদুভট্ট, দীনবন্ধু গোস্বামী, অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। যদুভট্ট বাল্যকাল থেকে গুরুর মৃত্যুকালাবধি রামশংকর ভট্টাচার্যের কাছে শিক্ষালাভ করেন। রামশংকর নিজের একনিষ্ঠ সাধনায় সংগীতের যে বিশিষ্ট ধারা ও শিষ্যসম্প্রদায় গড়ে তোলেন তার ফলে প্রবর্তিত হয় বাংলার সংগীতের ঐতিহাসিক বিষ্ণুপুর ঘরানা। তাঁর দীর্ঘজীবনে তিনি বিষ্ণুপুর ঘরানার একটি নির্দিষ্ট রূপরেখা প্রবর্তনে সক্ষম হন। রামশংকরের প্রভাবেই বাংলা ভাষায় ধ্রুপদ রচনার সূত্রপাত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

রামশংকরের শিষ্যদের মাধ্যমে বিষ্ণুপুর ঘরানার ধ্রুপদ কলকাতাসহ অন্যান্য স্থানে বিস্তার লাভ করে। তাঁর পুত্র রামকেশব কুচবিহারে নৃপেন্দ্র নারায়ণের রাজদরবার ও কলকাতায় আশুতোষ দেবের সংগীতসভায় গায়ক হিসেবে নিযুক্ত থেকে বিষ্ণুপুর ঘরানার ধ্রুপদ রীতির গানের প্রচার করেন। এছাড়াও দীনবন্ধু গোস্বামীর পুত্র গঙ্গানারায়ণ গোস্বামী, রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপেশ্বর প্রমুখ যথাক্রমে ময়মনসিংহ মহারাজার রাজদরবারে, নাড়াজোল দরবারে এবং কলকাতা ও বর্ধমান দরবারে নিযুক্ত থেকে বিষ্ণুপুর রীতির ধ্রুপদের প্রচার ও প্রসার ঘটান। এইসকল সংগীতগুণী ও তাঁদের শিষ্য পরম্পরার মাধ্যমে বিষ্ণুপুর ঘরানার বিস্তার ঘটে।

বিষ্ণুপুরের ধ্রুপদ গায়কী সবল ও আতিশয্য বর্জিত। রাগরূপায়ণে এই ঘরানায় কিছু পার্থক্য দেখা যায়। যেমন- বেহাগ ও বসন্ত রাগে কোমল নিষাদের সামান্য ব্যবহার, ভৈরবের আরোহণে কোমল নিষাদের স্পর্শ, রামকলী ও পুরবী রাগে কড়ি মধ্যম বর্জন, পূরবী রাগে শুদ্ধ ধৈবতের ব্যবহার এই ঘরানার বৈশিষ্ট্য। এই ঘরানায় গমক, বাঁট ও অলংকারের স্বল্প ব্যবহার করা হয়। তালের ছন্দ বিভাজনেও বিষ্ণুপর ঘরানার একটি নিজস্ব অবদান রয়েছে।

একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, বাঙালি ধ্রুপদ সম্প্রদায় গঠনপূর্বক বাংলাদেশে প্রথম ধ্রুপদ চর্চার প্রচলন, প্রচার ও প্রসারের মাধ্যমে বিষ্ণুপুর ঘরানার প্রবর্তন করে বাংলার সাংগীতিক ইতিহাসে রামশংকর ভট্টাচার্য একটি ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে গেছেন।

বিষ্ণুপুর ঘরানার বিখ্যাত সংগীতজ্ঞদের চিত্র:

পণ্ডিত যদুভট্ট [৪]

পণ্ডিত গিরীজাশংকর চক্রবর্তি [৫]

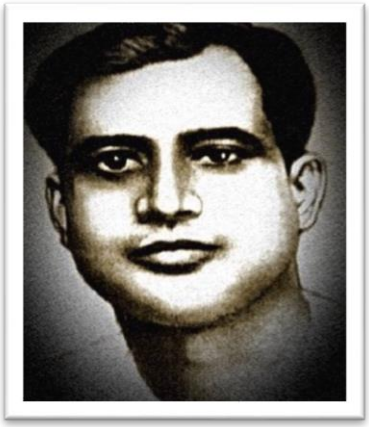

পণ্ডিত জ্ঞানেন্দ্র প্রসাদ [৬]

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য ও চিত্রসূত্র

১) করুণাময় গোস্বামী, *সংগীতকোষ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা: ১৯৮৫

২) মীনাক্ষী বিশ্বাস, *পরম্পরা*, সপ্তর্ষি প্রকাশন, কলিকাতা: ২০১৩

৩) মীনাক্ষী বিশ্বাস, *পরম্পরা*, সপ্তর্ষি প্রকাশন, কলিকাতা: ২০১৩

৪) http://www.midnapore.in/tourism/panchet-garh/Jadu-Bhatta-Jadunath-Bhattacharya-Panchetgarh.html

৫) https://www.anandabazar.com/supplementary/patrika/some-unknown-stor ies-of-musical-artist-girija-shankar-chakraborty-1.764600

৬) https://www.youtube.com/watch?v=dxGxUG_fg8o

অত্রৌলী ঘরানা

উত্তরপ্রদেশের আলীগড়ের নিকটবর্তী অত্রৌলী নগর অবস্থিত। এই নগরটি উচ্চাঙ্গ সংগীতের একটি বিখ্যাত সংগীতকেন্দ্ররূপে পরিচিত। এখানকার অধিকাংশ অধিবাসী শান্ডিল্যগোত্রীয় ব্রাহ্মণ। এরা সকলেই ছিলেন সংগীতপ্রেমী। ধারণা করা হয় যে বাদশা জাহাঙ্গীরের (১৬০৫-১৬২৭) রাজত্বককালে এইসকল শান্ডিল্য ব্রাহ্মণদের ধর্মান্তরিত করা হয়। এইকেন্দ্রে খেয়াল গানের ঘরানা বিকাশ লাভ করে। তবে অত্রৌলী ঘরানা প্রচলিত ঘরানাগুলোর মত স্বীকৃত কিনা সে বিষয়ে নানা মতভেদ রয়েছে। অনেকে মনে করেন অত্রৌলী একটি সংগীতকেন্দ্র যেখানে বিভিন্ন ধারার সংগীত সম্প্রদায়ের অবস্থান ছিল। ঘরানার বিশিষ্ট নিয়ম সেখানে ছিল না। কেউ কেউ আবার একে আগ্রা ঘরানার একটি শাখা বলে মনে করেন। এই কেন্দ্রের অনেক সংগীতজ্ঞেরা বিভিন্ন স্থানে গিয়ে ঘরানার প্রববর্তন করলেও অত্রৌলী ঘরানার কোন স্বতন্ত্রশৈলীর সন্ধান পাওয়া যায় না।[১]

অত্রৌলীতে ভূপত খাঁ নামক খাণ্ডারবাণীর একজন ধ্রুপদীর জন্ম হয়। তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় গায়ক ছিলেন। গোয়ালিয়র ও যোধপুরের দরবারী সংগীতজ্ঞ থাকা অবস্থায় যোধপুরেই তাঁর মৃত্যু হয়।

ভূপত খাঁ'র পুত্র গুলাব খাঁ ১৮৫০ সালে যোধপুরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নিকট সংগীতে তালিমপ্রাপ্ত হয়ে তিনি পিতার সাথেই যোধপুরের দরবারী গায়ক হিসাবে নিযুক্ত থাকেন এবং বিখ্যাত সংগীতজ্ঞরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। ১৯৩৪ সালে প্রায় ৮০ বছর বয়সে যোধপুরেই গুলাব খাঁ মৃত্যুবরণ করেন। গুলাব খাঁ'র পুত্র মুহাম্মদ খাঁ অত্রৌলী ঘরানায় অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করেন। খাণ্ডারবাণীর অপরএক প্রসিদ্ধ ধ্রুপদী ইমাম বক্স খাঁ'রও জন্ম হয় অত্রৌলীতে। বিখ্যাত গায়ক ওস্তাদ রমজানখাঁ রঙ্গীলে তাঁর শিষ্য ছিলেন। ইমামবক্স খাঁ'র আরেক শিষ্য খয়রাতি খাঁ অত্রৌলীতে জন্মগ্রহণ করেন। আগ্রার বিলায়েত হুসেন খাঁ'র শ্বশুর খয়রাতি খাঁ উনিয়ারের দরবারী গায়ক হিসাবে নিযুক্ত হন এবং সংগীতে অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করেন। অত্রৌলীর দুল্লু খাঁ ও ছজ্জু খাঁ'র কাছেও তিনি কিছুদিন তালিম পান বলে জানা যায়। ওস্তাদ খয়রাতি খাঁ'র জ্যেষ্ঠ পুত্র ওস্তাদ করিমবক্স খাঁ'র জন্ম হয় উনিয়ারেতে এবং দ্বিতীয় পুত্র ওস্তাদ আজমত হুসেন খাঁ'র জন্ম হয় ১৯১১ সালে অত্রৌলীতে। করিমবক্স পিতার নিকট শিক্ষালাভ করে উৎকৃষ্ট ধ্রুপদ ও খেয়াল গায়করূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। অপরপুত্র ওস্তাদ আজমত হুসেন খাঁ তাঁর মামা আলতাফ হুসেন খাঁ'র নিকট ধ্রুপদ, ধামার, খেয়ার, সাদ্‌রা প্রভৃতিতে তালিম প্রাপ্ত হয়ে অত্যন্ত দক্ষতা অর্জন করেন। একসময় তিনি বরোদার দরবারী সংগীতজ্ঞ নিযুক্ত হন এবং পরবর্তী কালে মুম্বাই বসবাস করে অনেক যোগ্যশিষ্য তৈরি করেন। তিনি হিন্দি ও উর্দু ভাষায় দিলরঙ্গ ও মক্কীস ছদ্মনামে অনেক কবিতা রচনা করেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে ইউনুস হুসেন খাঁ, ললিনী বোরদেকর, মানিক ভার্মা, দুর্গা বাঈ শিরোতকর প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

Dhaka University Institutional Repository

বিখ্যাত ধ্রুপদ গায়ক জহুর খাঁ'র জন্ম হয় অত্রৌলীতে। তাঁর পূর্ব পুরুষেরা শান্ডিল্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। যারা পরবর্তী কালে ধর্মান্তরিত হন। জহুর খাঁ যোধপুরের দরবারী গায়ক হিসেবে নিযুক্ত হন। তাঁর দ্বিতীয় পুত্র মেহবুব খাঁ অত্রৌলীতে জন্মগ্রহণ করেন। যিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রসিদ্ধ গায়ক ও বিখ্যাত সংগীত রচয়িতা। 'দরশপিয়া' ছদ্মনামে তিনি বহুগান রচনা করেছেন। তিনি পিতা জহুর খাঁ ও দিল্লীর তানরস খাঁ'র কাছে সংগীতশিক্ষা লাভ করেন।[২]

১৮৯৮ সালে মেহবুব খাঁ'র জ্যেষ্ঠ পুত্র ওস্তাদ আতা হুসেন খাঁ'র জন্ম হয়। সুফী ব্যক্তিত্বের এই গুণী গায়ক শিক্ষক হিসাবে অতুলনীয় ছিলেন। তাঁর গুরু ফৈয়াজ হুসেন খাঁ নিঃসন্তান থাকায় পুত্রতুল্য আতা হুসেন খাঁ ১৯১৯ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত বরোদাতে গুরুর সঙ্গেই ছিলেন এবং প্রকৃতপক্ষে খাঁ সাহেবের বেশীরভাগ শিষ্যদের তিনিই শিক্ষা দিতেন। তাঁর নিজস্ব শিষ্যের মধ্যে স্বামী বল্লভদাস, কল্পনা মূখার্জী, দেবপ্রসাদ গর্গ, পূর্ণিমা সেন, রমারাও নায়ক প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। ১৯৮০ সালে এই মহান শিল্পী মৃত্যুবরণ করেন।

আতা হুসেন খাঁ'র শিষ্যদের মধ্যে স্বামী বল্লভদাস ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ গায়ক। তিনি আহমেদাবাদের স্বামী নারায়ণ মন্দিরের সাধু ছিলেন। আতা হুসেন ও ফৈয়াজ হুসেন খাঁ'র এই শিষ্য সংগীতশিক্ষার জন্য নিয়মিত আহমেদাবাদ থেকে বরোদায় আসতেন। জীবনের সঞ্চিত সকল অর্থ ব্যয়ে তিনি মুম্বাই শহরে 'শ্রী সংগীত বল্লভাশ্রম' স্থাপন করেন যা বর্তমানে 'বল্লভ দাস কলেজ অব মিউজিক' নামে পরিচিত।

অত্রৌলী সংগীতকেন্দ্রের আরেক সংগীতজ্ঞ ওস্তাদ শরাফৎ হুসেন খাঁ ১৯২০ সালে অত্রৌলীতে জন্মগ্রহণ করেন। অসাধারণ সংগীত প্রতিভার অধিকারী এই শিল্পী তাঁর পিতা লিয়াকত আলী এবং বংশীয় গুরুজনদের কাছে সংগীতশিক্ষা শুরু করলেও পরবর্তী কালে বিলায়েত হুসেন খাঁ'র (শ্বশুর, আগ্রা) কাছে তালিম নেন।

উপর্যুক্ত আলোচনা ব্যতিরেকে অত্রৌলী ঘরানার আরো একটি বংশের উল্লেখ পাওয়া যায় যার একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হল:

এই ঘরানার আলোচনার সূচনায় দেখা যায়- সেইসময়ের শান্ডিল্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণেরা বাদশা জাহাঙ্গীরের আমলে ধর্মান্তরিত হয়ে বিভিন্ন স্থানে চলে যায়। এঁরা ডাগর বাণীর উৎকৃষ্ট গায়ক ছিলেন এবং মোঘল রাজদরবারে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু ঔরঙ্গজেবের শাসনামলে যখন অধিকাংশ সংগীতজ্ঞকে রাজদরবার ত্যাগ করতে বাধ্য করা হয় তখন তাঁরা জীবিকার সন্ধানে নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। এঁদের কিছু এসে অত্রৌলীতে বসবাস শুরু করে আবার কিছু চলে যায় রাজস্থানে। কারণ সেইসময় রাজস্থানে অনেক ছোট

Dhaka University Institutional Repository

ছোট রাজ্য ছিল এবং সেইসকল রাজারা অত্যন্ত সংগীতপ্রেমী ছিলেন। এঁদের মধ্যে একজন ছিলেন বৃন্দাবনের স্বামী হরিদাসের বংশধর বিশ্বম্ভর দাস ডাগর। তাঁর বংশীয় সাহেব খাঁ ডাগর বাণীর বিখ্যাত গায়ক ছিলেন। সাহেব খাঁ'র দ্বিতীয় পুত্র মানতোল খাঁ'র প্রকৃত নাম জানা যায় না। সম্ভবত রায়পুরের নবাব তাঁকে এই উপাধি প্রদান করেছিলেন। তিনি একজন প্রসিদ্ধ গায়ক ছিলেন। মানতোল খাঁ'র পুত্র করিম বক্স খাঁ যোধপুরের রাজদরবারে নিযুক্ত হয়ে সংগীতে অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এছাড়া সাহেব খাঁ'র পৌত্র দৌলত খাঁ- ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল প্রভৃতিতে অত্যন্ত পারদর্শীতা অর্জন করেন।

এই ঘরানার কাদের খাঁ'র পুত্র খাজা আহমেদ খাঁ ডাগর বাণীর বিখাত গায়ক ছিলেন। তিনি নিজে যেমন বংশীয় গুরুজনদের কাছে তালিম পেয়েছেন তেমনি শুধু বংশধরদেরই শিক্ষাদান করেছেন। তাঁর তিনপুত্র বশীর খাঁ, আল্লাদিয়া খাঁ ও হৈদর খাঁ বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ হিসাবে সমগ্র ভারতে খ্যাতি অর্জন করেন। এঁদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ পুত্র বশির খাঁ সমগ্র ভারতবর্ষে বিখ্যাত হারমোনিয়াম বাদক হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। বশির খাঁ তাঁর বংশীয় ব্যতীত কিরানা ঘরানার ভাইয়া গনপত রাওয়ের নিকট সংগীতশিক্ষা লাভ করেন। গুরুর সেবার উদ্দেশ্যে তিনি অধিকসময় গুরুর সাথে ব্যয় করেন এবং গুরুর মৃত্যুর পর ইন্দোরের সভায় নিযুক্ত হন। ১৯৩৮ সালে তিনি পরলোকগমন করেন। খাঁজা আহমেদ খাঁ'র দ্বিতীয় পুত্র ভারতের শ্রেষ্ঠ গায়ক আল্লাদিয়া খাঁ ১৯৫৫ সালে যোধপুরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি পিতামহ দৌলত খাঁ ও খুল্লতাত (চাচা) জাহাঙ্গীর খাঁ'র কাছে সংগীতের শিক্ষাগ্রহণ করেন। তাঁর গায়নশৈলী এতটাই স্বকীয়তাপূর্ণ হয় যে তিনি স্বয়ং একটি ঘরানা প্রতিভূরূপে স্বীকৃত হন। তাঁর সেই গায়নশৈলী 'আল্লাদিয়া ঘরানা' নামে খ্যাত হয়। কিন্তু গায়নশৈলীর ঘরানায় তাঁর নামের ব্যবহার তিনি অপছন্দ করেন যার ফলে পরবর্তী কালে তাঁর গায়নশৈলী 'জয়পুর ঘরানা' নামে পরিচিতি লাভ করে যার বিস্তারিত আলোচনা আমরা জয়পুর ঘরানার মধ্যে করেছি।[৩]

খাঁজা আহমেদ খাঁ'র তৃতীয় পুত্র হৈদর খাঁ- আল্লাদিয়া খাঁ'র মত খ্যাতি না পেলেও সংগীতে অত্যন্ত দক্ষতা অর্জন করেন এবং আল্লাদিয়া খাঁ'র সাথে সর্বত্র দরবারী গায়করূপে নিযুক্ত থাকেন। বংশধর ব্যতিরেকে আল্লাদিয়া খাঁ'র প্রায় সকল শিষ্যকেই তিনি তালিম দেন। ১৯৩৫ সালে উনিয়ারেতে তাঁর মৃত্যু হয়।

আল্লাদিয়া খাঁ'র বংশধরেরা সকলেই ছিলেন অত্রৌলী নিবাসী। তাঁর তিনপুত্রই অসাধারণ সংগীত প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র নাসিরউদ্দিন খাঁ তাঁর পিতা ও চাচা হৈদর খাঁ'র কাছে সংগীতশিক্ষা লাভ করেন। অপরিণত বয়সে মৃত্যু হওয়ায় স্বাধীন শিল্পী হিসাবে আত্মপ্রকাশের বিশেষ সুযোগ না পেলেও নাসিরুদ্দীন খাঁ একজন দক্ষ সংগীতজ্ঞ ছিলেন। আল্লাদিয়া খাঁ'র দ্বিতীয় পুত্র ওস্তাদ বদরুদ্দীন খাঁ ছিলেন তাঁর ভ্রাতাদের মধ্যে অধিক প্রতিভাবান। ধ্রুপদ, ধামার, ঠুমরী, খেয়ালসহ সংগীতের সকল ধারাতেই ছিলেন তিনি অতুলনীয়। মাত্র ৪৯ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। আল্লাদিয়া খাঁ'র তৃতীয় পুত্র ওস্তাদ সমসুদ্দীন

Dhaka University Institutional Repository

খাঁ অত্যন্ত প্রসিদ্ধ গায়ক ও শিক্ষক ছিলেন। পিতার অধিকাংশ শিষ্যকে তিনি তালিম দেন। তাঁর শিষ্যের মধ্যে গজাননরাও যোশী, মল্লিকার্জুন মনসুর, মনসুর মহম্মদ, অনন্তমোহন যোশী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও এই ঘরানার বিখ্যাত শিল্পীর মধ্যে কিশোরী আমানকর, বামনরাও দেশপাণ্ডে, কেশরবাঈ কেরকর, মোঘুবাই কুর্দিকর প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

অত্রৌলী ঘরানার গায়কীর প্রধান সাংগীতিক বৈশিষ্ট্য হলো এই ঘরানার গানে বীর রসের প্রাধান্য বেশি থাকে। এছাড়া রাগের বাঢ়ৎ দেখানো হয় লয়বদ্ধ বোল বিস্তারের মাধ্যমে। অতি তার সপ্তকে সহজ বিচরণ এই ঘরানার গায়কীর আরেকটি অন্যতম প্রধান দিক। বিভিন্ন ছন্দের লয়কারী, তান, গাম্ভীর্যপূর্ণ বিস্তার ও আকারযুক্ত দ্রুত তান এই ঘরানার শৈলীতে বিদ্যমান।

অত্রৌলী ঘরানার বিখ্যাত সংগীতজ্ঞদের চিত্র:

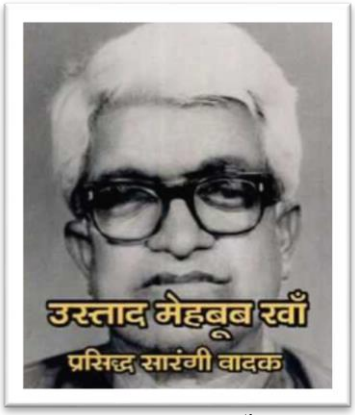

ওস্তাদ মেহবুব খাঁ[৪]

মঘুবাই কুর্দিকর[৫]

কিশোরী আমনকর[৬]

তথ্য ও চিত্রসূত্র

১) দিলীপ কুমার মুখোপাধ্যায়, *ভারতীয় সংগীতে ঘরানার ইতিহাস*, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী প্রা:লি:, কলকাতা: ১৩৮৪

২) অমল দাশ শর্মা, *প্রাচীন ও নবীন সংগীতজ্ঞ এবং ঘরানার ইতিবৃত্ত*, দরবারী প্রকাশন, কলকাতা: ১৯৯৫

৩) করুণাময় গোস্বামী, *সংগীতকোষ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা: ১৯৮৫

৪) https://www.youtube.com/watch?v=-Vw9NYlmwS0

৫) https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/57/Mogubai_Kurd ika r.png

Dhaka University Institutional Repository

৬) https://www.bloncampus.com/hangout-at-bloc/music/hindustani-music
-le gend-kishori-amonkar-paases-away/article9615768.ece

জয়পুর ঘরানা

রাজস্থানের রাজধানী জয়পুর প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার বর্গমাইল আয়তনের একটি বৃহৎ জেলা শহর। এ রাজ্যের অধিকাংশই বালুকাময় সমতল ভূমি। এখানে যেমন দর্শনযোগ্য অজস্র দূর্গ, প্রাসাদ, মন্দির রয়েছে তেমনি শিক্ষা ও সংকৃতির কেন্দ্র হিসেবেও জয়পুর বিখ্যাত। জয়পুর ঘরানার সংগীতজ্ঞরা সমগ্র ভারতবর্ষে প্রসিদ্ধ। এই ঘরানার সংগীতজ্ঞরা কেউই মূলত এই রাজ্যের অধিবাসী নন, সবাই বহিরাগত।

মনরঙ্গ বংশের মহম্মদ আলী খাঁ (হররঙ্গ) থেকে জয়পুর খেয়াল ঘরানা বিস্তার লাভ করলেও কথিত আছে যে মনরঙ্গই নাকি জয়পুর ঘরানার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। মনরঙ্গের প্রকৃত নাম জানা যায় না। সম্ভবত এটি তাঁর ছদ্ম নাম। তিনি সদারঙ্গের শিষ্য ছিলেন। 'দাদ্‌রা' নামক গীতরীতি তিনিই সৃষ্টি করেন। হররঙ্গ বংশীয় আশীক আলী ও আহম্মদ আলীর মাধ্যমেই এই ঘরানার খ্যাতি সর্বোচ্চ মর্যাদা লাভ করে। জানা যায় পণ্ডিত বিষ্ণু নারায়ণ ভাতখণ্ডে-আশীক আলী ও আহম্মদ আলী উভয়ের কাছেই সংগীতশিক্ষা গ্রহণ করেন। এদেঁর শিষ্য-প্রশিষ্য ক্রমেই বর্তমান জয়পুর ঘরানা প্রসারিত। কোন কোন গ্রন্থে বিখ্যাত আল্লাদিয়া খাঁকে জয়পুর খেয়াল ঘরানার প্রবক্তা বলা হয়েছে, আবার কোথাও তাঁকে অত্রৌলী ঘরানার প্রবক্তারূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

বিখ্যাত গায়ক এবং সংগীতজ্ঞ মহম্মদ আলী খাঁ (১৮২৫-১৯০৫, সম্ভবতঃ মনরঙ্গের পৌত্র) জয়পুর রাজদরবারে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর ছদ্মনাম ছিল হররঙ্গ এবং এ নামেই তিনি অসংখ্য গান রচনা করেন। পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁকে 'চলন্ত সংগীতকোষ' নামে অভিহিত করা হত। বংশীয় ব্যতিরেকে তিনি দুর্গাবাঈ, হরিবল্লভ আচার্য এবং পণ্ডিত ভাতখণ্ডেকে শিক্ষাদান করেন। জানা যায় যে, পণ্ডিত ভাতখণ্ডে- হররঙ্গের কাছে প্রায় শতাধিক ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল প্রভৃতি শিক্ষা গ্রহণের পর *ক্রমিক পুস্তক মালিকা* (৬খণ্ড) নামক গ্রন্থে স্বরলিপিসহ প্রকাশ করেন। ওস্তাদ আশীক আলী খাঁ (মৃ: ১৯১৫) ছিলেন মহম্মদ আলী খাঁ'র জ্যেষ্ঠ পুত্র। অত্যন্ত গুণী এই শিল্পী জয়পুরের মহারাজা মাধো সিংহের দরবারে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর পিতার মত তিনিও সকলের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। তাঁর অনুজ আহম্মদ আলী খাঁ বিখ্যাত গায়ক ছিলেন। পণ্ডিত ভাতখণ্ডে এই দুই ভায়েরই শিষ্য ছিলেন এবং এঁদের উভয়ের কাছ থেকেই প্রচুর ধ্রুপদ, ধামার, খেয়াল সংগ্রহ করে তাঁর গ্রন্থে প্রকাশ করছেন।[১]

এই ঘরানার ওস্তাদ আমীর বক্‌স খাঁ গুণীশিল্পী হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন । তিনি জয়পুরের দরবারী সংগীতজ্ঞ সদরুদ্দীন খাঁ'র কাছে শিক্ষা গ্রহণ করে অত্যন্ত গুণী সেতারবাদক এবং অতুলনীয় গায়ক হিসেবে খ্যাত হন। শোনা যায় যে, জয়পুরের মহারাজা সওয়াই রাম সিংহের (১৮৩৫-১৮৮০) দরবারের নিযুক্তকালীন সময়ে তিনি নাকি কয়েক বছর না ঘুমিয়ে দিনরাত জেগে সংগীতের অনুশীলন করেন।

Dhaka University Institutional Repository

বংশধর ব্যতীত তাঁর শিষ্যের মধ্যে গায়করূপে কেরামত খাঁ এবং সেতারবাদকরূপে নজীর খাঁ প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

আনুমানিক ১৮৫৯ সালে জয়পুরের ওস্তাদ আমীর বক্স খাঁ'র জ্যেষ্ঠ পুত্র জামালুদ্দীন খাঁ'র জন্ম হয়। তিনি বীণা ও সেতারবাদকরূপে সমগ্র ভারতে খ্যাতিলাভ করেন। বরোদার মহারাজা সইয়াজীরাও গাইকোয়াড়ের সভা সংগীতজ্ঞ এবং গুরু থাকাকালীন মহারাজা তাঁকে 'বীণা বিনোদ' উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন। ১৯১৪ সালে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর অনুজ সমশুদ্দীন খাঁ অত্যন্ত গুণী সেতারবাদক ছিলেন। জামালুদ্দীন খাঁ'র পুত্র ওস্তাদ আবিদ হুসেন খাঁকেও তিনি সংগীতশিক্ষা প্রদান করেন যিনি পরবর্তীতে বিখ্যাত বীণাবাদক ও ধ্রুপদ গায়করূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

অসাধারণ সংগীত প্রতিভার অধিকারী এবং ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রুদ্র বীণাবাদক ওস্তাদ রজব আলী খাঁ উনিশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে উত্তরপ্রদেশের আলীগড় নগরে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি জয়পুরের মহারাজা সওয়াই রামসিংহের (১৮৩৫-১৮৮০) দরবারী সংগীতজ্ঞ ছিলেন। সওয়াই রামসিংহ তাঁর কাছেই সংগীতশিক্ষা গ্রহণ করেন। ওস্তাদ রজব আলী খাঁ একদিকে যেমন উৎকৃষ্ট বীণা, সেতার ও দিলরুবা বাদক এবং অতিগুণী খণ্ডারবাণীর ধ্রুপদী ছিলেন অন্যদিকে তেমনি ছিলেন উত্তম সংগীত রচয়িতা। তাঁর দত্তক পুত্র মুসর্‌রফ আলী খাঁ ব্যতিরেকে তিনি সেতার-বাজ-স্রষ্টা ইমদাদ খাঁকে তালিম দিয়েছিলেন। মুসর্‌রফ আলী খাঁ (মৃত: ১৯০৯) আলোয়ারের সভা সংগীতজ্ঞ ছিলেন। অত্যন্ত প্রতিভাবান এই বীণাবাদক তাঁর পাঁচ পুত্রকে সংগীতের উত্তম শিক্ষা দান করেন, যাঁরা সকলেই সংগীতজগতে প্রসিদ্ধি লাভ করছেন। মুসর্‌রফ আলী খাঁ'র তৃতীয় পুত্র সাদিক আলী খাঁ ১৮৯৩ সালে জয়পুরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রজব আলীর কাছেই শিক্ষালাভ করে প্রসিদ্ধ বীণাবাদকরূপে প্রতিষ্ঠা পান। ওস্তাদ সাদিক আলী খাঁ'র পুত্র অসদ আলী খাঁ ছিলেন জয়পুর ঘরানার আরেকজন প্রসিদ্ধ বীণাবাদক। তিনি ১৯৩৫ সালের ২৫ ডিসেম্বর রাজস্থানের আলোয়ার স্টেটে জন্ম গ্রহণ করেন। শৈশবে পিতার কাছে দীর্ঘ সময়ব্যাপী ধৈর্য ও একাগ্রতার সাথে সংগীতশিক্ষার পর তিনি অতিগুণী বীণা বাদকরূপে দেশজোড়া খ্যাতি অর্জন করেন।[২]

সেতার যন্ত্রসংগীতে জয়পুর ঘরানার নাম সুপ্রসিদ্ধ। ভারতবর্ষে জয়পুরের চেয়ে প্রাচীনতর কোন সেতার ঘরানা আছে বলে জানা যায় না। তার পূর্বেও সেতার বাদন ছিল, তবে গুরু-শিষ্য পরম্পরায় গঠিত সেতারী পরিবার জয়পুরেরই প্রথম দেখা যায়। জানা যায় যে, তানসেনের বংশধর মসিদ খাঁ জয়পুরে অবস্থান করে সেতার শিক্ষাদানের মাধ্যমে এক বিরাট শিষ্যমণ্ডলী গড়ে তোলেন এবং ধীরে ধীরে জয়পুরে সেতারী পরিবারের প্রবর্তন হয়। সেতার ও সরোদে বিলম্বিত লয়ের গৎবাদনের পদ্ধতি তিনিই প্রচলন করেন। সেইজন্যে বিলম্বিত গৎ এর অপরনাম মসিদখানি। জয়পুর সেতার ঘরানায় আরেক দিকপাল শিল্পী ছিলেন অমৃতসেন। এই পরম্পরায় তিনি সর্বাধিক খ্যাতিমান সেতারীরূপে স্বীকৃত। তবে অমৃত সেনের পূর্বেও জয়পুর ঘরানায় কিংবা জয়পুরের দরবারে সেতারবাদক ছিলেন। তাঁর পূর্বে জয়পুর ঘরানার এবং

Dhaka University Institutional Repository

জয়পুর নিবাসী সেতার গুণী ছিলেন রহিম সেন, করীম সেন, বাহাদুর সেন বা খাঁ প্রমুখ। অমৃতসেনের পূর্বসূরী জয়পুর ধারার সেতারীদের সময়কাল ও পারস্পরিক সম্পর্কের ইতিহাস অস্পষ্ট। মূলত মসিদ খাঁ'র নিকট শিক্ষালাভের ফলেই জয়পুর নিবাসী সেতারী বংশের উদ্ভব। জয়পুরে মসিদ খাঁ'র পরে হামির সেন নামক জনৈক সেনীয়া সেতারীর নাম পাওয়া গেলেও তিনি মসিদ খাঁ'র ধারার অন্তর্গত কিনা সেকথা জানা যায় না। তবে এঁরা সকলেই তানসেনের পুত্র বংশধর ছিলেন যারা ক্রমে জয়পুর সেতার ধারায় অন্তর্ভুক্ত হন। জয়পুর ঘরানার আরেক কৃতি সেতারী ছিলেন সুখসেনের পুত্র রহিম সেন। তবে সুখসেন সেতারী বা রহিম সেনের গুরু ছিলেন কিনা সে বিষয়ে জানা যায় না।

জয়পুর ঘরানার বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ ও জয়পুর খেয়াল ঘরানার দিক্‌পাল আল্লাদিয়া খাঁ'র নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আল্লাদিয়া খাঁ'র জন্ম অত্রৌলী বংশে। তাঁর পিতা খাজা আহমদ খাঁ যোধপুর দরবারের নামকরা ধ্রুপদী ছিলেন এবং মনরঙ্গ ঘরের খেয়াল গাইতেন। খাঁজা আহমদ খাঁ'র মৃত্যুর সময় আল্লাদিয়া খাঁ অনেক ছোট থাকায় তিনি তালিম পান চাচা জাহাঙ্গীর খাঁ'র কাছে। জাহাঙ্গীর খাঁ ধ্রুপদী ছিলেন এবং সচরাচর খেয়াল গাইতেন না। পরবর্তী কালে তাঁরা সপরিবারে জয়পুরে এসে নবাব কল্লন খাঁ'র আশ্রয় লাভ করেন। সেইসময় বড়ে মুবারক আলির গান আল্লাদিয়া খাঁকে মুগ্ধ করে যার প্রভাব পরবর্তী কালে আল্লাদিয়া খাঁ'র খেয়াল গায়কীতে লক্ষ্য করা যায়। আল্লাদিয়া খাঁ'র ঘরানা তাঁর নিজ নামে (আল্লাদিয়া খাঁ) প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হলেও যেহেতু ঘরানার নিয়মানুসারে ঘরানার নামকরণের ক্ষেত্রে অধিকাংশই মানুষের নামের পরিবর্তে স্থানের নাম ব্যবহার করা হয়, তাই পরবর্তি সময়ে এই ঘরানার নাম অঞ্চলের নাম অনুসারে 'জয়পুর ঘরানা' নামে প্রতিষ্ঠিত হয়। আল্লাদিয়া খাঁ জয়পুর, টংক, ইউনিয়ারা, যোধপুর প্রভৃতি স্থানে জীবনের বেশীরভাগ সময় অতিবাহিত করেন। তিনি ধ্রুপদ, ধামার, হোরী, তারানা এবং সাদরা গায়ক হিসেবে অত্যন্ত খ্যাতি অর্জন করেন। জানা যায় ঔরঙ্গজেবের সময় অথবা তাঁর পুত্র শাহ আলমগীরের আমলে আল্লাদিয়া খাঁ'র পরিবারকে জোর পূর্বক ইসলাম ধর্মে প্রবর্তন করা হয়। বর্তমানে আল্লাদিয়া খাঁ'র পরিবারের অধিকাংশই অত্রৌলী ঘরানার অর্ন্তভূক্ত। এঁরা সবাই আলীগড়ে থাকেন। তবে কবে এই পরিবার অত্রৌলী থেকে রাজস্থানে গেছেন তার সঠিক তথ্য পাওয়া যায় না। আল্লাদিয়া খাঁ ভাস্কর বুয়াকেও সংগীতশিক্ষা দান করেন। জানা যায় তিনি ছিলেন ভাস্কর বুয়ার চতুর্থ গুরু। ভাস্কর বুয়ার মুম্বাইয়ের বাড়ীতে অবস্থান করে তাঁকে তিনি সংগীতশিক্ষা দিতেন। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আল্লাদিয়া খাঁ'র সাথে ভাস্কর বুয়াও সংগীত পরিবেশন করতেন। মাত্র ৫৩ বছর বয়সে এই শিষ্যের মৃত্যুতে তিনি অত্যন্ত মর্মাহত হন। ভাস্কর বুয়ার শিষ্যদের মধ্যে দিলীপকুমার বেদী, মাস্টার কৃষ্ণরাও, গোবিন্দরাও টোম্বে ও বালগান্ধর্ব উল্লেখযোগ্য। ওস্তাদ আল্লাদিয়া খাঁ'র পত্নী ছিলেন ধ্রুপদী গায়ক হস্‌সু খাঁ'র কন্যা। আল্লাদিয়া খাঁ'র তিনপুত্র নাসিরুদ্দিন খাঁ, মন্‌জি খাঁ এবং বুর্জি খাঁ'র মধ্যে মনজি খাঁ'র ভাল নাম ছিল বদরদ্দিন খাঁ এবং বুর্জি খাঁ'র নাম ছিল বদরউদ্দিন খাঁ। পুত্রদের মধ্যে মন্‌জি খাঁকে নিয়েই তিনি অধিক গর্ববোধ করতেন। মন্‌জি খাঁ ধ্রুপদে তালিম নেন চাচা হায়দার খাঁ'র কাছে। মন্‌জি খাঁ একাধারে ধ্রুপদ, ধামার,

Dhaka University Institutional Repository

নথন স্টাইলে বোলতান, খেয়াল, হোরী, গীত, ঠুমরী, গজল সবই গাইতেন। তিনি অসাধারণ ভঙ্গিমায় তারানা পরিবেশনের মাধ্যমে শ্রোতাদের মুগ্ধ করতেন। মন্‌জি খাঁ'র শিষ্যদের মধ্যে মল্লিকার্জুন মনসুর, কেসরবাঈ, মধুবাঈ কুর্দিকর প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।[৩] জয়পুর ঘরানার প্রধান সাংগীতিক বৈশিষ্ট্য হলো এটি একটি তান প্রধান গায়কি। এতে বিস্তার খুব একটা করা হয় না। বন্দিশকে আশ্রয় করে বহলাওয়া করা হয়। যারা ধ্রুপদী তারা তান করেন না। তাঁদের ধারণা তান রাগরূপকে ব্যহত করে। তবে তারা দ্রুত জোড়ের কাজে গমক দিয়ে পর্দা গুলোকে জুড়ে দেন। মার্গ সংগীতের বৈশিষ্ট্যে কিন্তু এরূপ করা হয় না। সেখানে এক পর্দা থেকে আরেক পর্দায় মীড়ের সাহায্যে যাওয়া হয়। আল্লাদিয়া খাঁ'র ঘরানায় তান বহলাওয়ারই রূপান্তর। বহলাওয়া দ্রুত গতিতে গাইলে যে তানের সৃষ্টি হয় তা দানা না দিয়ে মীড়যুক্ত স্বর প্রয়োগ দ্বারা করা হয়। যেমন: সারে সারে, রেগ রেগ, গম গম এইভাবে তানকে সাজানো হয়। জয়পুর ঘরানার সাথে অন্যান্য ঘরানার মূল পার্থক্যই তান প্রয়োগ পদ্ধতির। তানে একটি করে স্বর প্রয়োগে রাগভ্রষ্ট হবার সম্ভাবনা বেশী বলে আগ্রা ও জয়পুর ঘরানাদাররা তানে দুটি করে স্বর লাগানো চালু করে। এর ফলে রাগ যত কঠিনই হোক না কেন তানের বিস্তারে রাগরূপ অক্ষুণ্ন থাকে। রজব আলী খাঁ, নিভৃতি বুয়া প্রভৃতি সংগীতজ্ঞেরা তালের ছন্দকে না ভেঙ্গে কখনো পাঁচ পাঁচ, কখনো চার চার আবার কখনো তিন তিন স্বরের সমাহারে তান করতেন। জয়পুর ঘরানার গায়কী গোয়ালিয়র বা আগ্রা ঘরানার মত বন্দিশকে আলিঙ্গন করে চলে। জয়পুর ঘরানার স্বর প্রয়োগ করা হয় শুদ্ধ আকারে। এছাড়া এই ঘরানায় অনেক মিশ্র ও অপ্রচলিত রাগ গাওয়া হয়। যেমন- বসন্তবাহার, আড়ম্বরী কেদার, বাসন্তী কেদার, শুদ্ধ নট (আগ্রা ঘরানায় যাকে সার নট বলে), পট বিহাগ (পটদীপ+বেহাগ), ভৈরোঁ বাহার, সম্পূর্ণ মালকোষ, রাইসা কানাড়া, খোকর (আগ্রা ঘরানায় যার নাম 'চম্পক বিলাবল'), ভৌশাখ ইত্যাদি অপ্রচলিত ও মিশ্র রাগগুলি জয়পুর ঘরানা ব্যতীত অন্য ঘরানায় খুব একটা শোনা যায় না।[৪]

জয়পুর ঘরানার বিখ্যাত সংগীতজ্ঞদের চিত্র:

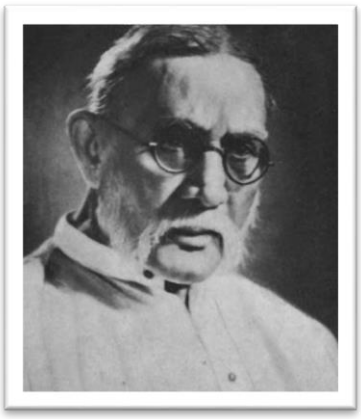

ওস্তাদ আল্লাদিয়া খাঁ [৫]

ওস্তাদ মন্‌জি খাঁ [৬]

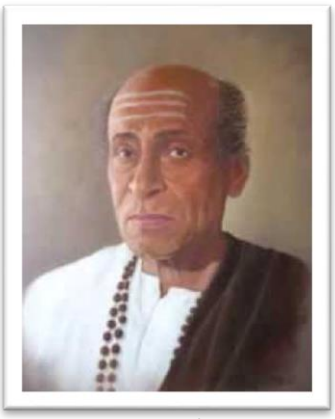

পণ্ডিত মল্লিকার্জুন মনসুর [৭]

Dhaka University Institutional Repository

তথ্য ও চিত্রসূত্র

১) দিলীপ কুমার মুখোপাধ্যায়, *ভারতীয় সংগীতে ঘরানার ইতিহাস*, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী প্রা:লি:, কলকাতা: ১৩৮৪

২) অমল দাশ শর্মা, *প্রাচীন ও নবীন সংগীতজ্ঞ এবং ঘরানার ইতিবৃত্ত*, দরবারী প্রকাশন, কলকাতা: ১৯৯৫

৩) কুমার প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, *কুদরত রঙ্গি বিরঙ্গী*, আনন্দ পাবলিশার্স, ১লা বৈশাখ ১৪০২, কলিকাতা

৪) কুমার প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, *খেয়াল ও হিন্দুস্তানি সঙ্গীতের অবক্ষয়*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা: ১৪১০

৫) http://ustadalladiyakhan.blogspot.com/2010/01/biography-ustad-alladiya-khansaheb.html

৬) https://en.wikipedia.org/wiki/Manji_Khan#/media/File:Manji_Khan.j p g

৭) https://www.youtube.com/watch?v=wYnXdKHyxHM

রামপুর (সহসওয়ান) ঘরানা

ভারতের উত্তরপ্রদেশের বাদাউন জেলায় সহসওয়ান নগর অবস্থিত। এখানে অনেক দিকপাল সংগীতজ্ঞ জন্মগ্রহণ করেছেন। রামপুর ঘরানা একটি বৃহৎ সেনী ঘরানারই শেষপর্যায় বলে ধারণা করা হয়। তানসেন বংশীয় কয়েকজন গুণী সংগীতজ্ঞদের শিক্ষাধারায় সহসওয়ান বা রামপুর ঘরানা বিস্তার লাভ করে। তানসেন জামাতা মিশ্রী সিং তথা নৌবৎ খাঁ ও সদারঙ্গ এই তিন প্রজন্মে রামপুর ধারার বিকাশ হয়েছিল বলে জানা যায়। বিভিন্ন রীতির কণ্ঠসংগীত ও নানা প্রকার যন্ত্রসংগীত চর্চার জন্য রামপুর ভারতে একটি বৃহত্তম ও বিখ্যাত সম্প্রদায়রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। রামপুর ঘরানার ইতিহাস সম্পর্কে জানা যায় যে, ১৮৫৭ সালে সমগ্র ভারতবর্ষে বিদ্রোহের সময় অনেকের মত সহসওয়ানের দক্ষিণে অবস্থিত রামপুরের জমিদার নবাব ইউসুফ আলী খাঁ (১৮৪০-১৮৬৪) ইংরেজদের নানাভাবে সহায়তা করেন। এতে ইংরেজরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতাস্বরূপ বিদ্রোহ দমনের পর নানাবিধ সুযোগ সুবিধা প্রদান করে তাঁকে 'নবাব' উপাধি দেন। রামপুর নবাব ইউসুফ আলী ও তাঁর বংশধরেরা অন্ত্যন্ত গুণী সংগীতজ্ঞ ছিলেন এবং রামপুরে একটি উন্নতমানের সংগীত দরবার প্রতিষ্ঠায় খুব আগ্রহী ছিলেন। সেই লক্ষ্যে তিনি রামপুর দরবারে কয়েকজন শ্রেষ্ঠ গায়ক ও বাদককে আমন্ত্রণ করে আনেন যাঁদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ছিলেন তানসেন বংশীয় দু'জন গুণীশিল্পী। এঁদের একজন হলেন তানসেনের কন্যা বংশের ওমরাও খাঁ'র পুত্র আমীর খাঁ যিনি বারানসী থেকে রামপুর দরবারে যোগ দিতে আসেন আর অন্যজন হলেন তানসেনের পুত্র বংশের (জাফর খাঁ-বাসৎ খাঁ'র ভাগিনেয়) বাহাদুর হোসেন যিনি কাশীর নিকটবর্তী ভাদৈ রাজসভা থেকে রামপুর আসেন। অন্যান্য যারা রামপুর দরবারে ছিলেন তাঁরা বিভিন্ন সংগীত পরিবার থেকে নিযুক্ত হয়েছিলেন। আমীর খাঁ ও বাহাদুর হোসেনকে কেন্দ্র করেই অন্যান্য শিল্পীদের রামপুর দরবারে নিযুক্ত করা হয় এবং তাঁরা এই দুই দিক্‌পালের কাছে সংগীতশিক্ষার সুযোগ পান। সেইসময় বংশের অতিরিক্ত কাউকে তালিম দেওয়ার রীতি না থাকলেও সংগীতপ্রেমী নবাব ইউসুফ আলীর প্রভাব ও দাক্ষিণ্যে রামপুর দরবারে তা সম্ভব হয়। তাঁর পুত্র কলবে আলী খাঁ সংগীতের পৃষ্ঠপোষকতায় পিতার চেয়েও অগ্রণী ছিলেন । ইউসুফ আলী খাঁ'র অপরপুত্র হায়দার আলী খাঁ অতি গুণীশিল্পী ছিলেন। হায়দার আলী ছিলেন বাহাদুর সেনের শিষ্য। তাঁর সাহায্যেই অন্যান্য রাজ্যের মত রামপুর দরবারে সংগীতসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। তৎকালীন দরবারী সংগীতজ্ঞদের মধ্যে উজীর খাঁ, বুনিয়দ হুসেন খাঁ, মহম্মদ হুসেন খাঁ ও হায়দার আলীর পুত্র সাদাত আলীর নাম উল্লেখযোগ্য। কলবে খাঁ'র পুত্র নবাব মুস্তাক আলী খাঁ মাত্র দুই বৎসর নবাবী করেন। তাঁর পুত্র নবাব হামিদ আলী খাঁ (১৮৮৯-১৯২৮) অত্যন্ত গুণী সংগীতজ্ঞ ছিলেন। পণ্ডিত ভাতখণ্ডে তাঁর শিষ্য ছিলেন এবং তাঁর সহায়তায় পণ্ডিতজী তানসেন বংশীয় অনেক মূল্যবান সংগীত সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়েছিলেন বলে জনা যায়। সেইসময় রামপুর দরবারে ভারতের অনেক শ্রেষ্ঠ সংগীতজ্ঞ ছিলেন। যাঁদের মধ্যে উজীর খাঁ, আলাউদ্দিন খাঁ, হাফিজ আলী খাঁ, হায়দার খাঁ, ফিদা হুসেন খাঁ, মেহবুব বক্‌স খাঁ এবং

Dhaka University Institutional Repository

তাঁর পুত্র ইনায়ত হুসেন খাঁ, মুস্তাক হুসেন খাঁ, মহম্মদ আলী খাঁ, বুন্দু খাঁ, ভাইয়া সাহেব গনপত রাও, আহমদ জান থিরকুয়া, কালে নজীর খাঁ, অচ্ছন মহারাজ, কালিকা প্রসাদ মিশ্র প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।[১]

বাহাদুর হোসেন ছিলেন ধ্রুপদী, সুরশৃঙ্গার বাদক এবং তারানা রীতির কণ্ঠসংগীতে দৃষ্টান্ত স্থাপনকারী শিল্পী। সুরশৃঙ্গারে রাগালাপ বাদনের জন্য তিনি বিখ্যাত ছিলেন এবং প্যারে খাঁ'র কাছে সেনিয়া ঘরানার ধ্রুপদের তালিম পেয়েছিলেন। বস্তুত বাহাদুর হোসেন ও আমীর খাঁ'র কাছে সংগীতশিক্ষার কালে রামপুরে যে শিষ্যসম্প্রদায় গঠিত হয় পরবর্তী কালে তা-ই একটি সংগীত পরিবার রূপে চিহ্নিত হয় এবং ধীরে ধীরে এই গুণীজনদের সমন্বিত ধারাই রামপুর ঘরানা নামে খ্যাত হতে থাকে। বাহাদুর হোসেন ও আমীর খাঁ'র কাছে সংগীতশিক্ষা গ্রহণ করে যে সংগীতিক পরিবার গঠিত হয়েছিল তার মধ্যে বহিরাগত কলাবৎদের সঙ্গে নবাব বংশীয় ব্যক্তিরাও ছিলেন। তাঁরা দুইজন একসাথেই রামপুরে শিষ্যসম্প্রদায় গঠন করেছিলেন। বাহাদুর হোসেনের শিষ্যবর্গের মধ্যে প্রধান হলেন নবাব ইউসুফ আলীর কনিষ্ঠ পুত্র হায়দার আলী। তিনি সুরশৃঙ্গার, বীণা ও ধ্রুপদ-ধামারে রামপুর ঘরানার তালিম পেয়েছিলেন। রামপুরে হায়দার আলীর মত আর কেউই বাহাদুর হোসেনের কাছ থেকে এমন পর্যাপ্ত বিদ্যা লাভ করেননি। নবাবের কনিষ্ঠ পুত্র হওয়ায় হায়দার আলী-বিলসী ও বদায়ন জেলার তালুকদারী পান যার উপস্বত্ব থেকে তিনি ওস্তাদ বাহাদুর হোসেনকে যথেষ্ট দক্ষিণা দিতেন। বাহাদুর হোসেনের দ্বিতীয় শিষ্য ছিলেন কুতুবউদ্দৌলা। বীণা ও সেতারে তিনি বাহাদুর হোসেনের কাছে তালিম নেন। লক্ষ্ণৌর এই সম্ভ্রান্ত বংশীয় গুণীশিল্পী লক্ষ্ণৌর নবাব ওয়াজেদ আলীর দরবারেও নিযুক্ত ছিলেন। পরবর্তী কালে তিনি সেতারীরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। বাহাদুর হোসেনের তৃতীয় শিষ্য ছিলেন গোয়ালিয়র ঘরানার হদ্দু খাঁ'র জামাতা বিখ্যাত গায়ক এনায়েত হোসেন খাঁ। রামপুরে থাকাকালীন তিনি বাহাদুর হোসেনের কাছে বিশেষ করে তারানার শিক্ষা পান। এনায়েত হোসেন খেয়াল গাইতেন। তিনি এনায়েত হোসেনকে ধ্রুপদের তালিম না দিয়ে অনেকাংশে পাখোয়াজের বোলের ভিত্তিতে গঠিত ধ্রুপদভাঙ্গা এবং ভারিচালের খেয়ালাঙ্গ তারানার তালিম দেন। বাহাদুর হোসেন তবলার বোলে তারানাও গঠন করেছিলেন। তাঁর রচিত তারানার বন্দিশগুলো ছিল অত্যন্ত আকর্ষণীয়। তবে খেয়াল গায়ক বলেই এনায়েত হোসেন- বাহাদুর হোসেনের কাছে তারানার তালিম বেশী পান। এইসকল তারানা পরবর্তী কালে এনায়েত হোসেন বিখ্যাত সংগীত শিল্পী মুস্তাক হোসেনকে দেন যাঁকে আমরা রামপুর ঘরানাদার হিসেবে পাই উজীর খাঁ'র শিষ্যমণ্ডলীতে। পরবর্তী সময়ে এনায়েত হোসেনের জামাতা নিসার হুসেন খাঁ রামপুর ঘরানার বিখ্যাত খেয়াল গায়করূপে প্রতিষ্ঠিত হন। বাহাদুর হোসেনের আরেক শিষ্যদ্বয় ছিলেন প্রসিদ্ধ দুই গায়ক আলী ও ফত্তু। সংগীতজগতে তারা আলীয়া ফত্তু নামে পরিচিত। সংগীতজীবনে একসঙ্গে পথচলার কারণেই তাঁদের নাম যুগ্মভাবে উচ্চারিত হয়। আলীয়া ফত্তু-বাহাদুর হোসেন ছাড়া ডাগর ঘরানার বৈরাম খাঁ'র কাছেও সংগীতশিক্ষা লাভ করেন। তবে হায়দার আলীর পর বাহাদুর হোসেনের শ্রেষ্ঠ শিষ্যরূপে যিনি গণ্য তিনি হলেন এনায়েত হোসেনের ভ্রাতা এবং কুতুবউদ্দৌলার জামাতা মহম্মদ হোসেন। বাহাদুর হোসেনের নিকট বীণার তালিম এবং শ্বশুরের কাছে

শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে মহম্মদ হোসেন রামপুর ঘরানার অন্যতম কৃতী সংগীতজ্ঞ রূপে প্রতিষ্ঠা পান। এনায়েত হোসেনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা আলী হোসেন ছিলেন উৎকৃষ্ট বীণকার। বাহাদুর হোসেনের তালিমে তিনি অনেক প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এছাড়া এই ঘরানার আবিদ আলী খাঁ তারানার শিক্ষা পান বাহাদুর হোসেনের নিকট। ১৮৭০ সালে বাহাদুর হোসেন মৃত্যুবরণ করেন। আবিদ আলীর জ্ঞাতি ভ্রাতা আসাদ আলী খাঁ প্রথমে বাহাদুর হোসেনের নিকট ধ্রুপদ-ধামার ও তারানার তালিম নেন, পরবর্তী কালে কণ্ঠ ক্ষতিগ্রস্থ হলে তিনি যন্ত্রসংগীত শেখেন এবং দিনাজপুরের দরবারে গিরিজানা রায়ের সময়ে সরোদবাদক হিসেবে নিযুক্ত হন। আবিদ আলীর পুত্র আহম্মদ আলী তাঁর কাছে সরোদের তালিম পান এবং সরোদ বাদকরূপে দিনাজপুর ও মুক্তাগাছা দরবারে নিযুক্ত থাকেন। বিখ্যাত শিল্পী আলাউদ্দিন খাঁ প্রথম জীবনে কিছুদিন আহম্মদ আলীর নিকট সরোদ শিক্ষা গ্রহণ করেন।[২]

রামপুরে আমীর খাঁ'র তালিম যারা পান তাঁদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ্য উজীর খাঁ। তিনি পিতার বংশগত শিক্ষায় গঠিত হলেও আমীর খাঁ তাঁর তালিম সম্পূর্ণ করতে পারেননি। কারণ আমীর খাঁ মাত্র ৪৯ বছর বয়সে (১৮৭৩ সালে) দেহান্ত হন, যখন উজীর খাঁ'র বয়স ছিল ২২ বছর। তাঁর পিতার মৃত্যুর তিন বছর আগেই বাহাদুর হোসেন গত হয়েছিলেন। এরপর উজীর খাঁ ঘরানাদার তালিম পান হায়দার আলীর কাছে যিনি বাহাদুর হোসেনের প্রধান শিষ্য হলেও আমীর খাঁ'র কাছেও বীণা, ধ্রুপদ ও হোরী গানের তালিম পেয়েছিলেন। হায়দার আলীর পর আমীর খাঁ'র শিষ্যরূপে ফিদা হোসেনের নাম উল্লেখযোগ্য। শাজাহানপুরের সরোদী পরিবারের সন্তান এবং এনায়েত আলীর ভ্রাতৃস্পুত্র ফিদা হোসেন প্রথমে নিজ ঘরের তালিম পান এবং পরবর্তী কালে রামপুরে অবস্থান করে আমীর খাঁ'র কাছে শিক্ষালাভ করেন। রামপুর ঘরানার বাদকরূপে তিনি দীর্ঘকাল সরোদ যন্ত্রের শিল্পী হিসেবে রামপুর দরবারে নিযুক্ত থাকেন।

আমীর খাঁ'র আরেক অন্যতম কৃতী শিষ্য বনিয়াদ হোসেন সারেঙ্গী বাদকরূপে রামপুর দরবারে নিযুক্ত থাকেন। তিনি পুত্র মেহেদী হোসেনকে রামপুর ঘরানার তালিম দেন। পরবর্তী কালে মেহেদী হোসেন উজীর খাঁ'র কাছেও সংগীতশিক্ষা লাভ করেন। আমির খাঁ'র অপর শিষ্যের মধ্যে মুরাদ আলী, কুতুবদ্দৌলা প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

ছম্মন সাহেব ছিলেন বাহাদুর হোসেনের প্রধান শিষ্য হায়দার আলীর পুত্র। তিনি সুরশৃঙ্গারের অত্যন্ত গুণীশিল্পী ছিলেন। সুরশৃঙ্গারে রাগালাপ ছিল তাঁর বাদনের এক অতুলনীয় বৈশিষ্ট্য। তিনি স্বল্প পরিসরে ঠুমরী চর্চা করতেন। ঘরোয়াভাবে উজীর খাঁ ঠুমরী চর্চার পাশাপাশি 'ছতর পিয়া' ভনিতায় ঠুমরী গানও রচনা করেছেন। উজীর খাঁ'র ঠুমরীর প্রতি আগ্রহ আসে 'সনদ পিয়া' থেকে। 'সনদ পিয়া' ছিলেন রামপুর দরবারে ঠুমরী গানের প্রধান গায়ক। বাহাদুর হোসেন ও আমীর খাঁ'র সময় তিনি এই দরবারে যোগদেন। লক্ষ্ণৌর নবাব ওয়াজেদ আলী শাহের দরবারে ঠুমরী গায়ন ও ঠুমরী গান রচনা করে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন। লক্ষ্ণৌ দরবারের ভগ্নদশা কালে তিনি রামপুরের নবাব ইউসুফ আলীর দরবারে চলে আসেন।

তাঁর আসল নাম তবক্কুল হোসেন খাঁ হলেও গানের ভনিতায় ছদ্মনাম হিসেবে ব্যবহার করতেন 'সনদ পিয়া'। সনদ পিয়া রামপুর দরবারে অবস্থান করার সময় বহু ঠুমরী রচনা করেন এবং সেইসব ঠুমরী গান তিনি দরবারে পরিবেশন করেন। বাহাদুর হোসেন ও আমীর খাঁ রামপুরে সুরশৃঙ্গার ও বীণাবাদনের যে ধারা প্রবর্তন করেন তার চলন ও বাজ অনুসারেও সনদ পিয়া অনেক বন্দিশ রচনা করেন। ভারতীয় সংগীতের পুনরুদ্ধারে নিবেদিত প্রাণ পণ্ডিত ভাতখণ্ডে সনদ পিয়া রচিত তেমন কিছু বন্দিশও প্রকাশ করেন। পণ্ডিতজী এক্ষেত্রে উজীর খাঁ ও ছম্মন সাহেবের ঘনিষ্ঠ সহযোগীতা লাভ করেন। উজীর খাঁ'র শিষ্যরূপে পণ্ডিত ভাতখণ্ডে রামপুর ঘরানার কিছু ধ্রুপদ সংগ্রহ করেছিলেন তাঁর *ক্রমিক পুস্তক মালিকা* গ্রন্থের জন্য। পরবর্তী কালে উজীর খাঁ'র সেই ঠুমরীর ধারা- সগীর খাঁ, দবীর খাঁ, এবং রামপুরে ছম্মন সাহেবের শিষ্য গিরিজাশংকর চক্রবর্তী পর্যন্ত দেখা যায়। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, রামপুরে সকলের ঠুমরী ধারার উৎস মূলে ছিল সনদ পিয়া এবং যার সুত্রপাত হয়েছিল রামপুরের নবাব ইউসুফ আলীর দরবারে ঠুমরী পরিবেশনের মাধ্যমে। এতদসত্ত্বেও রামপুর ঘরানার ঠুমরী গানের চর্চা অতটা জনপ্রিয় হতে পারেনি।[৩]

উজীর খাঁ আনুমানিক ১৮৫১ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি জন্ম সুত্রেই রামপুর নিবাসী ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর নবাব ভ্রাতা হায়দার আলীর কাছে রামপুরে শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। পরবর্তী কালে বারনসীতে মাতামহ সম্পর্কিত নিসার আলী, সাদিক আলি এবং বড়কু মিঞার কাছে তালিম নেন। রামপুর থেকে তিনি কাশীতে যাতায়াত করতেন। ১৮৯২ সালে কলকাতায় আগমনের আগেও তিনি রামপুর কেন্দ্রে যুক্ত ছিলেন। কলকাতায় সাত বছর অবস্থানের পর তিনি রামপুর দরবারে স্থায়ীভাবে যোগ দেন। কলকাতায় অবস্থানকালীন বেশকিছু প্রতিভাবান বাঙালি তাঁর কাছে শিক্ষার সুযোগ লাভ করেন। এঁদের মধ্যে কলকাতার শিমুলিয়া নিবাসী হাবুদত্ত নামে সুপরিচিত অমৃতলাল দত্ত (এস্রাজ ও সুরবাহার বাদক, ধ্রুপদ ও খেয়াল গায়ক এবং বিখ্যাত সুরশৃঙ্গার বাদক), ভবানীপুরের প্রশথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং যাদরেন্দ্র নন্দন মহাপাত্র যিনি উজীর খাঁ'র কাছে সুরবাহারের শিক্ষা পেয়েছিলেন- প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। উজীর খাঁ কলকাতা থাকাকালীন আলাউদ্দিন খাঁ কিছুদিন তাঁর কাছে তালিম নেন। পরবর্তী কালে আলাউদ্দিন খাঁ রামপুরে গিয়ে উজির খাঁ'র কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেন। উজীর খাঁ ১৮৯৯ সালে রামপুর দরবারে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হবার পর গঠিত হয় তাঁর প্রধান শিষ্যমণ্ডলী। ফলে রামপুর ঘরানার ধারা রক্ষা পায় কারন, যেহেতু রামপুর ঘরানা একটি বৃহৎ সেনী ঘরানারই শেষ পর্যায় এবং তার বাহক হলেন স্বয়ং উজীর খাঁ, তাই তাঁর নেতৃত্বে রামপুর ঘরানা স্বমর্যাদায় অধিষ্ঠিত হতে থাকে। রামপুরে যাঁদের তালিম দিয়ে উজীর খাঁ শিষ্যসম্প্রদায় গঠন করেন তাঁদের মধ্যে মহম্মদ হোসেন (বীণকার), নাসির আলি (সেতারী, সুরবাহারী), সৈয়দ ইব্বন আলী (হারমোনিয়াম বাদক), আলাউদ্দিন খাঁ (সরোদী), আব্দুর রহিম (সেতারী), হাফেজ আলী (সরোদী), মেহেদী হোসেন (ধামার), মুস্তাক হোসেন (ধামার, আলাপ), নবাব হামিদ আলী প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।[৪]

ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ মাইহার দরবারে অবস্থান কালে বিভিন্ন সময় যোগ্যশিষ্য তৈরী করে তিনি আধুনিক কালের সংগীতের ইতিহাসে এক সূবর্ণ অধ্যায় রচনা করেছিলেন। তাঁর শিষ্যের মধ্যে আলী আকবর (সরোদ), ররিশংকর (সেতার), পান্নালাল ঘোষ (বাঁশী), অন্নপূর্ণা, পৌত্র আশীষ খাঁ, তিমির বরণ ভট্টাচার্য (সরোদ), আলী আহম্মদ (সেতার), বাহাদুর খাঁ, (সরোদ), রাজা রায় (সেতার), যতীন্দ্র ভট্টাচার্য (সরোদ), নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় (সেতার), বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সরোদ), ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য (সেতার), অজয় সিংহ রায় ও বীরেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরীর নাম উল্লেখযোগ্য।

আলাউদ্দিন খাঁ'র সমসাময়িক তানসেনের কন্যাবংশের শেষ বীণকার ধ্রুপদী এবং রামপুর ঘরানার ঐতিহ্যের সমাপ্তি পর্যায়ের অন্যতম আচার্য স্থানীয় সেনিয়া ছিলেন দবির খাঁ যিনি বাংলার সংগীত সমাজে এই ঘরানাকে বহুল বিস্তারিত করেন। তিনি রামপুর থেকে ১৯৩৪ সালে কলকাতায় এসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন এবং ১৯৭২ সালের জানুয়ারী মাসে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি তানসেন বংশের কুলপ্রদীপস্বরূপ ঘরানাদার শিক্ষার মাধ্যমে বিরাট বাঙালি শিষ্যগোষ্ঠী গঠন করেন। তাঁর শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে ক্ষেত্রমোহন ঠাকুর (বীণা), কৃষ্ণচন্দ্র দে (ধ্রুপদ), বীরেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী (বীণা, ধ্রুপদ), বীণাপানি মুখোপাধ্যায় (খেয়াল), জয়কৃষ্ণ সান্যাল (ধ্রুপদ), রাধিকা মোহন মিত্র (সরোদে রাগালাপ), প্রকাশ সেন (বীণা), রাজা রায় (সেতার), জিতেন্দ্র মোহন সেন গুপ্তের নাম উল্লেখযোগ্য। দবীর খাঁ কলকাতাবাসী হবার কয়েক বছর পূর্বে উজীর খাঁ'র পুত্র সগীর খাঁ কলকাতায় অবস্থান করেন। তিনি খুব বেশী সময় কলকাতায় অবস্থান করেননি তবে তাঁর সঙ্গে কলকাতার সংগীত ক্ষেত্রের একটা সংযোগ থেকে যায়। তিনি রামপুর থেকে প্রায়ই কলকাতায় আসতেন। তাঁর কাছে যে ক'জন বাঙালি গুণী শিক্ষালাভ করেন তাঁদের মধ্যে ক্ষেত্রমোহন ঠাকুর, বীরেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী, কৃষ্ণচন্দ্র দে, বীণাপানি মুখোপাধ্যায় প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি উত্তম ঠুমরী গাইতেন এবং সেসব ঠুমরী তিনি পিতা উজীর খাঁ ও ছম্মন সাহেবের কাছ থেকে লাভ করেছিলেন।

রামপুর ঘরানার উপযুক্ত উত্তরাধিকারী রামপুর নিবাসী মেহেদী হোসেন ১৮৮৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম বনিয়াদ হোসেন। শুরুতে তিনি পিতার কাছেই সারেঙ্গী বাদনে শিক্ষালাভ করেন। সারেঙ্গী বাদক হলেও কণ্ঠসংগীতের বিভিন্ন রীতিতে মেহেদী হোসেন অত্যন্ত অভিজ্ঞ ছিলেন। তিনি রামপুর থেকে পেশাদার জীবনযাপনের জন্য কলকাতায় আসেন এবং শিষ্যগোষ্ঠী গড়ে তোলেন। উজীর খাঁ'র জ্যেষ্ঠ পুত্র নাজির খাঁ ছিলেন তাঁর অন্যতম প্রধান উত্তরসাধক এবং প্রিয় পুত্র। কিন্তু নাজির খাঁ'র (প্যারে খাঁ) অকাল মৃত্যুতে নিদারুণ শোকে দুই বছর পরেই উজীর খাঁ'র মৃত্যু হয় (১৮২৬)। তবে তার আগেই তিনি তরুণ পৌত্র দবীর খাঁকে যথাসাধ্য তালিম দেন। উজীর খাঁ'র মৃত্যুর দুই বছরের মধ্যে রামপুরের নবাব হামিদ আলীরও জীবনাবসান হওয়ায় চুড়ান্ত সংকট দেখা দেয় দরবার নির্ভর রামপুর ঘরানায়।

উজীর খাঁ'র পুত্র সগীর খাঁ এবং অন্যান্য গুণীরা রামপুর ত্যাগ করেন। ফলে রামপুরের সংগীত দরবার নিস্প্রদীপ হয়ে যায়।

রামপুর ঘরানা প্রধানত তন্ত্রবাদ্যের ঘরানা হলেও বিভিন্ন রীতির কণ্ঠসংগীত ও যন্ত্রসংগীত চর্চার জন্য এই ঘরানা বিখ্যাত হয়। সম্পূর্ণ পদ্ধতির এবং ধ্রুপদাঙ্গ রাগালাপ এই ঘরানার সংগীতচর্চার ভিত্তিস্বরূপ। এই ঘরানার বিখ্যাত খেয়াল গায়ক নিসার হুসেন খাঁ তাঁর গায়নশৈলীতে প্রথমেই আলাপ ছাড়াই দ্রুত লয়ের বন্দিশ করতেন। তারপর দ্রুততান, বোলতান, জোড়-বোলতানের ব্যবহারের মধ্য দিয়ে ঘরানার গায়নশৈলী ফুটিয়ে তুলতেন। মুস্তাক হুসেন খাঁ তাঁর গানে ছোট ছোট লয়কারী, আকার যুক্ত তান এবং বিভিন্ন ছন্দের লয়কারী প্রয়োগ করতেন।

এই ঘরানার গায়কীর সাথে গোয়ালিয়র ঘরানার গায়কীর মিল রয়েছে। জটিল তান এবং তারানা গায়কীর জন্যও রামপুর ঘরানা বিখ্যাত। তবে বর্তমানে ওস্তাদ নিসার হুসেন খাঁ'র পৌত্র রাশিদ খাঁ রামপুর (সহসওয়ান) ঘরানাদার গায়ক হিসেবে সবচেয়ে বেশী খ্যাতিলাভ করেছেন। তিনি স্বীয় প্রতিভা দ্বারা তাঁর তালিম পূর্ণ করেছেন। তাঁর কণ্ঠে স্বর প্রয়োগের মধ্যে যে আবেগ আছে তা সচরাচর এই ঘরানার অন্য ওস্তাদদের মধ্যে পাওয়া যায় না। তাঁর গায়কীতে ওস্তাদ নিসার হুসেন খাঁ'র প্রভাব লক্ষণীয়। রাশিদ খাঁ'র বিস্তারে কিরানা ঘরানারও প্রভাব দেখা যায় কারণ তিনি অপরিসর গন্ডির মধ্যে নিজেকে সীমাবদ্ধ না রেখে স্বকীয় একটি গায়কী তৈরী করে নিয়েছেন।

ধ্রুপদাঙ্গের রাগালাপ এবং ধ্রুপদী মেজাজের গায়ন রামপুর ঘরানার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এতে তান, বোলতান, সরগম প্রভৃতি যথেষ্ট কিন্তু সুসঙ্গত রূপে প্রযুক্ত হয়। এই ঘরানার শিল্পীরা উৎকৃষ্ট তারানা গায়ক রূপে বিখ্যাত। রামপুর ঘরানার গায়কীর বৈশিষ্ট্যের জন্যই এই ঘরানা অনেক জনপ্রিয়তা অর্জনে সক্ষম হয়েছে।

রামপুর ঘরানার বিখ্যাত সংগীতজ্ঞদের চিত্র:

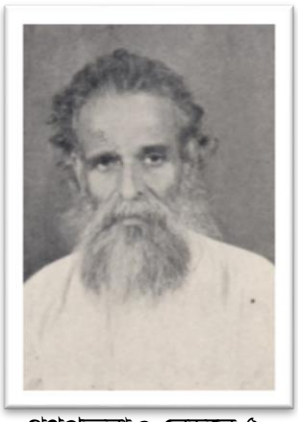

গণপতরাও বেহরে [৫]

ওস্তাদ এনায়েত হোসেন খাঁ [৬]

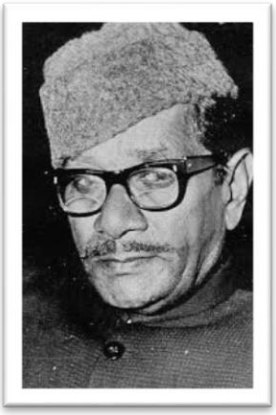

ওস্তাদ নিসার হোসেন খাঁ [৭]

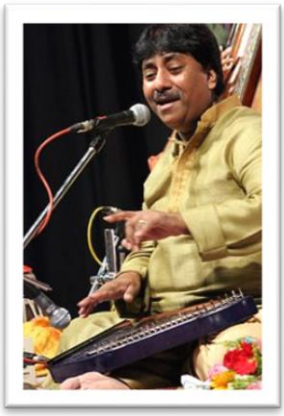

ওস্তাদ রশিদ খাঁ [৮]

তথ্য ও চিত্রসূত্র

১) দিলীপ কুমার মুখোপাধ্যায়, *ভারতীয় সংগীতে ঘরানার ইতিহাস*, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী প্রা:লি:, কলকাতা: ১৩৮৪

২) অমল দাশ শর্মা, *প্রাচীন ও নবীন সংগীতজ্ঞ এবং ঘরানার ইতিবৃত্ত*, দরবারী প্রকাশন, কলকাতা: ১৯৯৫

৩) অমল দাশ শর্মা, *প্রাচীন ও নবীন সংগীতজ্ঞ এবং ঘরানার ইতিবৃত্ত*, দরবারী প্রকাশন, কলকাতা: ১৯৯৫

৪) দিলীপ কুমার মুখোপাধ্যায়, *ভারতীয় সংগীতে ঘরানার ইতিহাস*, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী প্রা:লি:, কলকাতা: ১৩৮৪

৫) https://www.parrikar.org/vpl/?page_id=194

৬) http://www.prasadkhaparde.com/Gharana.htm

৭) https://www.discogs.com/artist/2808362-Nissar-Hussain-Khan

৮) https://en.wikipedia.org/wiki/Rashid_Khan_(musician)#/media/File: Ustad _rashid_kan_bharat_bhavan_bhopal_(4).JPG

দিল্লী ঘরানা

ভারতের বিভিন্ন রাজবংশের রাজধানী হওয়ায় দিল্লী বহুপূর্ব থেকেই সংগীতের একটি বিখ্যাত কেন্দ্ররূপে খ্যাত ছিল। সংগীত ও অন্য কলার শিল্পীরা ভাগ্যান্বেষনে দিল্লী আসতেন। বিশেষকরে মোঘল সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে (১৫৫৬–১৬০৬) অসংখ্য গুণী ও দক্ষ সংগীতজ্ঞরা তাঁর দরবারে আশ্রয় পেলেও বাদশাহ ঔরঙ্গজেব (১৬৫৭–১৭০৭) ক্ষমতায় আসার পর সকল দরবারী সংগীতজ্ঞদের দরবার ত্যাগে বাধ্য করেন। ফলে তাঁরা জীবিকার সন্ধানে দেশের বিভিন্নস্থানে ছড়িয়ে পড়েন। মীরহাসান, মীরবালা, আল্লাবক্স ও উমরাবক্স ভাতৃদ্বয়, মীরবক্সের পুত্র আব্দুল গণি খাঁ (ওস্তাদ সঙ্গী খাঁ), গোলাম মোহাম্মদ খাঁ (মম্মন খাঁ), ওস্তাদ বুন্দু খাঁ, ওস্তাদ ওসমান খাঁ, নসীর আহমদ খাঁ, সগীরুদ্দিন খাঁ প্রমূখ শিল্পীরা দিল্লী ঘরানার সংগীতগুণী বলে খ্যাত ছিলেন যাঁরা দিল্লী থেকে স্থানান্তরিত হয়ে বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন। অনেকে আবার দিল্লীর নিকটবর্তী সমাপুর গ্রামে থেকে তাঁদের বংশানুক্রমিক পরম্পরাকে এগিয়ে নিয়ে যান। তাঁদের মধ্যে উমরাবক্স খাঁ বংশীর মিয়া অচপল, অচপলের পুত্র তানরস খাঁ, ওস্তাদ ওমরাও খাঁ, ওস্তাদ নূর মহম্মদ খাঁ, চাদ খাঁ, হিলাল আহমদ খাঁ, জাফর আহমদ খাঁ, জহুর আহমদ খাঁ, ইকবাল আহমদ খাঁ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এ পর্যায়ে দিল্লী ঘরানার এইসকল সংগীতগুণীদের সম্পর্কে আলোচনা করা হলো।

৮ম শতাব্দীতে মীরহাসান ও মীরবালা– সুলতান সমশুদ্দীন ইলতুতমিশের (১২১১–১২৩৬) সভায় নিযুক্ত থেকে সংগীতে তাঁদের পারদর্শিতার জন্য অত্যন্ত প্রশংসিত হন এবং সুলতান কর্তৃক 'সাবন্ত' ও 'কলাবন্ত' উপাধিতে সম্মানিত হন। কিন্তু আধ্যাত্মিক হওয়ার কারণে স্বল্প সময়ের মধ্যেই তাঁরা দরবার ত্যাগ করে এক দরগায় চলে যান এবং কাওয়ালী গানের মাধ্যমে ঈশ্বরের আরাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। মীরবালা বংশীয় মীর আল্লাবক্স ও উমরাবক্স ভাতৃদ্বয় বল্লভগড়ের মহারাজা নহরসিংহের দরবারে নিযুক্ত থাকেন এবং দক্ষ গায়করূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। আল্লাবক্স খাঁ বংশীয় মীর মহম্মদ বক্স খাঁ সম্বন্ধে তেমন কিছু জানা না গেলেও তাঁর পুত্র আব্দুল গণি খাঁ অত্যন্ত প্রসিদ্ধ সারেঙ্গীবাদক ও গায়ক ছিলেন। তাঁর অপরনাম ছিল সৌঙ্গী খাঁ। বল্লভগড়ের সভাসংগীতজ্ঞ ছাড়াও দেশের বিভিন্নস্থানে আমন্ত্রিত হয়ে তিনি সংগীত পরিবেশন করে প্রশংসিত হন। তাঁর দ্বিতীয় পুত্র গোলাম মহম্মদ খাঁ (মম্মন খাঁ) অত্যন্ত দক্ষ সারেঙ্গীবাদক ছিলেন। তিনি নিজবংশীয় গুরুজন ব্যতিরেকে ইমদাদ খাঁ'র কাছে তালিম নেন এবং দীর্ঘসময় পাতিয়ালা রাজদরবারে নিযুক্ত থাকেন। তাঁর অগ্রজ সম্মন খাঁ এবং সহোদর সুগরা খাঁ ও কল্লন খাঁ অত্যন্ত প্রসিদ্ধ সারেঙ্গীবাদক ছিলেন। মম্মন খাঁ ৫০টি তারযুক্ত 'সুর সাগর' নামক একটি নতুন বাদ্যযন্ত্র

নির্মাণ করেন। তবে এর বাদন প্রক্রিয়ার জটিলতা হেতু যন্ত্রটি তেমন জনপ্রিয়তা পায়না। কল্লন খাঁর পৌত্র মহম্মদ বলী খাঁ এই 'সুরসাগর' যন্ত্রবাদনে দক্ষতা ও সুনাম অর্জন করেছিলেন।[১]

এই বংশের বুন্দু খাঁ ভারতের শ্রেষ্ঠ সারেঙ্গীবাদকের মর্যাদা লাভ করেন। তিনি ছিলেন ওস্তাদ মম্মন খাঁর পৌত্র ও ওমরাও বেগমের পুত্র। মাতামহ মম্মন খাঁর কাছেই তাঁর সংগীতশিক্ষা শুরু হয়। কিছুদিন মহারাজা তুকাজীরাও হোলকরের সভাসংগীতজ্ঞ ও পরবর্তীসময়ে রামপুর স্টেটে অবস্থান করেন। সংগীতের শাস্ত্রগত বিষয়ে তাঁর আগ্রহের কারণে পণ্ডিত ভাতখন্ডেজী'র সাথে যোগাযোগের পর সেই আগ্রহ ও জ্ঞান আরো পরিমার্জিত হয় এবং তিনি *সংগীত বিবেক দর্পণ* নামক সংগীতবিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেন যাতে ভৈরবী ও মালকোষ রাগদ্বয়ের বিস্তারিত আলোচনা বিদ্যমান। পরবর্তী কালে ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর তিনি পাকিস্তান চলে যান। মম্মন খাঁর কনিষ্ঠ পুত্র ওস্তাদ ওসমান খাঁ– খেয়াল, তারানা, ঠুমরী, দাদ্‌রা ও গজল গানে অত্যন্ত দক্ষতা অর্জনপূর্বক অগ্রজ চাঁদ খাঁর সাথে যুগলবন্দী পরিবেশন করে খ্যাতিলাভ করেন। এই ঘরানার ওস্তাদ নসীর আহম্মদ খাঁ– তাঁর পিতা ওসমান খাঁ, চাচা চাঁদ খাঁ ও রমজান খাঁ'র নিকট তালিমপ্রাপ্ত হয়ে অতিগুণী সারেঙ্গীবাদক হিসেবে খ্যাতিলাভ করেন। ১৯৪৮ সালে ভারত ও পাকিস্তানের সংগীতসংস্থা দ্বারা আয়োজিত সংগীত প্রতিযোগীতায় তিনি স্বর্ণপদক লাভপূর্বক ১৯৬২ সালে কলকাতার সংগীত সদন সংস্থা দ্বারা 'সংগীত কাপ্তান' ও ১৯৮০ সালে চণ্ডীগড়ের প্রাচীন ক্লাব কর্তৃক 'সংগীত সম্রাট উপাধিতে' ভূষিত হন। ১৯৮৪ সালে দিল্লীতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।[২]

মুঙ্গের রাজ্যের দরবারী সংগীতজ্ঞ ওস্তাদ টুন্নী খাঁ'র পুত্র বিখ্যাত সারেঙ্গীবাদক ও গুণীগায়ক ওস্তাদ মহম্মদ সগীরুদ্দীন খাঁ ১৯২১ সালে বিহারের মুঙ্গে প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। ধ্রুপদগানে পিতার নিকট শিক্ষা শুরুর পর অগ্রজ বশীর খাঁ'র নিকট তিনি সারেঙ্গীতে তালিমপ্রাপ্ত হন। তিনি আকাশবাণীর কলকাতা কেন্দ্রে ১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত নিযুক্ত ছিলেন। পণ্ডিত ওমকারনাথ ঠাকুর তাঁকে 'সুরসাগর' নামে সম্বোধন করতেন। তিনি 'আমীর খুসরো সংগীত সমাজ' গঠন করেন যেখানে দেশ–বিদেশের বহু শিক্ষার্থীরা সংগীত শিক্ষার সুযোগ পায়।

দিল্লী ঘরানার বিখ্যাত গায়ক মিয়া অচপল ছিলেন মীর উমরাবক্‌স খাঁর পুত্র। আগ্রা ঘরানার ওস্তাদ ছত্রে খাঁ'র সঙ্গে তিনি মোঘল দরবারে নিযুক্ত হন। খেয়াল, তারানা, ত্রিবট, চতুরঙ্গ প্রভৃতির অতুলনীয় গায়ক হওয়ার পাশাপাশি তিনি একজন দক্ষ রচয়িতা ছিলেন। ইমন রাগে– 'হরি হরি ডালিয়া', লক্ষ্মী তোড়ী রাগে 'যোবন রে লালিয়া' সহ অনেক বন্দিশ তিনি রচনা করেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ওস্তাদ তানরস খাঁ (কুতুব বক্‌স) দিল্লী ঘরানার অন্যতম শ্রেষ্ঠ গায়করূপে স্বীকৃত। পিতার নিকট সংগীতশিক্ষা লাভের পর তিনি ইন্দোর, হায়দ্রাবাদ, গোয়ালিয়র প্রভৃতি রাজদরবারে নিযুক্ত থেকে অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

অপ্রচলিত রাগ এবং অপেক্ষাকৃত জটিল বন্দিশ ও তারানা গায়নে তিনি দক্ষ ছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় পাতিয়ালার রাজা তাঁকে আশ্রয় দিলে তিনি সেখানে অবস্থান করে শিষ্যমণ্ডলী গড়ে তোলেন এবং একজন উদার শিক্ষক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। তাঁর শিষ্যের মধ্যে আবদুল্লাহ্ খাঁ, আলী বক্স খাঁ জেনারেল, ফতে আলী খাঁ কর্ণেল, পীর বক্স খাঁ (পাঞ্জাব), জহুর খাঁ, মেহবুব খাঁ (দরসপিয়া, অত্রৌলী) এবং উজাগর সিংহ (সারেঙ্গী) উল্লেখযোগ্য। তাঁর পুত্রদের মধ্যে দ্বিতীয় পুত্র ওমরাও খাঁ (১৮৬০–১৯৩০) অত্যন্ত প্রতিভাবান গায়ক ছিলেন। পিতার নিকট শিক্ষা লাভের পর তিনি দেশের বিভিন্নস্থানে সংগীত পরিবেশন ও বিভিন্ন সময় ইন্দোর, হায়দ্রাবাদ, গোয়ালিয়র প্রভৃতি রাজদরবারের সংগীতজ্ঞ হিসেবে নিযুক্ত থেকে অত্যন্ত খ্যাতিলাভ করেন। এছাড়াও এই ঘরানার গোলাম গৌস খাঁ'র জ্যেষ্ঠ পুত্র আব্দুল রহিম খাঁ (খেয়াল, তারানা ও ত্রিবট), নূর খাঁ'র দ্বিতীয় পুত্র ওস্তাদ নূর মহম্মদ খাঁ, ওসমান খাঁ'র জ্যেষ্ঠ পুত্র ওস্তাদ হিলাল আহমদ খাঁ (১৯২৬–১৯৮৮) ও তাঁর পুত্র আকমল হিলাল, ওসমান খাঁ'র কনিষ্ঠপুত্র জাফর আহমদ খাঁ (সেতারবাদক ও গায়ক) বিখ্যাত বেহালাবাদক জহুর আহম্মদ খাঁ ও তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ওস্তাদ ইকবাল আহমদ খাঁ প্রমুখ সকলেই এই ঘরানার শিল্পী হিসেবে যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করেন।

"ওস্তাদ মম্মন খাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ওস্তাদ চাঁদ খাঁ (১৯১১-১৯৮০) পাতিয়ালার রাজদরবারে প্রায় চব্বিশ বছর (১৯১৩–১৯৩৭) নিযুক্ত ছিলেন। পিতার কাছেই তাঁর শিক্ষা–দীক্ষা। ছোটবেলা থেকেই পিতার সঙ্গে তিনি সহযোগী শিল্পীরূপে নিয়মিত দরবারে যেতেন। সেই অভিজ্ঞতা তাঁর পরবর্তী জীবনে অত্যন্ত লাভদায়ক হয়েছিল। তিনি খেয়াল ও তারানা গানে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। আকাশবাণী এবং বিভিন্ন সংগীত সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে তিনি দেশজোড়া খ্যাতি অর্জন করেন। মহীশূর, বরোদা, গোয়ালিয়র, হায়দ্রাবাদ প্রভৃতি অনেক দরবারে তিনি সময়–সময় আমন্ত্রিত হয়েছেন। ১৯৩৭ সালে তিনি আকাশবাণীর দিল্লীকেন্দ্রে সংগীত তত্ত্বাবধায়করূপে নিযুক্ত হন। তাঁর রচিত পুস্তক *খেয়াল গায়কী কা ঘরানা* (উর্দূ সংস্করণ) প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য। তিনি অত্যন্ত সদাশয় ও ব্যক্তিত্বশালী শিল্পী ছিলেন। তাঁর শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে বিজয়লক্ষ্মী ও কমলসায়গল (স্বামী–স্ত্রী), ডা. কৃষ্ণা চক্রবর্তী, শংকর–শম্ভু কাওয়াল (বম্বে), ইকবাল বানু (পাকিস্তান) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।"[৩]

দিল্লী ঘরানার এত গুণী শিল্পী থাকা সত্ত্বেও এবং দিল্লী একটি সুপ্রাচীন ও বিখ্যাত সংগীত কেন্দ্র হলেও এই ঘরানাকে অনেকেই স্বতন্ত্র ঘরানা বলে মনে করেন না। কারণ এই ঘরানার গায়নকৌশল বিভিন্ন ঘরানা দ্বারা প্রভাবিত, এর নিজস্ব কোন গায়ন পদ্ধতির তথ্য পাওয়া যায় না। তবে এই ঘরানার পালকি কে খেয়াল, নাল কে খেয়াল, সওয়ারী কে খেয়াল, সেহরে সহাগ কে খেয়াল, জাহাজী খেয়াল, খানাপুরী কে খেয়াল, ঝুলে কি তান, জোড়-তোড় কে তান প্রভৃতি অন্যকোন ঘরানায় শোনা যায় না বলে এই বংশের

উদীয়মান গায়কেরা মনে করেন। এই ঘরানার গায়কীতে লয়কারীর প্রতি তেমন গুরুত্ব না দিয়ে রাগমাধুর্যকে প্রাধান্য দেয়া হয়। আ–কার ও না-কার যুক্ত তালবদ্ধ আলাপ, বঢ়ত-ফিরতের সাথে বিচিত্র স্বরবিন্যাস, দ্রুত তান-সরগমযুক্ত সুন্দর ও চমকপদ বন্দিশ এই ঘরানার প্রধান সাংগীতিক বৈশিষ্ট্য।

দিল্লী ঘরানার বিখ্যাত সংগীতজ্ঞদের চিত্র:

ওস্তাদ তানরস খাঁ[৪]

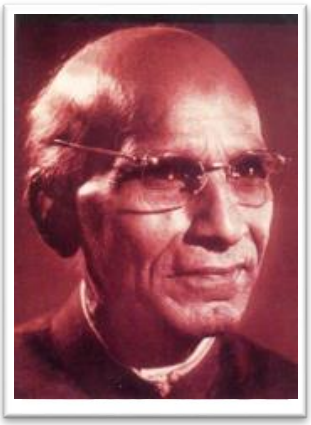

ওস্তাদ চাঁদ খাঁ[৫]

তথ্য ও চিত্রসূত্র

১) অমল দাশ শর্মা, *প্রাচীন ও নবীন সংগীতজ্ঞ এবং ঘরানার ইতিবৃত্ত*, দরবারী প্রকাশন, কলকাতা: ১৯৯৫

২) প্রাগুক্ত।

৩) প্রাগুক্ত, পৃ: ২২০-২২১

৪) https://www.thesufi.com/history-of-the-qawwal-bachchon-ka-gharana/

৫) http://harmonyom.blogspot.com/2011/05/ustad-chand-khan-and-dilli-gharana.html

কিরানা ঘরানা

প্রচলিত ঘরানাগুলোর মধ্যে কিরানা ঘরানা খেয়ালের একটি অপূর্ব মাধুর্যমন্ডিত গায়নরীতির ঘরানা নামে পরিচিত। প্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ আব্দুল করিম খাঁ ও আমীর খাঁকে এই ঘরানার বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত করলেও ঘরানার প্রবর্তকের নাম হিসাবে উল্লেখ পাওয়া যায় বন্দে আলী খাঁ'র নাম। এরকারণ হতে পারে যে কিরানা ঘরানার তিনটি শাখার উল্লেখ পাওয়া যায়। কেউ কেউ এই তিনটি শাখাকে সংক্ষিপ্ত করে কিরানা ঘরানাকে দুটি ভাগে বিভক্ত করে বিভিন্ন পুস্তকে উল্লেখ করেছেন।

কিরানা ঘরানার সূত্রপাতে প্রথমে বলতে হয় ওয়াজেদ আলীর পুত্র আব্দুল করিম খাঁ থেকে। আব্দুল করিম খাঁ-ই এই ঘরানার প্রধান গায়ক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর শিষ্য ছিলেন আব্দুল ওয়াহিদ, গনেশ চন্দ্র বেহরে, রামভাই কুন্দগোলকর (সওয়াই গান্ধর্ব), রোশনারা বেগম, সুরেশবাবু মানে, তারাবাঈ প্রমুখ।

দ্বিতীয় ঘরানার একটি ভাগ শুরু হয় আব্দুল ওয়াহিদ খাঁ থেকে। তাঁর শিষ্যা হীরাবাঈ এই ঘরানার বিস্তারলাভে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন। ভাস্কর রাও বুয়া, হীরাবাঈয়ের কন্যা তারাবাঈ ও পুত্র সুরেশবাবু মানে, ভীমসেন যোশী প্রভৃতি এই ঘরানার প্রতিষ্ঠিত গায়ক ছিলেন।

আরেকটি কিরানা ঘরানা শোনা যায় বন্দে আলী খাঁ থেকে। বন্দে আলীর শিষ্যদের মধ্যে ভাইয়াসাহেব গনপতরাও ও তার ভাই বলবন্ত রাও, চুন্না বাঈ, জোহরা বাঈ, আব্দুল আজিজ খাঁ (বিচিত্র বীণা) ওয়াহিদ খাঁ (বীণকার), মঙ্গল খাঁ এবং তাঁর পুত্র মুরাদ খাঁ (সেতার) উল্লেখযোগ্য।

তবে এই ঘরানার ইতিহাস আরো প্রাচীন। ভারতের উত্তরপ্রদেশের শাহরানপুর জেলার কিরানা নগরে অনেক বিখ্যাত সংগীতজ্ঞের বাস ছিল। কথিত আছে যে, মোঘল বাদশাহ জাহাঙ্গীর (১৬০৫-১৬২৭) গোপাল নায়কের কয়েকজন শিষ্যকে কিরানা নামক স্থানে বসবাসের ব্যবস্থা করে দেন। তার মধ্যে বিখ্যাত ধ্রুপদী জ্ঞান সিংহ (জ্ঞান খাঁ) ছিলেন, যিনি মোঘলদের সময় ধর্মান্তরিত হন। এই জ্ঞান খাঁ'র বংশধরেরা পেশাদার যন্ত্রসংগীত শিল্পী ছিলেন যারা কিরানায় বসবাস করে সংগীতের প্রচার ও প্রসার করেন।[১]

১৮৩০ সালে কিরানা নগরে ওস্তাদ গোলাম জাফর খাঁ'র পুত্র বন্দে আলী খাঁ'র জন্ম হয়। তিনি ছিলেন ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বীণাবাদক এবং যন্ত্রসংগীতে কিরানা ঘরানার প্রবর্তক। তিনি একদিকে যেমন যন্ত্রসংগীতে অতুলনীয় ছিলেন তেমনি বিখ্যাত ছিলেন ধ্রুপদী হিসেবে । তাঁর প্রথম পত্নী ছিলেন গোয়ালিয়রের প্রসিদ্ধ গায়ক হদ্দু খাঁ'র কন্যা এবং দ্বিতীয় পত্নী ছিলেন চুন্না বাঈ। তিনি জয়পুর, গোয়ালিয়র, হায়দ্রাবাদ, পুনে, ইন্দোরসহ বিভিন্ন রাজ্যে বিভিন্ন সময় নিযুক্ত ছিলেন। সেইসময় খেয়ালী

শিল্পী হিসেবে তিনি পরিচিতি লাভ করেন এবং তার নিদর্শন স্বরূপ জানা যায় যে, একবার গোয়ালিয়রের মহারাজা মানসিংহ তাঁর সংগীতে এতটাই বিমোহিত হয়েছিলেন যে তাঁকে খুশীমত পুরস্কার প্রার্থনা করতে বলেন। তিনি কোনরূপ ভীত না হয়ে সংকোচহীন ভাবে সেই দরবারের সুন্দরী গায়িকা চুন্না বাঈকে প্রার্থনা করেন এবং এভাবেই তাঁর দ্বিতীয় বিবাহ হয়। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে মুরাদ আলী খাঁ (বীণা), চুন্না বাঈ (পত্নী), বলবন্ত রাও, আ্বদুল আজীজ খাঁ, আল্লাবন্দে খাঁ ও জাকির উদ্দিন খাঁ (জয়পুর), শাহ্মীর খাঁ (সারেঙ্গী) ওয়াহিদ খাঁ (বীণা), রজব আলী খাঁ, ভাইয়াসাহেব গনপতরাও, ইমদাদ খাঁ (সেতার), জোহরা বাঈ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। ১৮৯৫ সালের ২৭ জুলাই এই মহান শিল্পী মৃত্যু বরণ করেন। ইন্দোরের মহারাজা শিবাজীরাও হোলকরের নিকট তিনি অধিক সময়কাল অবস্থান করেন। মৃত্যুর পর পার্বতীপুরের পীর সাহেবের দরগায় তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। প্রতিবছর তাঁকে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য বহু সংগীতজ্ঞ সেই দরগায় সমবেত হন বলে অনেকেই বন্দে আলী খাঁকে ইন্দোর ঘরানার শিল্পী বলে মনে করেন। যেহেতু বীণাবাদন ইন্দোরের প্রধান পরম্পরা এবং ইন্দোরের অধিকাংশ সংগীতজ্ঞই তাঁর শিষ্য ছিলেন, তাই তাঁকে ইন্দোর ঘরানার উৎস বললে কোন অংশে ভুল হবে না।[২]

ভাইয়াসাহেব গনপতরাও ছিলেন গোয়ালিয়রের রাজা জয়াজীরাও সিন্ধিয়া ও সুবিখ্যাত নর্তকী চন্দ্রভাগা বাঈ এর সন্তান। তিনি ও তাঁর ভ্রাতা বলবন্ত রাও ছিলেন অসাধারণ সংগীত প্রতিভার অধিকারী। বন্দে আলী খাঁ'র এই শিষ্য ধ্রুপদ-ধামার গায়ক, অসাধারণ হারমোনিয়াম বাদক এবং ঠুমরী রচয়িতা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। শুধু ঠুমরী ও তৎজাতীয় হালকা গান তিনি হারমোনিয়ামে বাজাতেন। তাঁর শিষ্যের মধ্যে অত্রৌলীর হারমোনিয়াম বাদক বশীর খাঁ, বিষ্ণুপুরের গিরিজাশংকর চক্রবর্তী, গৌহর জান বাঈ, নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ'র বংশধর ও বিখ্যাত হারমোনিয়াম বাদক মির্জা নবাব সাহেব, মোতি বাঈ, গফুর খাঁ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

কিরানা ঘরানার যন্ত্রসংগীতের প্রবর্তক ওস্তাদ বন্দে আলী খাঁ'র আরেক শিষ্য ওস্তাদ রজব আলী খাঁ'র জন্ম হয় ১৮৭৪ সালের ৩ সেপ্টেম্বর মধ্যপ্রদেশের নরসিংহগড় নগরে। তিনি একদিকে যেমন গায়নে খ্যাতিবান ছিলেন তেমনি পারদর্শী ছিলেন বীণা ও জলতরঙ্গ বাদনে। শুরুতে তিনি পিতা মঙ্গল খাঁ'র কাছে সংগীতশিক্ষা গ্রহণ করেন। মঙ্গল খাঁ ছিলেন অত্যন্ত গুণী বীণা ও সেতারবাদক। পরবর্তীকালে তিনি বন্দে আলী খাঁ ও চুন্না বাঈ এর নিকট তালিম নেন। তাঁর সুমধুর কণ্ঠ ও শক্তিশালী গায়নশৈলীর জন্য তাঁকে সংগীত সম্রাট, সংগীত ভূষন, সংগীত মনোরঞ্জন ইত্যাদি উপাধিতে সম্মানিত করা হয়। কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীতে তাঁর শিষ্যের মধ্যে আমানত আলী খাঁ, বহরে বুয়া, কৃষ্ণরাও মজুমদার, কৃষ্ণ শংকর শুক্লা,

উমরা খাঁ, গনপৎরাও দেবাসকর, লতা মুঙ্গেশকরের নাম উল্লেখযোগ্য। ১৯৫৯ সালের ৮ জানুয়ারী দেবাস নগরে তাঁর মৃত্যু হয়।

কিরানা ঘরানার গুণীশিল্পী ওস্তাদ শকুর খাঁ (১৯০৮-১৯৭৫) ছিলেন একজন সুবিখ্যাত সারেঙ্গী বাদক। তাঁর পিতা গফুর খাঁ অত্যন্ত গুণী সারেঙ্গী বাদক এবং ভুপাল রাজদরবারে নিযুক্ত ছিলেন। পিতার নিকট প্রাথমিক শিক্ষালাভের পর তিনি ওয়াহিদ খাঁ'র কাছে তালিম নেন। তাঁর যোগ্য দুই পুত্র মশকুর আলী খাঁ (১৯৫০) ও মুবারক আলী খাঁ (১৯৫৪) যথাক্রমে কণ্ঠসংগীত ও সারেঙ্গীবাদনে অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন।

বিখ্যাত ধ্রুপদ গায়ক ও বীণাবাদক ওয়াহিদ খাঁ ১৯ শতকের প্রথমার্ধে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে তিনি ইন্দোরের মহারাজা শিবাজী রাও হেলকরের দরবারে সংগীতজ্ঞ ছিলেন। তাঁর তিন পুত্রের সকলেই ছিলেন বিখ্যাত। প্রথম পুত্র মজীদ খাঁ মুম্বাইয়ে অনেক যোগ্যশিষ্য তৈরি করেছেন, দ্বিতীয় পুত্র বিখ্যাত গায়ক লতিফ খাঁ ইন্দোরের রাজদরবারে সংগীতজ্ঞ হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন এবং কনিষ্ঠ পুত্র সজ্জন খাঁ ছিলেন সুবিখ্যাত সেতারবাদক। তান ও স্বরবিন্যাসে 'খণ্ডমেরু' রীতি প্রয়োগ করে তিনি একটি সুকঠিন গায়নশৈলীর প্রবর্তন করেন। খণ্ডমেরু প্রক্রিয়ার গায়নশৈলীতে আব্দুল ওয়াহিদ খাঁ ছিলেন একজন শ্রেষ্ঠ গায়ক। তাঁর শিষ্যের মধ্যে বেগম আখতার, হীরাবাঈ বড়দেকর, প্রাণনাথ, সুরেশ বাবু মানে, শকুর খাঁ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। ১৯৪৯ সালে এই মহান শিল্পী মৃত্যুবরণ করেন।

মহারাষ্ট্রের অকোলা নগরে ১৯২২ সালের এপ্রিল মাসে কিরানা ঘরানার বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ ওস্তাদ আমীর খাঁ জন্মগ্রহণ করেন। পিতা শাহমীর খাঁ (শম্মু খাঁ) ছিলেন অতুলনীয় সারেঙ্গীবাদক এবং উৎকৃষ্ট গায়ক। আমীর খাঁ ছিলেন অত্যন্ত সুমধুর কণ্ঠের অধিকারী এবং তাঁর গায়কী ছিল অত্যন্ত শান্ত ও গম্ভীর প্রকৃতির। লয়কারী নিয়ে তবলার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া তিনি অপছন্দ করতেন বলে বিলম্বিত লয়ই তাঁর অধিক প্রিয় ছিল। শুরুতে আমীর খাঁ পিতার নিকট সারেঙ্গী বাদনে তালিম নেন। তবে গায়করূপে আত্মপ্রকাশের পেছনে কথিত আছে যে আমীর খাঁ'র পিতা শাহমীর খাঁ একবার তাঁর এক শিষ্যের অহংকারী আচরণে রুষ্ট হয়ে আমীর খাঁকে গোপনে সংগীতশিক্ষা দেন এবং কিছুদিন পর এক সংগীতসভায় পুত্র আমীর খাঁ-কে গায়ন এবং সেই শিষ্যকে সারেঙ্গী বাজাতে বলেন। আমীর খাঁ'র সংগীতে নানাবিধ পাল্টা এবং জটিল স্বরবিন্যাসের সাথে সেই শিষ্য সারেঙ্গী বাদনে ব্যর্থ হন। আর এরপর থেকেই আমীর খাঁ গায়করূপে আত্মপ্রকাশ করেন। আমীর খাঁ'র গায়কীতে আব্দুল ওয়াহিদ খাঁ'র গায়কীর বিশেষ ছাপ ছিল। ওয়াহিদ খাঁ'র কাছে তালিম না নিলেও তাঁর গায়কী অনুসরণ করেছেন এবং আমীর খাঁ-ই এই গায়কী রক্ষা করবেন বলে ওয়াহিদ খাঁ মন্তব্য করে গেছেন। ওস্তাদ আমীর খাঁকে ১৯৬৭ সালে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার ও ১৯৭১ সালে

পদ্মভূষণ উপাধিতে সম্মানিত করা হয়। জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি কলকাতায় অতিবাহিত করেন এবং ১৯৭৩ সালের ৩১ ডিসেম্বর এক মোটর দূর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে পণ্ডিত, অমরনাথ, এ.টি.কানন, কমল ব্যানার্জী, সুরেন্দ্র সিংহ, তেজপাল সিংহ, মনীর খাঁ (সারেঙ্গী), মুকুন্দ গোস্বামী প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

স্বনামধন্য গায়ক এবং কিরানা গায়নশৈলীর প্রবর্তক আব্দুল করিম খাঁ (১৮৭২-১৯৩৭) কিরানায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তাঁর অসাধারণ সংগীত প্রতিভা, সুরেলা সুচিকন কণ্ঠ এবং আবেগময় গায়কী দিয়ে একটি ভিন্ন গায়নশৈলী প্রবর্তন করেছিলেন। তাঁর গায়কীতে তিনি স্বরকে বেশি প্রাধান্য দিতেন। লয়কারী বা ছন্দের কাজ তাঁর কাছে ছিল গৌন। অতিসুক্ষ্ম কারুকার্য ও স্বরের শুদ্ধতা ছিল তাঁর গায়কীর বৈশিষ্ট। পরিবারে সংগীতশিক্ষার পর ১১ বছর বয়সে (ভিন্ন মতে ৯ বছর) তিনি প্রথম প্রকাশ্য সভায় সংগীত পরিবেশন করেন। সাথে ছিল সহোদর লতিফ। এই দুই সহোদর মুলতানী ও পূরবী রাগে তান সরগম গেয়ে অত্যন্ত প্রশংসিত হন। খুব অল্পবয়সেই তিনি সমগ্র ভারতে খ্যাতি অর্জন করেন। পুনেতে আর্য সংগীত বিদ্যালয় এবং মুম্বাইয়ে স্বরস্বতী সংগীত বিদ্যালয় নামক দুটি সংগীত বিদ্যালয় স্থাপন করেন যেখানে তাঁর অনেক শিষ্য তৈরি হয়। কারণ এই দুটি বিদ্যালয়েই গুরুকুল শিক্ষা পদ্ধতিতে তালিম দেওয়া হত। শোনা যায় যে, এইসকল শিষ্যদের থাকা খাওয়ার খরচও তিনি বহন করতেন এবং নিজে হল ভাড়া করে শিষ্যদের সেখানে গাওয়াতেন। আব্দুল করিম খাঁ'র আধ্যাত্মিক জীবনও ছিল অনেক উন্নতস্তরের তাই তিনি হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে কখনো ভেদাভেদ করতেন না। অন্যধর্মের ধর্মীয় সংগীতও তিনি গাইতেন। সুর ও শ্রুতির উপর তাঁর অত্যন্ত দখল ছিল। তাঁর গায়কী বিশ্লেষণ করলে প্রথমেই আসে তাঁর বাঁশীর মত কণ্ঠস্বর। তার সপ্তকে তাঁর আওয়াজ ছিল অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। বিলম্বিত খেয়ালে তিনিই প্রথম রাগবিস্তারের প্রচলন করেন বলে কেউ কেউ মনে করেন। মধ্যসপ্তকে নীচের দিকে আওয়াজ লাগানোর সময় তিনি অ বা হ বর্ণের প্রয়োগ করতেন এবং বাকী সবটাই করতেন বোলবিস্তার। শুদ্ধ ও সুমধুর ভাবে তিনি সংস্কৃত মন্ত্র পাঠ করতে পারতেন বলে বিভিন্ন মন্দিরে মন্ত্রপাঠের জন্য তিনি সমাদৃত ছিলেন। ওস্তাদ আব্দুল করিম খাঁ'র অসংখ্য যোগ্য শিষ্যের মধ্যে বালকৃষ্ণ বুয়া, কপিলেশ্বরী, বহরে বুয়া, মধুসুদন আচার্য, রোশনারা বেগম, শংকর রাও সরনায়ক, সুরেশ বাবু মানে (পুত্র), সওয়াই গান্ধর্ব, বিশ্বনাথ বুয়া প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।[৩]

আব্দুর রহমান খাঁ (১৯০২-১৯৫৩) ছিলেন কিরানা ঘরানার আরেক দিকপাল শিল্পী যিনি সুরেশ বাবু মানে নামেই অধিক পরিচিত ছিলেন। সুরেশ বাবু মানে ছিলেন ওস্তাদ আব্দুল করিম খাঁ ও তারা বাঈ-এর জ্যেষ্ঠ পুত্র। পিতা ও ওয়াহিদ খাঁ'র নিকট তিনি সংগীতশিক্ষা লাভ করেন। কিরানা ঘরানার গায়নশৈলীর প্রবর্তক

ও ভারতের অন্যতম প্রসিদ্ধ শিল্পীর পুত্র হওয়া সত্ত্বেও তাঁর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু লেখা পাওয়া যায় না। সুরেশ বাবু মানে নীরবে এবং নেপথ্যে সংগীত শিক্ষাদান করেই জীবন ব্যতীত করেন। তাঁর শিষ্যের মধ্যে বাসবরাজ গুরু, মানিক ভর্মা, ড. প্রভা আত্রে, ভীমসেন যোশী, মেনকা শিরোদকর, বসন্তরাও দেশপাণ্ডে, হীরাবাঈ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। ওস্তাদ আব্দুল করিম খাঁ'র দ্বিতীয় সন্তান সুবিখ্যাত গায়িকা হীরাবাঈ বড়দেকর সংগীতে অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁর গায়নশৈলীতে পিতার ছাপ থাকলেও তিনি আব্দুল করিম খাঁ'র নিকট সংগীতে তালিম পাননি। হীরাবাঈ অধিকাংশ তালিম পেয়েছিলেন ওয়াহিদ খাঁ'র নিকট। তাঁর কনিষ্ঠা ভগ্নি সরস্বতী বাঈ রানের সাথে তিনি যুগলবন্দী গাইতেন। তিনি অনেক সম্মানে ভূষিত হয়েছেন এবং অসংখ্য শিষ্য রেখে গেছেন।

কিরানা ঘরানার আরেকজন প্রসিদ্ধ গায়িকা ছিলেন বেগম আখতার। ১৯১৪ সালের ৭ অক্টোবর ভারতের উত্তরপ্রদেশের ফৈজাবাদ নগরে তাঁর জন্ম। মাতার নিকট সংগীতশিক্ষার শুরু হলেও পরবর্তী কালে ইমদাদ খাঁ, পাতিয়ালার আতা খাঁ এবং আব্দুল ওয়াহিদ খাঁ-র নিকট তালিম নেন। ঠুমরী ও প্রসিদ্ধ গজল গায়িকা হিসেবে তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। বাংলা ও উর্দূ ভাষায় তাঁর অসংখ্য রেকর্ড রয়েছে। ১৯৭৪ সালের ৩০ অক্টোবর আহমেদাবাদে তাঁর মৃত্যু হয় এবং মৃত্যুর পর তাকে পদ্মভূষণ উপাধিতে সম্মানিত করা হয়।

বেগম আখতারের সমসাময়িক কিরানা ঘরানার আরেকজন খ্যাতিনামা গায়িকা রোশনারা বেগম ১৯২২ সালে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। সংগীতে অসাধারণ প্রতিভা দেখে তাঁর পিতা আব্দুল হক তাঁকে চাচা আব্দুল করিমের কাছে তালিম নিতে পাঠান এবং খুব অল্পসময়েই রোশনারা বেগম খ্যাতি অর্জন করেন। দেশ বিভাগের পর ১৯৪৮ সালে রোশনারা বেগম পাকিস্তানে চলে যান এবং ১৯৮২ সালে করাচীতে তাঁর মৃত্যু হয়।

আব্দুল করিম খাঁ'র সর্বাধিক প্রিয় শিষ্য বালকৃষ্ণ বুয়া কপিলেশ্বরী কিরানা ঘরানার অত্যন্ত গুণী গায়ক এবং খ্যাতিমান লেখক ছিলেন। কথিত আছে ওস্তাদ আব্দুল করিম খাঁ তাঁকেই কিরানা ঘরানার প্রতিভূরূপে ঘোষণা করেছিলেন অর্থাৎ কপিলেশ্বরকেই খিলাফৎ দিয়ে সর্বসমক্ষে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছিলেন। ১৯৭২ সালে তিনি ওস্তাদ আব্দুল করিম খাঁ'র উপর মারাঠি ভাষায় একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ রচনা করেন। তবে তাঁকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করলেও ওস্তাদ আব্দুল করিম খাঁ'র গায়কীকে বাঁচিয়ে রাখার সবচেয়ে বেশি কৃতিত্বের অধিকারী কিরানা ঘরানার সুবিখ্যাত গায়ক ও অভিনেতা সওয়াই গান্ধর্ব (১৮৭৫-১৯৪২)। তাঁর প্রকৃত নাম রামভাও কুন্দগোলকর। তৎকালীন মারাঠী মঞ্চের এই শ্রেষ্ঠ অভিনেতার একদিকে যেমন ছিল অসাধারণ নাট্যপ্রতিভা অন্যদিকে তিনি ছিলেন অত্যন্ত মিষ্টি কণ্ঠের অধিকারী। কিরানা ঘরানার গায়করূপে

অধিক পরিচিত হলেও অন্যান্য ঘরানার গায়কী সম্বন্ধেও তাঁর বিশদ জ্ঞান ছিল। তিনি বিভিন্ন শিল্পীর গায়নশৈলী আয়ত্ত করে নিজস্ব একটি গায়নশৈলী তৈরি করেছিলেন। তাঁর শিষ্যের মধ্যে ফিরোজদস্তুর, ভীমসেন যোশী, গাঙ্গুবাঈ হাঙ্গল, সরস্বীতবাঈ রানে, ড. দেশপাণ্ডে প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। ফিরোজ দস্তুর ব্যতীত তাঁর শিষ্যের মধ্যে পণ্ডিত ভীমসেন যোশী বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গায়করূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।[৪]

কিরানা ঘরানার নামকরণ অঞ্চলের নামানুসারেই রাখা হয়েছে। এই ঘরানার যন্ত্র ও কণ্ঠ উভয় সংগীতের চর্চা একসাথে হত। কিরানা ঘরানার গায়নশৈলী প্রধানত আলাপ প্রধান। কেউ কেউ খণ্ডমেরু রীতিতে স্বরবিন্যাস করতেন। কিরানা ঘরানার এই পদ্ধতি অন্যান্য ঘরানার শিল্পীদেরও প্রভাবিত করেছিল। এই ঘরানায় স্বরের শুদ্ধতার উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়। মীড়, কণ প্রভৃতি সহযোগে স্বর বিস্তার করা হয়। এই ঘরানায় বিলম্বিত ও দ্রুত খেয়ালের বন্দিশ সংক্ষিপ্ত ও স্পষ্টরূপে গাওয়া হয়। বিলম্বিত খেয়ালের গতি অপেক্ষাকৃত ধীর থাকে। তান, বোলতান, সরগম প্রভৃতি সুব্যবস্থিত রূপে গাওয়া হয়। এই ঘরানার দ্রুত খেয়াল সাধারণত ঠুমরী অঙ্গের হয়। কিরানা ঘরানার শিল্পীরা তাই ঠুমরী গায়নে অত্যন্ত পারদর্শী হয়ে থাকে। আবেগময় ও কোমল সুরের গায়কীর জন্য কিরানা ঘরানা অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জনে সক্ষম হয়েছে।

কিরানা ঘরানার বিখ্যাত সংগীতজ্ঞদের চিত্রঃ

ওস্তাদ আব্দুল করিম খাঁ [৫]

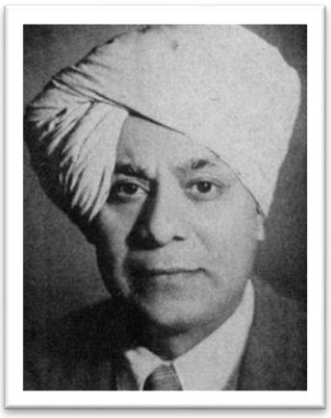

সওয়াই গান্ধর্ব [৬]

ওস্তাদ আমীর খাঁ [৭]

গাঙ্গুবাই হাঙ্গাল [৮]

পণ্ডিত ভীমসেন যোশী [৯]

বেগম আক্তার [১০]

তথ্য ও চিত্রসূত্র

১) দিলীপ কুমার মুখোপাধ্যায়, *ভারতীয় সংগীতে ঘরানার ইতিহাস*, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী প্রা:লি:, কলকাতা; ১৩৮৪

২) অমল দাশ শর্মা, *প্রাচীন ও নবীন সংগীতজ্ঞ এবং ঘরানার ইতিবৃত্ত*, দরবারী প্রকাশন, কলকাতা:১৯৯৫

৩) কুমার প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, *কুদরত রঙ্গি বিরঙ্গী*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলিকাতা: ১৪০২

৪) অমল দাশ শর্মা, *প্রাচীন ও নবীন সংগীতজ্ঞ এবং ঘরানার ইতিবৃত্ত*, দরবারী প্রকাশন, কলকাতা:১৯৯৫

৫) https://en.wikipedia.org/wiki/Abdul_Karim_Khan#/media/File:Abdul_Karim_Khan.jpg

৬) https://en.wikipedia.org/wiki/Sawai_Gandharva#/media/File:SawaiGandharva.jpg

৭) https://www.thehindu.com/features/friday-review/ustad-and-the-world-of-gharanas/article7535908.ece
৮) https://en.wikipedia.org/wiki/Gangubai_Hangal#/media/File:Gangubai_Hangal.jpg
৯) https://en.wikipedia.org/wiki/Bhimsen_Joshi#/media/File:Pandit_Bhimsen_Joshi_(cropped).jpg
১০) https://www.dayafterindia.com/2017/10/07/google-remembers-begum-ak htar-doodle/

ভিন্ডীবাজার ঘরানা

ভিন্ডীবাজার ঘরানার প্রতিনিধি মূলত মুরাদাবাদ জেলার বিজনৌর এলাকার অধিবাসী ছিলেন। ওস্তাদ দিলাওয়ার খাঁ'র তিনপুত্র- ছজ্জু খাঁ, নজীর খাঁ, এবং খাদিম হুসেন খাঁ ১৮৮০ সালের দিকে মুম্বাইয়ের ভিন্ডীবাজার এলাকায় এসে বসবাস শুরু করেন। তাঁর আরেক পুত্র বিলায়েত হুসেন খাঁ ভিন্ডীবাজার এলাকার বড় ব্যবসায়ী ছিলেন।

"সে সময়ে মুম্বাইয়ের ব্যবসা কেন্দ্র ছিল ফোর্ট এলাকা। আর ভিন্ডীবাজার এলাকা ফোর্টের পিছনে অবস্থিত ছিল। তাই ইংরেজরা এই এলাকাকে 'Behind the Bazar' বলতো। পরবর্তী কালে ধীরে এই 'Behind the Bazar' অপভ্রংশ হয়ে ভিন্ডীবাজার এলাকা নামে পরিচিত হয়ে যায়। আর এই তিন ভাই ভিন্ডীবাজার এলাকায় অবস্থান করার কারণে ভিন্ডীবাজারওয়ালা গাইয়ে হিসেবে পরিচিতি লাভ করে।"[১]

ছজ্জু খা'র দুই পুত্র ফিদা আলী খাঁ ও অমান আলী খাঁ এবং নজীর খাঁ'র পুত্র মুবারাক আলী খাঁ অনেক উচ্চমানের সংগীতজ্ঞ ছিলেন। খাদেম হুসেনের পুত্র লায়েক আলী খাঁকে চুন্নু খাঁ নামেও জানা যায়।

এই ঘরানায় গায়ন ও সারেঙ্গী বাদন ছাড়াও তবলা ও পাখোয়াজ বাদনেও অনেক গুণীশিল্পী তৈরী হয় যারা পূরব অঙ্গ অনুসরণ করতেন। নজীর খাঁ গায়ন ও সারেঙ্গী উভয়ের জন্যই বিখ্যাত ছিলেন। পাখোয়াজে মেহবুবশাহ বারসী এবং তবলার জন্য দায়েম আলী খাঁ প্রসিদ্ধ ছিলেন। দায়েম আলী খাঁ'র পিতা জহুর খাঁ ইন্দোর মহারাজের দরবারে সারেঙ্গী বাজাতেন। ১৮৮০ সালের দিক মুম্বাই আসার পর এই ঘরানার অনেক শিষ্য তৈরী হয়। কথিত আছে, স্বয়ং পণ্ডিত ভাতখণ্ডেজী বন্দীশের স্বরলিপি নেওয়ার জন্য নজীর খা'র শিষ্যত্ব নেন এবং নজীর খাঁ স্বরলিপি পদ্ধতি শেখার জন্য পণ্ডিত ভাতখণ্ডেজী'র শিষ্যত্ব লাভ করেন। তবে এই তথ্য অনুমান ভিত্তিক। এর সত্যতা নিয়ে মতভেদ আছে।

বর্তমানে এই ঘরানার কৃতিত্ব যদি কাউকে দেওয়া হয় তিনি হলেন অমান আলী খাঁ। তিনি ছজ্জু খাঁ'র পুত্র। সৃষ্টিকর্তা তাঁকে এমন এক কল্পনা শক্তি প্রদান করেন যার দরুন এক নতুন গায়কীর জন্ম হয় এবং এই অপূর্ব গায়কীই একটি পরম্পরা হয়ে যায়। অমান আলী খাঁ বহু বছর ধ্রুপদ ধামারের শিক্ষা গ্রহণ করেন তাঁর পিতা ছজ্জু খাঁ ও চাচা নজীর খাঁ এবং খাদিম হুসেন খাঁ'র কাছ থেকে। তিনি এইসকল গুরুর গায়কীর সুন্দর মিশ্রণকে কাজে লাগান এবং অধ্যবসায়ের মাধ্যমে তাঁর নিজ গায়কীকে আরো সুমধুর, কায়দেদার ও মনোরম করে তোলেন। অমান আলী খাঁ দক্ষিণ ভারতে কিছু সময় অবস্থান করেন এবং সেইসময় তিনি কর্ণাটকী সংগীতদ্বারা বেশ প্রভাবিত হন। দক্ষিণ ভারতীয় সংগীতের সৌন্দর্য ও তত্ত্ব গ্রহণ

করে তিনি হিন্দুস্থানী সংগীতে এক ভিন্ন গায়নশৈলীর উপহার দেন। কর্ণাটকী সংগীতের অনেক রাগে বন্দিশ বানিয়ে তিনি তা উত্তর ভারতীয় সংগীতপদ্ধতিতে প্রয়োগ করেন। যেমন ঃ রাগ হংসধ্বনি, প্রতাপ বরালী ইত্যাদি। কর্ণাটকী রাগে তাঁর অপূর্ব রচনা বিদ্যমান। সাহিত্যের দৃষ্টিতে অমান আলী খাঁ'র রচনা খুবই উচ্চমানের বলে বিবেচিত। তাঁর সৃষ্ট বন্দিশে হিন্দু দেবতাদের বর্ণনার আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। পিতা ছজ্জু খাঁ'র উপনাম 'অমরশাহ' নিয়েও অমান আলী খাঁ অনেক বন্দিশ রচনা করেন। যেমনঃ-

রাগ: ভৈরব

তাল: একতাল

স্থায়ী : অব কাম কীজে ভগবন্ত বলবন্ত দাতা দয়াণী

অন্তরা : তু হী দীন তু দয়াল, তু আকাশ তু পাতাল,

তু হী রূপ জাগতার 'অমর' গুন জ্ঞানী-অব।[২]

এই ঘরানার ইতিহাসে পাওয়া যায় যে অনেকে এই ঘরানাকে অমান আলী ঘরানা নামে সম্বোধন করতো। কিন্তু আবার এর মতভেদকারীদের ভাষ্যমতে যেহেতু অমান আলী খাঁ'র পূর্বে থেকেই এই ঘরানা বিদ্যমান তাই একে ভিন্ডীবাজার ঘরানা বলাই শ্রেয়। কারণ ঘরানা একটি শৈলী থেকে নির্মিত যার অনুকরণ শিষ্যরা করে এবং ধীরে ধীরে ঐ শৈলীই একটি পরম্পরায় রূপান্তরিত হয়। ১৯৫৩ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি অমান আলী খাঁ মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে মোহম্মদ হোসেন খাঁ, মান্না দে, লতা মুঙ্গেস্কর, নিসার বাজমী, ওয়ালী আহম্মেদ খাঁ, পণ্ডিত শিবকুমার শুক্লা প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। ভিন্ডীবাজার ঘরানার আরেক গুণী ছিলেন অঞ্জনী বাঈ মালপেকর। নজীর খাঁ'র এই শিষ্যা অনেককে মার্গদর্শন দিয়েছেন যার মধ্যে রয়েছে- কুমার গান্ধর্ব, পণ্ডিত টি. ডী. জোনোরীকর ও কিশোরী অমনকর। ১৯৭৪ সালে অঞ্জনী বাঈ মৃত্যুবরণ করেন।[৩]

ভিন্ডীবাজার ঘরানার উল্লেখযোগ্য সাংগীতিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে সরগম পদ্ধতি এই ধারার গায়কীর একটি বিশেষ গুণ। একবার সরগম আরম্ভ হলে শ্রোতারা মন্ত্রমুগ্ধের মত শোনেন । সরগমে এতবেশী নতুনত্ব থাকে যে শ্রোতারা কখনোই বিরক্তিবোধ করেন না। এই ঘরানার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল 'বড়ত' পদ্ধতি। প্রত্যেক স্বর কে অন্য স্বরের সাথে মীড়ের মাধ্যমে সংযুক্ত করা বা সম-এ আসার প্রক্রিয়া অত্যন্ত আকর্ষনীয়। যেভাবে আলাপ ও তান করা হয় ঠিক একইভাবে বন্দিশের মুখড়াও গাওয়া হয়। অত্রৌলী ঘরানাতেও বন্দিশের মুখড়া একদম মেপে করা হয় কিন্তু তা গায়কী অঙ্গ থেকে কখনো আলাদা হয়না। অন্যদিকে এই ঘরানার মুখড়া গায়কীর সাথে সাথে পরিবর্তিত হতে থাকে। ফলস্বরূপ এইশৈলীতে একটি আলাদা বৈশিষ্ট্য চলে আসে।

এই ঘরানায় তান করার প্রক্রিয়াকে 'খণ্ডমেরু' বলা হয়ে থাকে। এটি একটি গাণিতিক সাংগীতিক তত্ত্ব। একই স্বর দুবার ব্যবহার না করে দুই, তিন, চার এই প্রকার স্বরসমূহ নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন স্বরসমূহ তৈরী করার পদ্ধতিকে খণ্ডমেরু বা মেরুখণ্ড বলে। এই পদ্ধতিতে প্রত্যেকটি স্বরের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। যে সংখ্যায় পার্থক্য দেখানো হবে সেই সংখ্যাকে তার এক এক কম সংখ্যা নিয়ে সব গুন করলে তা সঠিকভাবে মিলে যায়। যেমন: ৫ স্বরের ভেদ এই রকম হয়ে থাকে : ৫x৪x৩x২x১= ১২০। এভাবে ৫ টি স্বরের ১২০ রকমের তান বানানোর প্রক্রিয়া এই ঘরানায় লক্ষ্য করা যায়। এই ঘরানার পুরানো ওস্তাদ যারা লেখাপড়া জানতেন না তাঁরা তাঁদের শিষ্যদের এইসকল ভেদ একপ্রকার মুখস্থ করাতেন। বিভিন্ন প্রকারের লয়কারী, বোলকে ভিন্ন ভিন্ন লয়ে গাওয়া এই ঘরানার একটি বৈশিষ্ট্য। দীপচন্দী, ঝাঁপতাল, রূপক ইত্যাদি তাল ব্যবহারের শুরু এই ঘরানা থেকেই হয়েছে বলে মনে করা হয়।[৪]

ধ্রুপদ-ধামার, বন্দিশে বোলের ব্যবহার, মুখড়া, মীড় ইত্যাদি বিষয়ে এই ঘরানার গায়কেরা অনেক দক্ষ হয়ে থাকেন। এক স্বর থেকে অন্য স্বরে মীড়ের ব্যবহার অত্যন্ত মধুরভাবে করা হয়। তানের ক্ষেত্রে প্রথমে ছোট ছোট তান, এরপর ধীরে ধীরে তা বাড়ানো হয়ে থাকে। তানে- খটকা, গমক ইত্যাদি প্রয়োগ করা হয়। এই ঘরানার গায়কীতে লয়ের গতি পরিবর্তন করা হয়। বোল, আলাপ, সরগাম, তান ইত্যাদিতেও লয়ের পরিবর্তন লক্ষণীয়।

রাগের প্রকৃতি ভেদে এক একটি রাগের চলন একেক রকম হয়ে থাকে। রাগে স্বরের প্রয়োগ, কণ্ঠের ব্যবহার, সপ্তকের সঠিক ব্যবহার রাগ পরিবেশনের সময় ইত্যাদি বিষয়ে সচেতন হওয়া খুবই জরুরি। ভিন্ডীবাজার ঘরানায় এইসকল বিষয়ের উপরে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয় বলে এই ঘরানায় গায়কী অন্যান্য ঘরানা থেকে পৃথক করা সহজ হয়।

ভিন্ডীবাজার ঘরানার বিখ্যাত সংগীতজ্ঞদের চিত্র:

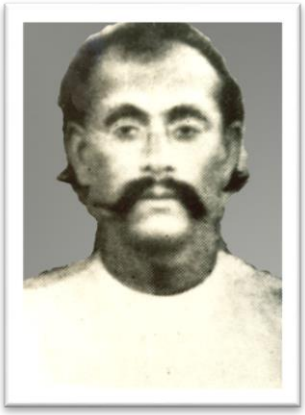

ওস্তাদ নজীর খাঁ [৫]

ওস্তাদ আমান আলী খাঁ [৬]

অঞ্জনী বাই মালপেকার [৭]

পণ্ডিত শিবকুমার শুক্লা [৮]

তথ্য ও চিত্রসূত্র

১) মুকেশ গর্গ সম্পাদিত, *'মাসিক সংগীত পত্রিকা'*, হাথরস: সংগীত কার্যালয়, কলকাতা: ২০০৬, পৃ: ১১

২) শন্নো খুরানা, *খেয়াল গায়কী মে বিবিধ ঘরানে*, নয়া দিল্লী: ১৯৯৫

৩) প্রাগুক্ত।

৪) প্রাগুক্ত।

৫) http://swaramandakini.com/photogallery.html

৬) http://swaramandakini.com/photogallery.html

৭) http://swaramandakini.com/photogallery.html

৮) http://swaramandakini.com/photogallery.html

পাতিয়ালা (পাটিয়ালা) ঘরানা

রাজা আলাসিংহের (মৃত: ১৭৬৫) সংগীতসভা থেকেই পাঞ্জাব বা পাতিয়ালা ঘরানার সূত্রপাত। পাতিয়ালা হরিয়ানা রাজ্যের মালোয়া শহরে অবস্থিত। যদিও রাজা আলা সিংহের সময়েই পাতিয়ালা ঘরানার সূত্রপাত তথাপি রাজা নরেন্দ্র সিংয়ের (১৮৪৫-১৮৬২) রাজত্বকাল খেয়াল গানের ঘরানার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সেইসময় আলী বক্স ও ফতে আলী খাঁ নামক দুই গুণীশিল্পী ছিলেন যারা পরবর্তী কালে আলীয়াফত্তু নামে পরিচিতি লাভ করে। এমনকি এই ঘরানাকেও আলীয়াফত্তু নামে অনেকে সম্বোধন করতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে এরা দুইজন ধর্মভাই এবং অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। তাঁদের নামের প্রথমাংশ জুড়েই এই নামকরণ করা হয়েছিল। আনন্দপুর নিবাসী রবাবী পরিবারের মিঞা কালুর পুত্র হলেন ওস্তাদ আলী বক্স এবং ফতে আলী ছিলেন তাঁর শিষ্য। কালু খাঁ তানরস খাঁ'র কাছে শিষ্যত্ব গ্রহণের পূর্বে বহরম খাঁ'র শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। বহরম খাঁ ছিলেন ষটশাস্ত্রী সংগীতজ্ঞ। কালু খাঁ পাতিয়ালা দরবারে নিযুক্ত হওয়ার পর তাঁর কাছেই আলীয়াফত্তুর প্রারম্ভিক শিক্ষা শুরু হয়। পরবর্তী কালে এরা গোয়ালিয়র গিয়ে হদ্দু খাঁ ও এরপরে তানরস খাঁ'র কাছে শিক্ষালাভ করেন। পাতিয়ালা রাজসভায় এই দুই গুণীশিল্পীর অতুলনীয় গায়কীর জন্য তাদের যথাক্রমে জেনারেল ও কর্নেল উপাধিতে সম্মানিত করা হয। মহারাজা রাজেন্দ্র সিংহের মৃত্যুর পরে এই দু'জন পাতিয়ালা ত্যাগ করে ফতে আলি খাঁ কাশ্মির দরবারে ও আলী বক্স জয়পুর দরবারে চলে যান।

আলিয়াফত্তু সাধনার মাধ্যমে তাঁদের আওয়াজে এক অন্যরকম মধুরতা নিয়ে আসে যা ছিল বিরল। তানরস খাঁ এই দুই মহান গায়ককে হসসু-হদ্দু খাঁ ও অচপলের বন্দিশ শেখান এবং সেই বন্দিশ তাঁরা টপ্পা অঙ্গে পরিবর্তন করে গান। যার দরুণ তাঁদের গায়কিতে এক নতুনত্ব আসে। আলীয়াফত্তু অনেক খেয়াল ও তারানা রচনা করেন। যার কিছু খেয়াল ছিল পাঞ্জাবী ভাষায়।

নবিজান খাঁ'র পুত্র মিঞা জান খাঁ (আলী বক্স এর ভাগিনেয়) তৎকালীন খেয়াল গায়কদের মধ্যে অত্যন্ত প্রতিভাবান ছিলেন। অসাধারণ দক্ষতার কারণে তিনি বিভিন্ন সময় পাতিয়ালা, বরোদা, টোংক, ইন্দোর ইত্যাদি রাজ্যের দরবারের নিযুক্ত ছিলেন।

পাতিয়ালা ঘরানার আরেক প্রতিভাবান গায়ক ছিলেন আহমদ জান খাঁ'র পুত্র ও মিয়াজান খার ভাতৃষ্পুত্র বাকর হুসেন খাঁ। তিনি খেয়াল ও তারানা গানে অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। পরিবারের সংগীত গুরুদের কাছেই তিনি তালিম নেন এবং আকাশবাণীসহ অন্যান্য অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে অত্যন্ত খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে দেবীদত্ত শর্মার নাম উল্লেখযোগ্য। দেবীদত্ত শর্মা ছিলেন কাশ্মিরী ব্রাহ্মণ সুখদয়াল

শর্মার পুত্র। সুখদয়াল শর্মা ধ্রুপদ গানের গুণীশিল্পী ছিলেন। পিতা ও বাকর হুসেন ব্যতিরেকে দেবীদত্ত শর্মা ও আশিক আলী খাঁ'র কাছেও তিনি সংগীতের আলিম নেন।

আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যখন পাঞ্জাবের কশুর গ্রামে ধ্রুপদের চর্চা তুঙ্গে ঠিক সেইসময়ে সেখানে জন্মগ্রহণ করেন ইরশাদ আলী খাঁ। তিনি অত্যন্ত গুণী ধ্রুপদী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন এবং মহারাজা রঞ্জিত সিংহের দরবারে গায়ক হিসেবে নিযুক্ত হন। তাঁর পুত্র ইদ্দা খাঁ খেয়াল তারানায় দক্ষ ছিলেন। ইদ্দা খাঁ'র জ্যেষ্ঠ পুত্র কালে খাঁর আরেক নাম ছিল মীরবক্স। "তিনি ২০ শতাব্দির অন্যতম শ্রেষ্ঠ সংগীতজ্ঞরূপে স্বীকৃত। তাঁর সুমধুর ও সাবলীল কণ্ঠস্বর তিন সপ্তকেই সহজ ও স্বচ্ছন্দ গতিতে লীলায়িত ছিল। ভারতবর্ষের অল্প কয়েকজন সংগীতজ্ঞের মধ্যে তিনি একজন ছিলেন, যিনি লরজদার তান প্রয়োগ করতে পারতেন। ভারতের বিভিন্নস্থানে তিনি উচ্চমর্যাদায় সংগীত পরিবেশন করেছেন। কিন্তু কোনদিন কোন রাজদরবারে নিযুক্ত হননি। তিনি মুক্ত ও স্বাধীন শিল্পীর অনিশ্চিত জীবনই গ্রহণ করেছেন। সেইদিনে কোন রাজ্যে আশ্রয়লাভ করতে না পারলে বেঁচে থাকা কঠিন ছিল। কেননা তৎকালীন সংগীতজ্ঞেরা অধিকাংশই ছিলেন অত্যন্ত গরিব। সংগীত ছাড়া উপার্জনের অন্যকোন যোগ্যতা তাঁদের ছিল না। অথচ তাঁদের মর্যাদাবোধ ছিল নবাব বাদশাহের মত। ইংরেজরা তখন প্রকাশ্যে সংঙ্গীতানুষ্ঠানের অনুমোদন করতেন না বরং প্রকারান্তরে বিরোধিতা করতেন। ফলস্বরূপ অনাহারে আর অচিকিৎসায় তাদের অকাল মৃত্যু ছিল অবশ্যম্ভাবী। কালে খাঁ'র মত মহাগুণীকেও তেমন মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল।"[১]

ইদ্দা খাঁ'র আরেকপুত্র ছিলেন ওস্তাদ আলী বক্স কসুরওয়ালে। তিনি ফতে আলী খাঁ ও আলী বক্স খাঁ ব্যতীত বংশীয় গুরুদের কাছে তালিম নেন। গায়ন ছাড়া তিনি দিলরুবা ও সারেঙ্গী বাদনে বিখ্যাত ছিলেন। তার জ্যেষ্ঠ পুত্র বড়ে গুলাম আলী খাঁ বিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ সংগীতজ্ঞদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। তাঁর জন্ম হয় ১৯০৩ সালে লাহোরে। আলী বক্স কসুরওয়ালের অন্য পুত্র বরকত আলী খাঁ, মুবারক আলী খাঁ ও আমান আলী খাঁ ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পরে পাকিস্তান চলে যান এবং সেখানে শিষ্যমণ্ডলী গঠন করেন। এঁরা সকলেই ঠুমরী ও গজল গানে পারদর্শী ছিলেন। পিতা আলী বক্স কসুরওয়ালে কিছুদিন পাকিস্তানে অবস্থানের পর ভারতে ফিরে আসেন। বড়ে গোলাম আলী খাঁ তাঁর চাচা কালে খাঁ'র কাছে দীর্ঘ দশ বছর তালিম নেন। তাঁর আওয়াজ ছিল সৃষ্টিকর্তা থেকে প্রাপ্ত এক অমূল্য উপহার। দরবারী কানাড়ার মত রাগ কিংবা কামোদের মত চঞ্চল প্রকৃতির রাগ হোক না কেন- সব রাগই তিনি খুব সহজভাবে গাইতেন। তাঁর তান ও সরগমের দক্ষতা ছিল অতুলনীয়। যেমন খেয়াল গাইতেন তেমনি ঠুমরী, দাদরা, গজল, টপ্পা, ভজন ইত্যাদি গানে পারদর্শী ছিলেন। পাঞ্জাবী, কাশ্মিরী, নেপালী, পূর্বী, সিন্ধী প্রভৃতি লোকসঙ্গীতের বিশাল ভাণ্ডার ছিলেন তিনি। "তখন সমস্ত ভারতবর্ষে তাঁর মত জনপ্রিয় গায়ক কালাকার

খুব বেশি ছিল না। অজস্র সংগীত সম্মেলন ও জাতীয় অনুষ্ঠানাদিতে অংশগ্রহণ ছাড়াও তিনি অসংখ্য রেকর্ড এবং 'বৈজু বাওরা', 'মুঘলে আজম' প্রভৃতি ছবিতে কণ্ঠদান করেছেন। তাঁর স্বরচিত ঠুমরী গানের রেকর্ডগুলি বহুদিন সঙ্গীতপ্রেমীদের আনন্দ দান করবে। তিনি সারেঙ্গী বাদনেও নিপুণ ছিলেন। এই বিষয়ে কটাক্ষের প্রতিবাদে তিনি দুঃখ করে বলেছেন যে, জীবিকা অর্জনের জন্য আমি সারেঙ্গীও বাজিয়েছি তবে কণ্ঠসংগীত সর্বদাই আমার প্রিয় ছিল।"[২] সারেঙ্গী বাজালেও তিনি গানের রেওয়াজের ক্ষেত্রে অত্যন্ত নিয়মিত ছিলেন। শোনা যায় নিদ্রা আর আহারের সময় ব্যতিরেকে সবসময়ই স্বরমণ্ডল তাঁর হাতে থাকত।

"গোলাম আলী খাঁ সাহেবের Voice Production, স্বরপ্রয়োগ ও তানের মূলতত্ত্ব ও নীতি ছিল- সম্পূর্ণ Tension এর অভাব। প্রত্যেক গাইয়েই জানেন, সামান্য চাপা উত্তেজনা বা সংশয় থাকলে গলার ভেতরকার পেশী টানটান হয়ে যায়। তারার গান্ধার কি মধ্যম লাগবে কি লাগবে না, এ-চিন্তা মনের মধ্যে উঁকি দিলে সে আর ঠিকভাবে লাগতে চায় না। যোগী পুরুষরা যেমন সারা শরীরের পেশীকে শিথিল করে দিতে পারেন, উনি সেইভাবে গান গাইতেন। সব গাইয়েকেই অল্পবিস্তর হাত-পা নাড়তে দেখেছি, জন কয়েককে দেখেছি যাদের অঙ্গভঙ্গি ও লম্বঝম্প তাঁদের সঙ্গীতেরই সমান খ্যাতিলাভ করেছে। গোলাম আলী খাঁকে গান গাইবার সময়ে মনে হত, যেন উনি বাথটবে সারা শরীর এলিয়ে দিয়ে গাইছেন। ক্রিকেটের পরিভাষায় এত Relaxed stance কারও দেখিনি। জ্ঞানবাবু একবার গল্প করেছিলেন, খাঁ সাহেব ওঁর ডিকসন লেনের বাড়ীতে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে আধশোয়া অবস্থান আছেন, নাপিত ক্ষুর দিয়ে ওঁর দাড়ি কামাচ্ছে, এই সময়ে ওঁর তান মারবার বাসনা হল। নাপিত অস্তুরা সরাবার চেষ্টা করতে উনি ইশারায় বারণ করে দু সপ্তকের সপাট মারতে লাগলেন; শরীর নড়ছে না, চোয়াল নড়ছে না, জিভও নড়ছে না। এদিকে ওর 'ডাবল চিনের' ওপর ক্ষুর চলছে!"[৩] তাঁর অসাধারণ প্রতিভার জন্য তিনি ভারত সরকার দ্বারা সংগীত নাটক একাডেমী পুরস্কার ও ১৯৬২ সালে পদ্মভূষণ উপাধি দ্বারা সম্মানিত হন। তবে মৃত্যুর আট বছর পূর্বে তিনি পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হন। এইসময় তাঁর গান গাওয়া বন্ধ হয়ে যায় যা ছিল তাঁর জন্য অত্যন্ত বেদনা ও পরিতাপের বিষয়। ১৯৬৮ সালের ২৩ এপ্রিল এই মহানশিল্পী মৃত্যুবরণ করেন। পরিবারের সদস্য ছাড়াও তিনি অনেক শিষ্য রেখে গেছেন। তাঁর শিষ্যের মধ্যে পারভীন সুলতানা, প্রভাতী মুখার্জী, প্রসূন ও মীরা ব্যানার্জি, আইরিন রায় চৌধুরী, শৈলেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি ও সন্ধ্যা মুখার্জী উল্লেখযোগ্য।

পারভীন সুলতানা পাতিয়ালা ঘরানার একজন দক্ষ সংগীতশিল্পী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। অসাধারণ সংগীত প্রতিভার অধিকারিনী এই গায়িকার জন্ম আসাম এর নওগাঁয়। প্রথমে পিতা ইক্রামল মজিদ খাঁ এবং পরবর্তী কালে চিন্ময় লাহিড়ী, ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলী খাঁ ও স্বামী দিলশাদ খাঁ'র কাছে

সংগীতে তালিম নেন। দেশ বিদেশের বহুস্থানে তিনি অত্যন্ত খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি সাড়েতিন সপ্তকে অত্যন্ত সাবলীল ভাবে বিচরণ করেন। খেয়াল, ঠুমরী, গজল সব অঙ্গেই তিনি পারদর্শী। মাত্র ২৫ বছর বয়সে পদ্মশ্রী পুরস্কার লাভ করায় তিনি সর্বকনিষ্ঠা পদ্মশ্রী হিসাবে পরিচিত। এছাড়াও গান্ধর্ব কলানিধি, তানসেন পুরস্কার, পোয়েটেস অব মিউজিক, ক্লিওপেট্রা অব মিউজিক ইত্যাদি পুরস্কার লাভ করেন।

বড়ে গোলাম আলী খাঁ'র আরেক শিষ্যা আইরিন রায় চৌধুরী ১৯৪৭ সালে পূর্ববঙ্গ থেকে কলকাতায় আসেন। ১৯৫৫ সালে আকাশবাণীর সর্বভারতীয় সংগীত প্রতিযোগীতায় খেয়াল ও ভজনে প্রথমস্থান অর্জন করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। খাঁ সাহেব ছাড়াও তিনি শ্রী জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, মইনুদ্দীন খাঁ ও আমিনুদ্দীন খাঁ'র কাছে সংগীতশিক্ষা লাভ করেন।

"ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলী খাঁ'র দুই পুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠ ওস্তাদ মুনাব্বর আলী খাঁ শুধু সংগীতচর্চা করতেন। ১৯৩২ সালে ১৫ই আগস্ট কলকাতায় তাঁর জন্ম হয়। ছোটবেলা থেকেই সংগীতশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে পিতার সহযোগী শিল্পী হিসেবেও তিনি অংশগ্রহণ করতেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি স্বাধীনভাবে অনুষ্ঠান আরম্ভ করেন তখন তাঁর সহযোগী শিল্পী হয় তার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজা আলী খাঁ (জন্ম ১৯৬০ সালের ৮ সেপ্টেম্বর)। আকাশবাণী, দূরদর্শন এবং বিভিন্ন সংগীত সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে তিনি খ্যাতিলাভ করেন। দুর্ভাগ্যবশত: ১৯৮৯ সালের ১৩ই অক্টোবর কলকাতায় হঠাৎ হৃদযন্ত্রে ক্রিয়া বন্ধ হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র শিকার আলী খাঁ (জন্ম ১৯৭১ সালের ২৫ শে নভেম্বর) লেখাপড়া এবং সংগীতচর্চা নিয়ে মগ্ন আছেন। তাঁর একমাত্র কন্যা ইরম বেগম অত্যন্ত প্রতিভাবান এবং সুমধুর কণ্ঠস্বরের অধিকারিণী কিন্তু পরিবারের মহিলাদের গাইবার রেওয়াজ না থাকায় তিনি অসহায়। খাঁ সাহেবের শিষ্যের মধ্যে আহম্মদ রজা খাঁ (বিচিত্র বীণা), নির্মল অরুণ, অজয় চক্রবর্তী, আরতি বাগচী ও নূপুর ঘোষ উল্লেখযোগ্য।"[৪]

পাতিয়ালা ঘরানার আরেক গুণী ও প্রতিভাবান শিল্পী হলেন পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তী। ১৯৫২ সালের ২৫ ডিসেম্বর কলকাতার নিকটবর্তী শ্যামনগরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। মুনাব্বর আলী খাঁ'র কাছে শিক্ষা গ্রহণ ব্যতীত তিনি পিতা অজিত চক্রবর্তী, পান্নালাল সামন্ত, কানাইদাস বৈরাগী, পণ্ডিত জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, নিবৃত্তি বুয়া সরনায়কের কাছেও সংগীতে তালিম নেন। সংগীতের পাশাপাশি তিনি লেখাপড়াতেও অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। এমএ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং জাতীয় ছাত্রবৃত্তি লাভ করে কলিকাতায় অবস্থিত সংগীত রিসার্চ একাডেমীর সর্বপ্রথম ফেলো নির্বাচিত হন। তাঁর সাবলীল গায়কী ও সংগীত নিয়ে বিভিন্ন গবেষণার কারণে তিনি বিদেশে গিয়ে অনেক খ্যাতি অর্জন করেন। বর্তমানে তিনি কলকাতার সংগীত রিসার্চ একাডেমীর অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত আছেন।

পাতিয়ালা ঘরানার গায়কীর মুল সাংগীতিক বৈশিষ্ট্য হলো: বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর, অপেক্ষাকৃত উচ্চস্থানে তান ও সরগম, স্বর মাধুর্য্য ও লয়কারী, ঠুমরী অঙ্গের বন্দিশ, গানের কথার সাহায্যে বঢ়ত-ফিরত, দ্রুত লয়ে সপাট তান, খেয়ালের লঘু চলন ইত্যাদি। এছাড়া পাতিয়ালা ঘরানার ঠুমরীঅঙ্গের বন্দিশ অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জনে সক্ষম হয়েছে। উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্যের কারণে পাতিয়ালা ঘরানা ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতের ঘরানাগুলোর মধ্যে একটি অন্যতম জনপ্রিয় ঘরানা হিসেবে বিবেচিত।

পাতিয়ালা ঘরানার বিখ্যাত সংগীতজ্ঞদের চিত্র:

ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলী খাঁ [৫]

ওস্তাদ বরকত আলী খাঁ [৬]

ওস্তাদ মুনাব্বর আলী খাঁ [৭]

ফরিদা খানম [৮]

পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তি [৯]

তথ্য ও চিত্রসূত্র

১) অমল দাশ শর্মা, *প্রাচীন ও নবীন সংগীতজ্ঞ এবং ঘরানার ইতিবৃত্ত*, দরবারী প্রকাশন, কলকাতা: ১৯৯৫, পৃ: ২২৬

২) প্রাগুক্ত পৃ: ২২৭

৩) কুমার প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, *কুদরত রঙ্গি বিরঙ্গী*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলিকাতা, ১লা বৈশাখ, ১৪০২, পৃ: ১১৮-১১৯

৪) অমল দাশ শর্মা, *প্রাচীন ও নবীন সংগীতজ্ঞ এবং ঘরানার ইতিবৃত্ত*, দরবারী প্রকাশন, কলকাতা: ১৯৯৫, পৃ: ২২৮

৫) https://en.wikipedia.org/wiki/Bade_Ghulam_Ali_Khan#/media/File:Ustad_Bade_Ghulam_Ali_Khan.jpg

৬) https://www.youtube.com/watch?v=1jdWO2vQeLQ

৭) https://www.veethi.com/india-people/munawar_ali_khan-photos-10509-83070.htm

৮) https://www.saavn.com/s/artist/farida-khanum-lbums/pQPoiMD8bfQ_

৯) https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e1/Ajoy_Chakra bart y_-_Kolkata_2015-12-4_2128.JPG

মেওয়াতী (মেবাতী) ঘরানা

উনিশ শতকে ভারতের যোধপুরে মেওয়াতী ঘরানার সূত্রপাত হয়। এর প্রতিষ্ঠা করেন ঘর্গে নজির খান। কণ্ঠসংগীত ও বাদ্যযন্ত্রের এই ঘরানা প্রথমত শুরু হয় পারিবারিক ভাবে, পরবর্তী কালে শিষ্যবর্গের মাধ্যমে এর বিস্তৃতি লাভ করে। প্রথম দিকে এর গায়কী ও স্বতন্ত্র নান্দনিক পরিবশেনার কারণে একে গোয়ালিয়র ঘরানার একটি শাখা মনে করা হলেও পরবর্তী কালে রাজস্থানের মেওয়াত অঞ্চলের নামানুসারে এর নাম দেয়া হয় মেওয়াতী। গোয়ালিয়র পরিবারের সদস্য ঘর্গে নজির খান তাঁর বংশীয় সংগীতজ্ঞদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রাজস্থানে চলে আসেন। বাদ্যযন্ত্রে পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়ার লক্ষ্যে তিনি রাজস্থানভিত্তিক সংগীতচর্চার প্রচার ও প্রসার শুরু করেন যা ছিল একটি স্বতন্ত্র শৈলী।

মেওয়াতী ঘরানার দুটি ঐতিহ্য- একটি কণ্ঠসংগীত অন্যটি বাদ্যযন্ত্র। এই ঘরানার মূখ্য দুই দিকপাল ওস্তাদ ঘর্গে নজির খান (কণ্ঠ) এবং তাঁর অগ্রজ বীণকার ওস্তাদ ওয়াহিদ খান সাহেব। ঘর্গে নজির খান নিঃসন্তান হওয়ায় ছোটভাই মুনাব্বর খানকে দত্তক পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেন। মুনাব্বর খানও নিঃসন্তান হওয়ার পরবর্তী সময়ে তিনিও অগ্রজ ওয়াহিদ খানের পুত্র গুলাম কাদির খানকে দত্তক নেন। গুলাম কাদির খান কণ্ঠসংগীতের পাশাপাশি একজন বীণকারও ছিলেন। কণ্ঠসংগীতে তিনি তার পরিবারের শেষ প্রতিনিধি হিসেবেও বিবেচিত।[২]

ঘর্গে নজির খানের দুই শিষ্য ছিলেন নাথুলাল ও চিমনলাল। তাঁরা দু'জনই বিখ্যাত যন্ত্রসংগীত শিল্পী ছিলেন। নাথুলাল তাঁর ভাতিজা পণ্ডিত মতিলালকে প্রশিক্ষণ দেন, যার পুত্র পণ্ডিত যশরাজ বর্তমানে মেওয়াতী কণ্ঠশিল্পের প্রতিনিধিত্ব করছেন।

কিরানা ঘরানার বিখ্যাত ওস্তাদ বন্দে আলী খানের শিষ্য ছিলেন ঘর্গে নজীর খানের অগ্রজ বীণকার ওস্তাদ ওয়াহিদ খান সাহেব। তাঁর পুত্র মজিদ খান, লতিফ খান ও হামিদ খানও পিতার অনুসরণে বিখ্যাত বীণকাররূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। আরেকপুত্র ওস্তাদ গোলাম কাদির খান প্রথমে বীণকার হিসেবে সংগীতজীবন শুরু করলেও পরবর্তী কালে চাচা মুনাব্বর খানের অনুপ্রেরণায় কণ্ঠসংগীতে আগ্রহী হন। ওয়াহিদ খানের নাতি মোহাম্মদ খান (বীণা, সেতার, সুরবাহার) ও মোহাম্মদ শফি (সেতার) এই ঘরানার যন্ত্রসংগীতের ঐতিহ্য অব্যাহত রাখেন। বর্তমানে এই ঘরানার চতুর্থ প্রজন্ম ওস্তাদ মোহাম্মদ খানের পুত্র ও শিষ্য বিশ্ববিখ্যাত সেতারবাদক ওস্তাদ রইস খান এবং তাঁর চাচাতো ভাই ও শিষ্য আরেক বিখ্যাত সেতারবাদক ওস্তাদ সিরাজ খান এই ঘরানার যন্ত্রসংগীতের

প্রতিনিধিত্ব করেছেন। রইস খানের পুত্র ফারহান খান এবং সিরাজ খানের পুত্র আসাদ খান ইতিমধ্যেই যোগ্য উত্তরাধিকারী হিসেবে প্রশংসিত হয়েছেন।

এ পর্যায়ে মেওয়াতী পরম্পরায় বিখ্যাত সংগীতজ্ঞদের সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:

ওস্তাদ ঘর্গে নাজির খান মেওয়াতী ঘরানার এক উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলেন। তাঁর জন্ম আনুমানিক ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে। যদিও অগ্রজ ওয়াহিদ খানসহ তাকে এই ঘরানার সহপ্রতিষ্ঠাতা বলা হয় তথাপি মেওয়াতী ঘরানা প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান ছিল শীর্ষে। তিনি কণ্ঠসংগীতের সাধনা করতেন। আর ওয়াহিদ খান ছিলেন বীণকার। তাই এই ঘরানা কণ্ঠ ও যন্ত্র উভয় দিকেই ছিল সমানভাবে বিখ্যাত। ওস্তাদ ঘর্গে নজির খান গোয়ালিয়র ঘরানার ছোটে মোহাম্মদ খান ও ওস্তাদ বড়ে মোহাম্মদ খানের পুত্র ওয়ারিস খানের শিষ্য ছিলেন। গোয়ালিয়র ঘরানার ওস্তাদদের দ্বারা প্রভাবিত হলেও ওস্তাদ ঘর্গে নাজির খান- চর্চা ও অনুশীলনের মাধ্যমে তাঁর এক স্বতন্ত্র গায়কী তৈরি করেন যা ছিল সব ঘরানা থেকে ভিন্ন। গোয়ালিয়র ঘরানার সাথে ঘর্গে নজির খানের পারিবারিক সম্পর্ক ছিল। তিনি ওস্তাদ হদ্দু খানের পৌত্রীকে বিবাহ করেন। অপরদিকে বিখ্যাত বীণকার বন্দে আলী বিবাহ করেন হদ্দু খানের কন্যাকে। ঘর্গে নজির খান ও বন্দে আলী অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন এবং একসঙ্গে অনেক সময় কাটান। বন্দে আলী ওয়াহিদ খানেরও শিক্ষক ছিলেন। যদিও বন্দে আলী কিরানা ঘরানার সংগীতজ্ঞ ছিলেন তথাপি তিনি ডাগর ঘরানার বীণকার ওস্তাদ বহ্‌রম খান সাহেবের শিষ্য থাকায় তাঁর সংগীত পরিবেশনায় ডাগর বাণীর প্রভাব পরিলক্ষিত হত এবং স্বভাবতই তার ঝলক মেওয়াতী ঘরানাতেও ছিল। তবে ঘর্গে নাজির খানের সংগীতে ডাগর ঘরানার প্রভাব কখনোই দেখা যায়নি। পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে ওস্তাদ ঘর্গে নাজির খান নিঃসন্তান ছিলেন এবং ছোট ভাই মুনাব্বর খানকে পুত্র হিসেবে লালন পালন করে সংগীতে তালিম দেন। তাঁর দুইজন শিষ্য পণ্ডিত নাথুলাল ও চিমনলাল বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ হিসেবে পরিচিত। পণ্ডিত নাথুলাল তাঁর ভাগ্নে পণ্ডিত মতিলালকে তালিম দেন যিনি প্রথমে কাশ্মির ও পরে হায়দ্রাবাদ কোর্টে সুরকার হিসেবে নিযুক্ত হন। পণ্ডিত মতিরামের পুত্র পণ্ডিত যশরাজ বর্তমান মেওয়াতী ঘরানার প্রতিনিধিত্ব করছেন। ওস্তাদ ঘর্গে নজির খান ১৯২০ সালে ভূপালে মৃত্যুবরণ করেন।[২]

ওস্তাদ ওয়াহিদ খান আনুমানিক ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে আলওয়ারের নিকটবর্তী মেওয়াতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁকে ওস্তাদ ঘর্গে নজির খানের সাথে এই ঘরানার সহপ্রতিষ্ঠাতা হিসেবে গণ্য করা হয়। তিনি একজন বিখ্যাত রুদ্রবীণার শিল্পী ও সংগীতজ্ঞ ছিলেন। ওস্তাদ বন্দে আলীর কাছে তালিম নেওয়ার সময় তিনি ধ্রুপদ ধামারের কৌশল আয়ত্তে অধিক আগ্রহী ছিলেন যা পরবর্তী কালে তাঁর

পরম্পরায় পরিলক্ষিত হয়। ওস্তাদ ওয়াহিদ খানের পাঁচ পুত্র ও এক কন্যা সন্তান যথাক্রমে: গোলাম কাদির খান, মজিদ খান, লতিফ খান, সাদ্দান খান ও হামিদ খান এবং কন্যা হাসিবান। সাদ্দান খান ব্যতীত আর চার পুত্র সুপরিচিত সংগীত শিল্পী হয়ে ওঠেন এবং বাদ্যযন্ত্রের ঐতিহ্য অব্যাহত রাখেন। এই চার জনের মধ্যে একমাত্র পুত্র ওস্তাদ গুলাম কাদির খান কণ্ঠ ও যন্ত্র উভয় সংগীতেই দক্ষতা অর্জন করেন। বর্তমানে ওয়াহিদ খানের দুই নাতি ওস্তাদ রইস খান ও ওস্তাদ সিরাজ খান এই পরম্পরার যন্ত্রসংগীতের ঐতিহ্যের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। ১৯৩৩ সালে ইন্দোরে এই মহান শিল্পী পরলোকগমন করেন।

ওস্তাদ মুনাব্বর খান ঘর্গে নজির খানের সর্বকনিষ্ঠ ভাই ও দত্তক পুত্র ছিলেন। তিনি রুদ্র বীণার পাশাপাশি কণ্ঠসংগীতেরও তালিম নেন। গুজরাটের সানন্দ প্রদেশের আদালতে তিনি সুরকার হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। সানন্দের রাজা শ্রী জয়ন্তরণ মালসিংজীকে রুদ্রবীণা ও কণ্ঠসংগীতে তালিম দেন। ওস্তাদ মুনাব্বার খান নিঃসন্তান ছিলেন। পরবর্তী কালে তিনি ভ্রাতৃস্পুত্র গুলাম কাদির খানকে দত্তকপুত্র হিসেবে গ্রহণ করেন।

ওস্তাদ ওয়াহিদ খানের পুত্র গুলাম কাদির খান ১৯১২ সালে ইন্দোরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পিতা ওয়াহিদ খানের কাছে রুদ্রবীণার তালিম নেন। পরবর্তী কালে চাচা মুনাব্বর খান তাঁকে দত্তক পুত্র হিসেবে গ্রহণ করেন। মুনাব্বর খান ভ্রাতৃস্পুত্রকে দত্তক নেওয়ার পরেই ভাই ওয়াহিদ খানকে অনুরোধ করেন গুলাম কাদিরকে রুদ্রবীণার তালিম না দেওয়ার জন্য যাতে তিনি মেওয়াতী ঘরানার কণ্ঠসংগীতের পরম্পরাকে অব্যাহত রাখতে পারেন। ওস্তাদ গুলাম কাদির খান মেওয়াতী ঘরানার একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব ছিলেন কারণ তিনি ছিলেন মেওয়াতী ঘরানার বংশধরদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি যিনি মেওয়াতী কণ্ঠসংগীতের ঘরানার প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তিনি একজন সুফি প্রকৃতির লোক ছিলেন। খ্যাতি বা অর্থের প্রতি তাঁর কোন মোহ ছিল না। ১৯২১ সালে মুম্বাইয়ে পণ্ডিত ভাতখণ্ডে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে গুলাম কাদির খান প্রথম সংগীত পরিবেশন করেন। ১৯৩১ সালে তিনি সানন্দ চলে আসেন এবং মুনাব্বর খান সাহেবের পরে তিনি সানন্দ রাজদরবারের সেবায় নিয়োজিত হয়ে সানন্দের রাজা জসওয়ান্ত সিংকে সংগীতের তালিম দেন। তিনি মুম্বাইয়ের ভারতীয় বিদ্যাভবনের সাথেও যুক্ত হন। ১৯৯৯-২০০০ সালে ওস্তাদ গুলাম কাদির খান 'গুজরাট গৌরব পুরস্কার' লাভ করেন। তিনি পৌত্র সিরাজ খান ও তাঁর পুত্র আসাদ খানকে শিক্ষাদান ব্যতীত অসংখ্য শিষ্য রেখে গেছেন। ২০০২ সালে ভারতের রাজকোটে এই মহান শিল্পী পরলোক গমন করেন।

ওস্তাদ মজিদ খান (জন্ম: ১৮৫৯) ছিলেন ওস্তাদ ওয়াহিদ খানের জ্যেষ্ঠ পুত্র। তিনি সেতার ও রুদ্রবীণার শিল্পী ছিলেন। মুম্বাইয়ের অনেক সুপরিচিত পরিবারকে তিনি শিক্ষাদান করেন। তাঁর ভাগ্নে মোহাম্মদ খানও তাঁর কাছে তালিম দেন। পরবর্তী সময়ে মোহাম্মদ খান- মজিদ খানের সাথে একই বাড়িতে বসবাস শুরু করেন এবং মজিদ খানের শিষ্যদেরও তালিম দেন। মজিদ খানের দুই পুত্র ও এক কন্যা ছিল। তাঁর পুত্র মোহাম্মদ শফি মুম্বাইয়ের সিনেমা জগতে বিখ্যাত সুরকার হিসেবে সুনাম অর্জন করেন। দক্ষিণ মুম্বাইয়ের প্রার্থনা সমাজে তাঁর একটি বাদ্যযন্ত্রের দোকান ছিল। ১৯৩২ সালে ইন্দোরে মজিদ খান মৃত্যুবরণ করেন।

ওস্তাদ লতিফ খান ১৮৬২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একজন বিখ্যাত বীণকার ছিলেন। পিতা ওয়াহিদ খানের মৃত্যুর পরে তুকোজিরাও হোলকারের আদালতে সুরকার হিসেবে নিযুক্ত হন। পরিবারের সদস্য ভাতিজা ওস্তাদ মোহাম্মদ খান এবং তাঁর অগ্রজ পুত্র মোহাম্মদ শফি, ওস্তাদ ওসমান খান ছাড়াও তিনি অনেক শিষ্য রেখে গেছেন। মেওয়াতী যন্ত্রসংগীতের পরম্পরায় তিনিই প্রথম শিল্পী যে 'প্রয়াগ সংগীতসভায়' যন্ত্রসংগীত পরিবেশন করেন। সেইসময় 'প্রয়াগ সংগীতসভা' ছিল প্রাচীনতম সংগীত সংস্থাগুলির একটি। এছাড়াও তিনি পাতিয়ালা, কাশ্মির, নেপালসহ বিভিন্ন স্থানে যন্ত্রসংগীত পরিবেশন করেন। তাঁর একমাত্র কন্যা কানিজ ফাতেমা এখনো জীবিত আছেন। তাঁর পুত্র বিখ্যাত সেতারবাদক ওস্তাদ সিরাজ খান ও পৌত্র আসাদ খান মেওয়াতী ঘরানার যন্ত্রসংগীতের ঐতিহ্যকে বহন করে চলেছেন। ১৯৩৫ সালে এই মহান শিল্পী মৃত্যুবরণ করেন।

ওস্তাদ হামিদ খান ১৯১৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ওস্তাদ ওয়াহিদ খানের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র। তিনি রুদ্রবীণার শিল্পী ছিলেন। ভাতিজা ওস্তাদ মোহাম্মদ খানের মৃত্যুর পরে তিনি ভারতীয় বিদ্যাভবনে শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত হন। হামিদ খানের তিনপুত্র যথাক্রমে সৈয়দ খান, জায়েদ খান ও রশিদ খান এবং পাঁচ কন্যা ছিল। তিনি অনেক শিষ্য রেখে গেছেন। মেওয়াতী যন্ত্রসংগীতে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। ২০০০ সালে অক্টোবর মাসে এই মহান শিল্পী মৃত্যুবরণ করেন।

ওস্তাদ ওয়াহিদ খানের পৌত্র মেওয়াতী যন্ত্রসংগীত ঘরানার তৃতীয় প্রজন্মের শিল্পী ওস্তাদ মুহাম্মদ খান ১৯০৬ সালে ভারতের ইন্দোরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সেতার, সুরবাহার ও বীণায় পারদর্শী ছিলেন। তিনি একজন সফল শিক্ষক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। তাঁর শিষ্যরা সকলেই তাঁকে অত্যন্ত ভয় পেত এবং সমীহ করত। অনেক বছর তিনি ভারতীয় বিদ্যাভবনে সংগীতশিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত থাকেন। ওস্তাদ মুহাম্মদ খান সংগীতশিক্ষা লাভ করেন ওস্তাদ মজিদ খান ও ওস্তাদ লতিফ খানের কাছে। তিনি বিখ্যাত সেতারবাদক ওস্তাদ বিলায়েত খানের জ্যেষ্ঠ কন্যাকে বিবাহ

Dhaka University Institutional Repository

করেন। তাঁর এক পুত্র ও তিন কন্যার মধ্যে পুত্র ওস্তাদ রইস খান ভারতের একজন বিখ্যাত শিল্পী হিসেবে বিবেচিত। ১৯৫৯ সালে মুম্বাইয়ে এই মহান শিল্পী মৃত্যুবরণ করেন।

ওস্তাদ রইস খান ভারতের মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে ১৯৩৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ওস্তাদ মুহম্মদ খানের কাছে মাত্র আড়াই বছর বয়সে তাঁর তালিম শুরু হয়। পিতা ছোট নারকেলের খোলের সেতার বানিয়ে তাঁর তালিম (প্রশিক্ষণ) শুরু করেন। ১৯৫৫ সালে তিনি আন্তর্জাতিক যুব উৎসব অনুষ্ঠানে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য নির্বাচিত হন। সেখানে প্রথম পুরস্কারের সম্মান অর্জনের পর তিনি সারাবিশ্বে ভ্রমন করে তাঁর অপূর্ব পারদর্শিতা প্রদর্শন করেন। তাঁর নিজস্ব বাদনশৈলী এবং স্বতঃস্ফূর্ত পরিবেশনার জন্য তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করেন। তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং প্রতিভার কারণে তিনি অত্যন্ত খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯১৭ সালের ৬ মে এই মহান শিল্পী মৃত্যুবরণ করেন। ওস্তাদ রইস খানের চার পুত্র যথাক্রমে- সোহেল খান, সিজান খান, ফারহান খান এবং হুজুর হাসনাইন খান। তাঁদের মধ্যে ফারহান খান ইতিমধ্যেই সেতার বাদনে তাঁর পারদর্শিতায় প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন।

ওস্তাদ সিরাজ খান ভারতের মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে ১৯৫৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। বিখ্যাত সেতারবাদক ওস্তাদ বিলায়েত খানের কাছে তাঁর প্রথম তালিম শুরু হয়। এরপর চাচাতো ভাই রইস খানের কাছে মেওয়াতী ঘরানার গুরুশিষ্য পরম্পরায় তিনি প্রশিক্ষণ নেন। তবে বিভিন্ন রাগের বন্দিশের তালিম তিনি পান তাঁর পিতামহ ওস্তাদ গুলাম কাদের খানের কাছে। ধীরে ধীরে তিনি অত্যন্ত দক্ষ সংগীত শিল্পী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। বর্তমানে তিনি মেওয়াতী পরম্পরায় অনেক শিষ্য তৈরি করেছেন যারা পরবর্তী সময়ে এই ঘরানার ঐতিহ্য বহন করবে। তাঁর দুই পুত্র- আসাদ খান ও শাহবাজ খান। আসাদ খান ইতিমধ্যই অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জনে সক্ষম হয়েছেন।

ওস্তাদ রইস খান ও বেগম বিলকিস খানমের পুত্র ফারহান খান ১৯৮১ সালের ৫ জানুয়ারি জন্মগ্রহণ করেন। মেওয়াতী পরম্পরায় তিনি তাঁর পিতা ওস্তাদ রইস খানের তত্ত্বাবধানে সংগীতশিক্ষা শুরু করেন। সাত বছর বয়সে তাকে সেতার ও সুর বাহারের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। ১৯৯১ সালে ১০ বছর বয়সে কলকাতার নজরুল মঞ্চে ফারহান খান প্রথম শ্রোতা সম্মুখে সংগীত পরিবেশন করেন। সেখানে তিনি তাঁর পিতার সাথে যন্ত্রসংগীতে অংশ নেন। বিখ্যাত ওস্তাদ জাকির হোসেন তাঁদের সাথে তবলায় সঙ্গত করেন। এরপর ২০০১ সালে ফারহান কেনেডি সেন্টারে ওয়াশিংটন ডিসি, নিউইয়র্ক এবং জাতিসংঘে যন্ত্রসংগীত পরিবেশনার মাধ্যমে অত্যন্ত সুনাম অর্জন করেন। একই বছরে তিনি তাঁর পিতা ও সানাইয়ের বিখ্যাত ওস্তাদ বিসমিল্লাহ খানের সাথে ভারতের নয়াদিল্লীর

Dhaka University Institutional Repository

ইন্ডিয়া গেইটে অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। ফারহান খান তাঁর পিতা রইস খানের সাথে সারাবিশ্ব ভ্রমন করে মেওয়াতী যন্ত্রসংগীতের পরম্পরার ঐতিহ্যকে বিশ্ববাসীর কাছে পরিচিত করেছেন এবং এই প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছেন।[৩]

মেওয়াতী ঘরানার উজ্জ্বল নক্ষত্র আসাদ খান ১৯৮২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মেওয়াতী ঘরানার বিখ্যাত ওস্তাদ সিরাজ খানের তত্ত্বাবধানে তার সংগীতশিক্ষার শুরু। তিনি এই ঘরানার ৬ষ্ঠ প্রজন্মের সদস্য। সেতার বাদন ছাড়াও সংগীতের অন্যান্য ধারা যেমন জাজ, ফ্লামেনকো, পাশ্চাত্য উচ্চাঙ্গ সংগীত, রক, ফিউশন, সুফি, ফোক ইত্যাদি ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত দক্ষতা অর্জন করেছেন। তিনি অসংখ্য অনুষ্ঠানে তাঁর যন্ত্রসংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে দর্শক শ্রোতাকে মুগ্ধ করেছেন। তার মধ্যে চন্ডিগড় সংগীতসভা, সংগীত রিসার্চ একাডেমী, আইসিসিআর কনসার্ট, বন্দিশ সুফি উৎসব (কাতার), কোমল নিষাদ সংগীত উৎসব (বরোদা), ওয়াইপিএস যুব সংগীত উৎসব, এপি ট্যুরিজম, ইন্ডিয়া টুডে মিউজিক গ্রুপ, মুম্বাই উৎসব, উডস্টক সংগীত উৎসব, জাজ যাত্রা, ওসহো উৎসব, সানন্দ দরবার, বাবা আলাউদ্দিন খান সংগীত সমারোহ, উত্তরাধিকার, স্বামী হরিদাস সংগীতসভা, ইন্ডিয়ান মিউজিক গ্রুপ (আমেরিকা), ইডিনবার্গ সংগীত উৎসব, অক্সফোর্ড মিউজিক উৎসব (ইউকে), ডেজার্ট উৎসব (দুবাই), দুবাই শপিং উৎসব (দুবাই), সিডনী উৎসব (অস্ট্রেলিয়া), অলকেমী উৎসব (লন্ডন), কমনওয়েলথ গেম্সের উদ্বোধন অনুষ্ঠান ২০১০ (দিল্লী) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। আসাদ খান প্রথম সেতারবাদক যিনি নরওয়ের অসলোতে ২০১০ সালে অনুষ্ঠিত নোবেল শান্তি পুরষ্কার অনুষ্ঠানে যন্ত্রসংগীত (সেতার) পরিবেশন করেন। ভারতের বিখ্যাত সুরকার এ আর রহমানের সাথে আসাদ খান যুক্ত থেকে অনেক অনবদ্য কাজ করেছেন। তাঁর দক্ষতা, যোগ্যতা এবং অধ্যবসায়ের মাধ্যমে তিনি মেওয়াতী পরম্পরার একজন যোগ্য উত্তরসূরী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন এবং তাঁর ঘরানার ঐতিহ্যকে বহন করছেন।

পণ্ডিত যশরাজ ১৯৩০ সালের ২৮ জানুয়ারি ভারতের হরিয়ানার হাইসার জেলার (বর্তমান ফতেহাবাদ জেলা) পিলি মান্দোরী গ্রামে একটি মধ্যবিত্ত সংগীত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মতিরাম উচ্চাঙ্গসংগীত শিল্পী ছিলেন। ১৯৩৪ সালে মাত্র চার বছর বয়সে তাঁর পিতা পরলোক গমন করেন। অগ্রজ প্রতাপ নারায়ণও সংগীতের সাথে যুক্ত ছিলেন। প্রতাপ নারায়ণের দুই পুত্র যতিন- ললিত ভারতের বিখ্যাত সুরকার হিসেবে এবং কন্যাদ্বয়ের মধ্যে অভিনেত্রী সুলক্ষনা পণ্ডিত ও বিজেতা পণ্ডিত অভিনয়ে অনেক খ্যাতি অর্জন করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

"পিতার অকাল মৃত্যুর পর তার দাদারাই তাঁর লালন পালন ও শিক্ষা-দীক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই পরিবারে বহুকাল থেকেই সংগীত প্রচলিত এবং সকলেই গুণী সঙ্গীতজ্ঞ। প্রারম্ভে তিনি মেজদাদা প্রতাপ নারায়ণের কাছে তবলা শিক্ষা করেন। মাত্র ১৫ বছর বয়সেই এতদূর উন্নতি লাভ করেন যে কুমার গান্ধর্ব, ডিভি পলুস্কর, পান্নালাল ঘোষ, পণ্ডিত রবিশংকর প্রমুখ দিকপাল সঙ্গীতজ্ঞদের সঙ্গে তিনি সফল সঙ্গত করতে পারতেন। কিন্তু সাধারণ দুএকটি ঘটনার জন্য তিনি তবলা পরিত্যাগ করেন এবং যথারীতি সংগীতচর্চা আরম্ভ করেন। তখন বড়দাদা পণ্ডিত মনিরামের সঙ্গে তিনি শাহানন্দ স্টেটে থাকতেন। সেখানকার মহারাজা জয়মল সিংহ ছিলেন পরম কালীভক্ত, যার সহচর্য তাঁর জীবনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল বলে তিনি মনে করেন। সেই জন্যই সম্ভবত: গায়ন কালে ভক্তিরসে ভাব বিভোর হয়ে তিনি শ্রোতাদের এমন অভিভূত করতে পারেন। কয়েক বছর পর তিনি বড়দাদার সঙ্গে কলকাতাবাসী হন। এখানেই তাঁর সংগীতজীবনের জয়যাত্রা আরম্ভ হয়। ১৯৫১ সালে কলকাতার আকাশবাণী কেন্দ্রে গাইবার সুযোগ লাভ করেন। নেপালের মহারাজা তাঁর গান শুনে কাঠমুন্ডুতে তাঁকে আমন্ত্রণ করেন। ১৯৫২ সালে নেপাল রাজদরবারে তাঁর গান শুনে মহারাজা অত্যন্ত প্রীত হন এবং পাঁচ হাজার স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করেন। ক্রমে দেশ-বিদেশের বহুস্থানে সংগীত পরিবেশন করে তিনি অজস্র সাধুবাদ, প্রচুর পুরস্কার ও বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করেন।"[৪] ভাই মতিরাম ব্যতীত তিনি মেওয়াতী ঘরানার জয়ওয়ান্ত সিং ওয়াঘেলা এবং গুলাম কাদের খানের কাছে সংগীতের তালিম নেন। এছাড়াও আগ্রা ঘরানার স্বামী বল্লভ দাসের কাছেও তিনি সংগীতশিক্ষা লাভ করেন। ১৯৬২ সালে তিনি চিত্রপরিচালক ভি. সান্তারামের কন্যা মধুরা সান্তারামকে বিবাহ করেন। কিছুদিন কলকাতায় অবস্থানের পর ১৯৬৩ সালে তিনি মুম্বাইয়ে চলে আসেন। তাঁর এক পুত্র শারঙ্গ দেব পণ্ডিত ও এক কন্যা দুর্গা যশরাজ। উচ্চাঙ্গসংগীতের পাশাপাশি পণ্ডিত যশরাজ সেমি ক্লাসিক্যাল কম্পোজিশনের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং চলচ্চিত্রে তা প্রয়োগ করেন। পরিচালক বসন্ত দেশাই এর চলচ্চিত্র লাড়কী সাহয়াদ্রী কী (১৯৬৬), পণ্ডিত ভীমসেন যোশীর সাথে যুগল গায়ক হিসেবে বীরবল মাই ব্রাদার (১৯৭৫) ইত্যাদি আরো অসংখ্য চলচ্চিত্রে তিনি সেমিক্লাসিক্যাল গেয়েছেন। পিতার স্মরণে তিনি ১৯৭২ সাল থেকে প্রতি বছর হায়দ্রাবাদে পণ্ডিত মতিরাম সঙ্গীত সমারোহ নামে একটি সংগীত উৎসবের আয়োজন করেন।

পণ্ডিত যশরাজ অসংখ্যা শিষ্য তৈরি করেছেন যারা ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠিত শিল্পী হিসেবে নিজেদের প্রসিদ্ধি লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন এবং মেওয়াতী ঘরানার পরম্পরাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। এদের মধ্যে সঞ্জীব অভয়ংকর, কলারামনাথ, তৃপ্তি মুখার্জী, সুমন ঘোষ, কবিতা কৃষ্ণমূর্তি, অনুরাধা পাড়োয়াল, সাধনা সরগম, শংকর মহাদেভন ও রমেশ নারায়ণের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি অসংখ্য

Dhaka University Institutional Repository

পুরষ্কারে ভূষিত হয়েছেন। এর মধ্যে সংগীত নাটক একাডেমী পুরষ্কার (১৯৮৭), পদ্মভূষণ (১৯৯০), পদ্মবিভূষণ (২০০০), সংগীত কলারত্ন, মাষ্টার দিনানাথ মুঙ্গেস্কর পুরস্কার, লতা মুঙ্গেস্কর পুরষ্কার, মহারাষ্ট্র গৌরব পুরস্কার, মারওয়ার সংগীতরত্ন পুরস্কার, স্বাথী সংগীত পুরষ্কারাম (২০০৮), সংগীত নাটক একাডেমী ফেলোশিপ (২০১০), সুমিত্রা ছারাতরাম আজীবন সম্মাননা পুরস্কার (২০১৪) উল্লেখযোগ্য। তিনি তাঁর সংগীতের মাধ্যমে ভারতসহ বিশ্বের সংগীত দরবারে অত্যন্ত সম্মানিত ও প্রশংসিত হয়েছেন। বর্তমানে মেওয়াতী পরম্পরাকে প্রতিনিধিত্বকারী এই শিল্পী শতাব্দীর একজন অন্যতম শ্রেষ্ঠ গায়ক শিল্পীরূপে হিসেবে স্বীকৃত।

এই ঘরানার প্রধান সাংগীতিক বৈশিষ্ট্য হলো, মেওয়াতী ঘরানার গায়কীতে গোয়ালিয়র ঘরানার কিছুটা প্রভাব থাকলেও এই ঘরানার গায়কীর কিছু স্বতন্ত্র গুণ রয়েছে। সুফি ও আধ্যাত্মিক ভাব এই ঘরানায় খুব বেশি প্রবল। সরগম ও তেহাইয়ের প্রচুর ব্যবহার করা হয়। বলা হয় এর তানকারির সাথে পাতিয়ালা ঘরানা এবং গোয়ালিয়র ঘরানার সাদৃশ্য বিদ্যমান। এই ঘরানার নিজস্ব রাগের মধ্যে রয়েছে জয়ন্তী টোড়ী, দিন কি পুরিয়া, অওদাভ বাগেশ্রী, খামাজ বাহার ও ভবানী বাহার। এছাড়াও পণ্ডিত যশরাজ অনেক ভক্তিমূলক গান রচনা করেছেন যা খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

মেওয়াতী ঘরানার সকল দিকপাল সংগীতজ্ঞের অনবদ্য গায়কী ও বাদনশৈলীর কারণে এই ঘরানা ভারতবর্ষে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জনে সক্ষম হয়েছে।

মেওয়াতী ঘরানার বিখ্যাত সংগীতজ্ঞদের চিত্র:

ওস্তাদ ঘর্গে নজির খান [৫]

ওস্তাদ ওয়াহিদ খান [৬]

Dhaka University Institutional Repository

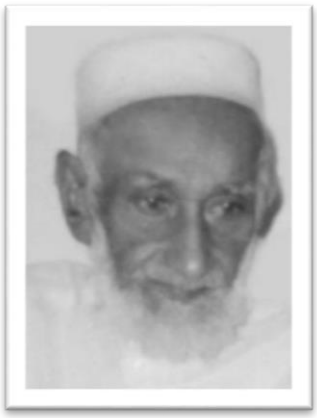

ওস্তাদ হামিদ খান [৭]

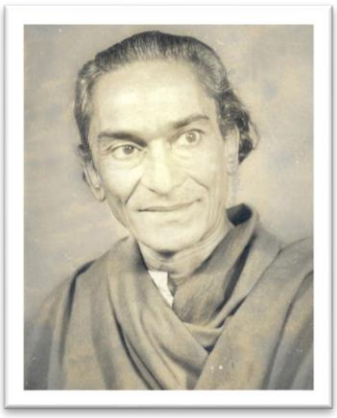

ওস্তাদ গুলাম কাদির খান [৮]

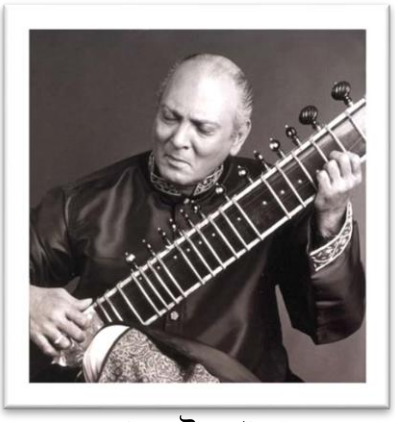

ওস্তাদ রইস খান [৯]

পণ্ডিত যশরাজ [১০]

তথ্য ও চিত্রসূত্র

১) ড. শন্নো খুরানা, *খেয়াল গায়কী মে বিবিধ ঘরানে*, নয়া দিল্লী: ১৯৯৫

২) ড. শন্নো খুরানা, *খেয়াল গায়কী মে বিবিধ ঘরানে*, নয়া দিল্লী: ১৯৯৫

৩) http://www.mewatigharana.com

৪) অমল দাশ শর্মা, *প্রাচীন ও নবীন সংগীতজ্ঞ এবং ঘরানার ইতিবৃত্ত*, দরবারী প্রকাশন, কলকাতা: ১৯৯৫, পৃ: ১৩৭

৫) http://www.visualfxindia.com/mewatigharana/html/ghagge_nazir.html

৬) http://www.visualfxindia.com/mewatigharana/html/wahidkhan.html

৭) http://www.visualfxindia.com/mewatigharana/html/hamidkhan.html

৮) http://www.visualfxindia.com/mewatigharana/html/ghulam_qadir.html

Dhaka University Institutional Repository

৯) http://www.visualfxindia.com/mewatigharana/html/raiskhan.html

১০) https://www.hindustantimes.com/art-and-culture/i-m-sorry-but-i-don-t-even-consider-rap-as-music-pandit-jasraj/story-X9zS44f4Oji8Ed3OZZ1UlK.html

সেনী-মাইহার ঘরানা

সংগীতের এই বিখ্যাত ঘরানার প্রবর্তন করেন সবদর হোসেন খাঁ। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা শহর থেকে দশ মাইল দূরে তিতাস নদীর ওপারে শিবপুর নামক গ্রামে এই ঘরানা প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে শিবপুরে খাঁ পরিবারের প্রতিষ্ঠাতার নামের ক্ষেত্রে সিরাজুদ্দিন খাঁ'র নাম উল্লেখযোগ্য। যাঁর সাথে সবদর হুসেন খাঁ'র কয়েক পুরুষের ব্যবধান ছিল। খাঁ পরিবারের প্রতিষ্ঠা করে যেমন ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছেন সিরাজুদ্দিন খাঁ, তেমনি শিবপুর ঘরানার প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে অমর হয়ে আছেন সবদর হোসেন খাঁ। সাধু প্রকৃতির লোক হওয়ায় সবদর হোসেন খাঁ গ্রামের মানুষের কাছে প্রথমে সদু খাঁ এবং পরবর্তী কালে সাধু খাঁ নামে পরিচিত ছিল। তিনি পাঁচ পুত্র যথাক্রমে- ছমির উদ্দিন খাঁ, আফতাব উদ্দিন খাঁ, আলাউদ্দিন খাঁ, নায়েব আলী খাঁ ও আয়েত আলী খাঁ ও দুই কন্যা সন্তানের জনক ছিলেন। এই পাঁচ পুত্রের মধ্যে ফফির (তাপস) আফতাব উদ্দিন খাঁ, ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ ও ওস্তাদ আয়েত আলী খাঁ সংগীতজগতে অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

সবদর হোসেন খাঁ'র দ্বিতীয় পুত্র আফতাব উদ্দিন খাঁ সবসময় আল্লাহর ধ্যানে মগ্ন থাকতেন বলে সবাই তাঁকে ফকির বলে সম্বোধন করতেন। তিনি অত্যন্ত সংগীতানুরাগী ছিলেন। সংগীতের প্রথমপাঠ তিনি পিতার কাছ থেকেই গ্রহণ করেন। তবলাবাদনের প্রতি তাঁর আগ্রহ ছিল অপরিসীম। লেখাপড়ায় অমনযোগী ফকির আফতাব উদ্দিন ক্লাসের টেবিলে তবলার চর্চা করতেন। সেইসময় ব্রাহ্মনবাড়িয়ার বাংগোড়া গ্রামের সংগীতপ্রিয় জমিদারের দরবারে রামধন ও রামকানাই নামে দু'জন প্রসিদ্ধ সংগীতজ্ঞ ছিলেন। ফকির আফতাব উদ্দিন পিতার অনুমতি নিয়ে তবলা শিক্ষার মানসে এই দুই গুণীশিল্পীর কাছে বাংগোড়া যান এবং তবলায় তালিম নেওয়া শুরু করেন। তাঁর প্রখর স্মৃতিশক্তি ও শেখার অদম্য আগ্রহের কারণে খুব স্বল্পসময়ে তিনি তবলায় সিদ্ধহস্ত হয়ে ওঠেন এবং তবলার পাশাপাশি বেহালায় তালিম নেওয়া শুরু করেন। তবলা ও বেহালা ছাড়াও বাঁশী বাদনে সেইসময় তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। বাঁশী যেন ছিল তাঁর জন্মগত অধিকার। কোন গুরুর কাছে শিক্ষা নেওয়া ব্যতিরেকে এমন মধুর বংশীবাদন তাঁর অলৌকিক শক্তির গুনেই সম্ভব বলে ধারণা করা হয়।

কথিত আছে কলকাতার ভবানীপুরের জমিদার জগদীন্দ্রনাথের বাড়িতে একবার ফকির আফতাব উদ্দিন বংশী বাজানোর সময় তাঁর অপূর্ব রসমন্ডিত সুরের মূর্চ্ছনায় আকৃষ্ট হয়ে সেখানে অল্পসময়ের মধ্যে অনেক পাখি এসে ভীড় করে। তবলা, বেহালা ও বংশীবাদন ব্যতিরেকে তিনি হারমোনিয়াম যন্ত্রেও অনেক সাবলীল ছিলেন। তাঁর হাতের স্পর্শে হারমোনিয়ামের পর্দাগুলো যেন প্রাণ পেয়ে নেচে উঠতো।

Dhaka University Institutional Repository

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার পার্শ্ববর্তী একটি গ্রামের নাম সাতমোড়া। সেখানে মনোমোহন দত্ত নামে এক সাধুপুরুষ বাস করতেন। আধ্যাত্মিক সাধনায় বিভোর এই সাধু পুরুষ ছিলেন একজন স্বভাব কবি। ফকির আফতাব উদ্দিন মহর্ষি মনেমোহন দত্তের সহচর্যে আসার পর তাঁর অপূর্ব কবিতাগুলিতে একের পর এক সুরারোপ করতে থাকেন। মনোমোহন দত্ত তাঁর রচিত কবিতায় এমন অপূর্ব ও মধুর সুর সংযোজনে অত্যন্ত প্রসন্ন হন এবং তাঁর প্রতিটি গানই ফকির আফতাব উদ্দিনকে সুর করতে বলেন। এই গানগুলো সংরক্ষণ ও প্রচারে লবপাল নামক মনমোহন দত্তের এক শিষ্যের অবদানের কথা উল্লেখিত আছে। তাই মনোমোহন দত্ত তাঁদের তিনজনের নামের আদ্যাক্ষর নিয়ে তাঁর রচিত গানের একটি সংকলন বের করেন যার নাম রাখেন ম-ল-য়া (মনমোহন-লব-আফতাবউদ্দিন)। আফতাব উদ্দিন খাঁ পল্লিগীতিতে অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। সুরকার, গায়ক ও বাদক ব্যতিরেকে তিনি নতুন একটি বাদ্যযন্ত্র উদ্ভাবন করেন যার নাম 'স্বর সংগ্রহ'। বাদ্যযন্ত্রটি ছিল সরোদ যন্ত্রের মত তবে এর আওয়াজ ছিল কিছুটা মৃদু। তিনি আরেকটি সুরেলা ও মিষ্টি যন্ত্রের উদ্ভাবন করেন যার নাম 'মেঘ ডম্বুর'।

সবদর হোসেন খাঁ'র তৃতীয় পুত্র ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁকে স্নেহ করে পিতা 'আলম' নামে ডাকতেন। তাঁর সংগীতের হাতেখড়ি অগ্রজ ফকির আফতাব উদ্দিন এর কাছে। সুরপাগল এই গুণী বই হাতে পাঠশালা যেতেন ঠিকই কিন্তু সংগীত আসরের কথা শুনলেই তিনি স্কুল পালাতেন। একদিন তাঁর মায়ের মাটির হাঁড়িতে জমানো টাকা থেকে কিছু টাকা নিয়ে তিনি বাসা থেকে বেড়িয়ে পড়েন। এর কিছুদিন পর তিনি কলকাতায় আসেন এবং সংগীতপ্রেমী জমিদার রাজা সৌরীন্দ্র মোহনের গানের জলসায় যাওয়ায় সুযোগ লাভ করেন। সেই আসরের গায়ক ছিল ওস্তাদ গোপালকৃষ্ণ ভট্টাচার্য যিনি বাংলার একজন বিখ্যাত গায়ক ছিলেন। পক্ষাঘাতে তাঁর দু'হাত অসাড় হওয়ায় তিনি 'নুলো গোপাল' নামেও পরিচিত ছিলেন। আলাউদ্দিন খাঁ- গোপালকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন তবে শর্ত ছিল বারো বছর শুধু সরগম সাধনার পরই রাগের তালিম নিতে পারবেন। তাতেই রাজী হয়ে আলাউদ্দিন খাঁ সংগীতের শিক্ষা শুরু করেন, তবে সাত বছর পরই মহামারি প্লেগ রোগে গোপালকৃষ্ণ ভট্টাচার্য মৃত্যুবরণ করায় আলাউদ্দিন খাঁ অত্যন্ত ভেঙ্গে পড়েন এবং কণ্ঠসংগীতের চর্চা বন্ধ করে যন্ত্রসংগীত শেখার সিদ্ধান্ত নেন। হবু দত্তের কাছে তিনি ক্ল্যারিওনেট তালিম নেন। এছাড়াও হবু দত্তের গানের আখড়ায় যে সকল দেশী বিদেশী বাজনা হতো যেমন; বাঁশী, পিকলু, সেতার, ম্যান্ডোলিন, ব্যাঞ্জো- এসকল যন্ত্র বাদনপদ্ধতি তিনি একে একে রপ্ত করেন।

"আলাউদ্দিন তারপর লবো সাহেবের শরনাপন্ন হলেন। লবো সাহেব ছিলেন একজন গোয়ানিজ। তিনি ছিলেন ব্যান্ড মাস্টার। তিনি বেহালা বাজাতেন। আলাউদ্দিন তাঁর কাছে পাশ্চাত্য রীতিতে বেহালা

Dhaka University Institutional Repository

বাজানো শিখলেন। পরে তিনি লবো সাহেবের ব্যান্ডেও বেহালা বাজাতেন। আবার অমর দাশের কাছে শিখলেন ভারতীয় পদ্ধতিতে বেহালা বাদন। তিনি লবো সাহেবের মেম-গিন্নীর কাছ থেকে ইংরেজী স্বরলিপি পড়তে ও দেখে বাজাতে শিখলেন। মেছো বাজারের হাজারী ওস্তাদ একজন নামকরা বাজিয়ে ছিলেন। তিনি সানাই বাজাতেন অপূর্ব। আলাউদ্দিন হাজারী ওস্তাদের কাছ থেকে সানাই, নাকাড়া, টিকারা বাজাতে শিখলেন। আর এভাবে আলাউদ্দিন সর্ববাদ্য বিশারদ হয়ে উঠলেন।"[১]

এরপর আলাউদ্দিন খাঁ রামপুর নবাবের সভাবাদক ও ভারতবর্ষে একজন শ্রেষ্ঠ বীণকার ওস্তাদ ওয়াজির খাঁ'র কাছে সংগীতশিক্ষার সুযোগ পান। ওয়াজির খাঁ ছিলেন তানসেনের বংশধর। ধ্রুপদ, ধামার, রবাব, সুরশৃংগার ইত্যাদির শিক্ষা গ্রহণপূর্বক আলাউদ্দিন খাঁ তানসেনের ঘরানা সংগীতে দক্ষতা অর্জন করেন। ১৯১৮ সালে মাইহার রাজ্যের রাজা আলাউদ্দিন খাঁকে তাঁর দরবারে পাঠানোর জন্য রামপুরের নবাবের কাছে অনুরোধ জানান। রামপুরের নবাব ওয়াজির খাঁ'র অনুমতি সাপেক্ষে আলাউদ্দিন খাঁকে মাইহার ফেরত পাঠান। আলাউদ্দিন খাঁ মাইহার রাজার শিক্ষাগুরু হন। মৃত্যুর পূর্বপর্যন্ত তিনি তাঁর দরবারের সভাসংগীতজ্ঞ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। ওস্তাদ ওয়াজির খাঁ'র শেষ ইচ্ছানুযায়ী আলাউদ্দিন খাঁ মাইহার থেকেই তানসেন ঘরানার সুরের বাণীকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেন।

"বৃটিশ সরকার আলাউদ্দিন খাঁ'র প্রতিভার স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁকে 'খাঁ সাহেব' উপাধিতে সম্মানিত করেন। ১৯৫২ সালে সঙ্গীত নাটক একাডেমীর শ্রেষ্ঠ পুরস্কারে ভূষিত হন। ১৯৫৪ সালে তিনি সংগীত নাটক একাডেমীর ফেলো নির্বাচিত হন। ১৯৫৮ সালে 'পদ্মভূষণ' এবং ১৯৭২ সালে 'পদ্মবিভূষণ' খেতাব লাভ করেন। ১৯৫১ সালে বিশ্বভারতী তাকে 'দেশীকোত্তম' সম্মানে ভূষিত করেন। ভারতের দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যার সলিমুল্লাহ হল তাঁকে আজীবন সদস্যপদ দান করেন। তিনি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শান্তিনিকেতনে আমন্ত্রিত অধ্যাপক হিসেবেও কিছুকাল অধ্যাপনার কাজ করেন।"[২]

ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ চন্দ্রসারঙ্গ নামক একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেন। সরোদের যে বর্তমান রূপ এর পেছনেও তাঁর পরামর্শ ছিল বলে জানা যায়। তিনি অনেক রাগ রাগিণী সৃষ্টি করেন যার মধ্যে মেঘবাহার, প্রভাতকেলী, হেম-বেহাগ, হেম বসন্ত, হেমন্ত, দুর্গেশ্বরী, মদন-মঞ্জরী ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁর অসংখ্য শিষ্যের মধ্যে পুত্র ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ, পৌত্র আশীষ খান, ভ্রাতুষ্পুত্র ওস্তাদ বাহাদুর খাঁ, পৌত্র ধ্যানেশ খান, তিমির বরণ, পণ্ডিত রবিশঙ্কর, শ্যাম গাঙ্গুলী, নিখিল ব্যানার্জী, শরণরানী, পান্নালাল ঘোষ, পণ্ডিত যতীন ভট্টাচার্য প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। উপমহাদেশের এই মহান শিল্পী ১৯৭২ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর মাইহার রাজ্যে তাঁর নিজ বাস ভবন 'মদিনা ভবন' এ শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। ওস্তাদ

আলাউদ্দিন খাঁ'র এক পুত্র ও তিন কন্যা যথাক্রমে আলী আকবর খান, সরিজা বেগম, জাহানারা বেগম ও রওশন আরা বেগম ওরফে অন্নপূর্ণা। আলাউদ্দিন খাঁ'র প্রিয় শিষ্য রবিশংকরের সাথে অন্নপূর্ণা বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হন। রবিশংকর সেতার বাদনে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিল্পীর স্বীকৃতি অর্জন করেন।

সবদর হোসেন খাঁ'র চতুর্থ পুত্র নায়েব আলী। যার ছিল একদিকে সংগীতের প্রতি অনুরাগ অপরদিকে আল্লাহর প্রতি ভক্তি। সেইকারণে পিতা সবদর হোসেন যখন কোরআন তেলাওয়াত করতেন তখন তিনি তা শুনে মিষ্টি কণ্ঠে অনুকরণ করে তেলাওয়াত করার চেষ্টা করতেন। পুত্রের এই প্রচেষ্টায় অনুপ্রাণিত হয়ে সবদর হোসেন নায়েব আলীকে কোরআন শিক্ষার জন্য গ্রামের মাদ্রাসায় ভর্তি করে দেন। মাদ্রাসার শিক্ষা শেষ করে তিনি সংগীতশিক্ষা শুরু করেন। অগ্রজ ফকির আফতাব উদ্দিনের কাছে তিনি তবলা, ক্ল্যারিওনেট ইত্যাদি যন্ত্রে তালিম নেন। নায়েব আলী খাঁ'র চারপুত্র যথাক্রমে খাদেম হোসেন খান, মীর কাশেম খান, আমিনুর হোসেন খান ও রাজা হোসেন খান এবং একটি কন্যা সন্তানের সকলেই সংগীতানুরাগী ছিলেন।

সবদর হোসেন খাঁ'র পাঁচ পুত্রের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ পুত্র ওস্তাদ আয়েত আলী খাঁ। তিনি ১৮৮৪ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ এপ্রিল ব্রাহ্মণবাড়িয়ার শিবপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। সংগীতের প্রতি অনুরাগ ও প্রতিভা তিনি উত্তরাধিকার সূত্রেই পেয়েছিলেন। দশবছর বয়সে অগ্রজ আফতাবউদ্দিনের কাছে তিনি প্রথম সংগীতশিক্ষা শুরু করেন। দীর্ঘ সাতবছর সরগম সাধনা ও রাগ রাগিণী সম্পর্কে ধারণা নিয়ে তিনি অপর অগ্রজ আলাউদ্দিন খাঁ'র কাছে ভারতের মাইহার রাজ্যে চলে যান। রাগ-রাগিণী সম্পর্কে আয়েত আলী খাঁ'র দক্ষতা দেখে অগ্রজ আলাউদ্দিন খাঁ তাঁর হাতে সুরবাহার যন্ত্র তুলে দেন। এ পর্যায়ে শুরু হয় তাঁর সংগীতশিক্ষার দ্বিতীয় পর্ব। সুরবাহার ধ্রুপদ অঙ্গের যন্ত্র। সুরবাহারের গুরু গম্ভীর শব্দে রাগালাপ এক অপূর্ব ভাব ও রসের সৃষ্টি করে। অগ্রজের নিদের্শমত আয়েত আলী অগ্রজের কাছে বাদন কৌশলের পদ্ধতি ও রাগ রূপায়নের সূক্ষ্ম বিষয়গুলো নিষ্ঠার সঙ্গে আয়ত্ত করলেন।

"সাধনার এক পর্যায়ে আলাউদ্দিন খাঁ তাঁর ওস্তাদ ওয়াজির খাঁ'র কাছে রামপুরে আয়েত আলী খাঁকে পাঠিয়ে দেন কিন্তু পরিচয় গোপন রাখার নির্দেশ দেন। এ বিষয়ে জানা যায় যে আয়েত আলী খাঁ রামপুর আসার পর জীবিকা নির্বাহের জন্য দিনমজুরের কাজ করতেন। প্রতিদিন রাতে কাজ শেষে নিজ আশ্রয়স্থলে ফিরে প্রিয় যন্ত্র সুরবাহার বাজাতেন। এরকম এক রাতে যখন তিনি সুরের মুর্চ্ছনায় মগ্ন ছিলেন ঠিক সেইসময় ওস্তাদ ওয়াজির খাঁ তাঁর জলসা শেষে সেইপথে বাড়ী ফেরার সময় থমকে দাঁড়ান। তিনি শুনলেন তাঁর ঘরানার সুর বাজছে একটা বন্ধ ঘরের ভেতর থেকে। তিনি দরজার কড়া নাড়লেন। ওস্তাদকে দরজার সম্মুখে দেখে হতবাক আয়েত আলীর চোখে আনন্দের অশ্রু চলে এলো। এরপর শুরু হলো তাঁর সংগীত

জীবনের আরেক অধ্যায়। ওয়াজেদ আলীর দর্শন ও শিষ্যত্ব লাভের পরে গুরুর সাথে তিনি আসেন নবাবের দরবারে। সেইসময় রামপুরের নবাব ছিলেন হামেদ আলী যিনি অত্যন্ত সংগীত রসজ্ঞ ও সংগীতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। হামেদ আলী ওয়াজির খাঁকে গুরুতুল্য সম্মান করতেন। নবাবের দরবারে অনেক গুণীশিল্পীর সমাবেশে গুরুর আদেশ অনুযায়ী আয়েত আলী খাঁ বেহাগ রাগ পরিবেশন করেন। তাঁর যন্ত্রসংগীতে মুগ্ধ হয়ে যায় উপস্থিত সকলে। এই আসরেই আয়েত আলী খাঁ নবাব হামেদ আলীর কাছে ওস্তাদরূপে স্বীকৃতি লাভপূর্বক রামপুর রাজদরবার অলংকৃত করেন। পরবর্তী কালে তিনি মাইহার রাজদরবারের সভাগায়ক নিযুক্ত হন। মহারাজা আলাউদ্দিন খাঁ'র পাশেই তাঁর আসনের ব্যবস্থা করেন। তিনি প্রাচ্যদেশীয় যন্ত্র দিয়ে একটি অর্কেস্ট্রা দল গঠন করেন যার নাম রাখা হয়েছিল 'মাইহার স্ট্রিং ব্যান্ড'।"[৩]

ওস্তাদ আয়েত আলী খাঁ কিছুদিন শান্তি নিকেতনের যন্ত্র বিভাগের শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। একবার কলকাতার এক অনুষ্ঠানে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর বাদন শুনে মুগ্ধ হন এবং তাঁকে শান্তিনিকেতনে আসার আমন্ত্রণ জানান। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা হেতু খুব বেশিদিন তিনি সেখানে অবস্থান করতে পারেননি। সরোদ যন্ত্রের চাপা বোলের কারণে অগ্রজ আলাউদ্দিনের পরামর্শ ও উপদেশ অনুযায়ী সরোদ যন্ত্রের অবয়ব ও সুরের মাধুর্য বৃদ্ধির জন্য পরীক্ষা নিরীক্ষার একপর্যায়ে তিনি সরোদ যন্ত্রের আধুনিকরূপ দানে সক্ষম হন। যার ফলে সরোদ আকৃতিগত ও শব্দগত উভয় দিক দিয়েই উন্নত মানসম্পন্ন হয়। এসরাজ যন্ত্রের মতই 'মনোহরা' নামক একটি যন্ত্র তিনি আবিষ্কার করেন। অগ্রজ আলাউদ্দিনের পরামর্শে উদ্ভাবিত আরেকটি যন্ত্র হলো 'চন্দ্র সারং'। কেবল নতুন যন্ত্রের উদ্ভাবনই নয়, তিনি অনেক নতুন রাগ-রাগিণীও সৃষ্টি করেছিলেন। যেমন: মলহার রাগের অনুকরনে বারিষ, আলাউদ্দিন খাঁ'র সৃষ্ট রাগ হেমন্তের অনুকরণে হেমন্তিকা, আওল-বসন্ত, ওমর-সোহাগ, শিব-বেহাগ, মিশ্র-সারং ইত্যাদি। ১৯৪৮ সালে কুমিল্লায় ও ১৯৫৪ সালে ব্রাহ্মণবাড়িয়া আলাউদ্দিন মিউজিক কলেজ নামে দুটি সংগীত প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠানে বিনা বেতনে মেধাবী ছাত্র ছাত্রীদের শিক্ষা প্রদানে তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল বিশুদ্ধ সংগীতের চর্চা, রাগসংগীতের সুষ্ঠু প্রশিক্ষণ, সংরক্ষণ ও প্রসার। সেইসময় তিনি বেতারে নিয়মিত সুরবাহার পরিবেশন করতেন। এছাড়াও আলাউদ্দিন সংগীত সম্মেলন, অলবেংগল মিউজিক কনফারেন্স সহ কলকাতার বিভিন্ন সংগীত সম্মেলনে তিনি অংশগ্রহণ করেন।

"১৯৬০ সালে সংগীতে তাঁর অসাধারণ কৃতিত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি গভর্নর পদক এ ভূষিত হন। ১৯৬১ সালে পাকিস্তান সরকার তাঁকে তমঘা-ই-ইমতিয়াজ খেতাবে ভূষিত করেন। ১৯৬৬ সালে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার

'প্রাইড-অব-পারফরমেন্স', ১৯৭৬ সালে মরনোত্তর 'শিল্পকলা একাডেমী পুরস্কার' এবং ১৯৮৬ সালে বাংলাদেশ সরকার তাঁকে 'স্বাধীনতা দিবস পুরস্কার' এ ভূষিত করেন।"[৪]

১৯৬৪ সালে আয়েত আলী খাঁ পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হয়ে গুরুতর অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী হন এবং দীর্ঘ তিনবছর রোগভোগের পর ১৯৬৭ সালের ২ সেপ্টেম্বর তিনি ইহলোক গমন করেন। তিনি অসংখ্য যোগ্য উত্তরসূরী রেখে গেছেন। যার মধ্যে- ওস্তাদ খাদেম হোসেন খান, ওস্তাদ আলী আহমদ খাঁ (সেতার), ওস্তাদ বাহাদুর খান, ওস্তাদ আবেদ হোসেন খান, ওস্তাদ এরশাদ আলী খাঁ (সেতার), ওস্তাদ ফুলঝুরি খাঁ (এস্রাজ), ওস্তাদ মতিউর রহমান খাঁ (বেহালা), অনিল কুমার ভট্টাচার্য (তবলা), অজয় কুমার সিংহ (তবলা), খুরশীদ খান (সেতার), অমর পাল (কণ্ঠ), সিন্ধুরানী দেবী (কণ্ঠ), মনসা দেবী (কণ্ঠ), মিনতি চক্রবর্তী (কণ্ঠ), অশ্বিনী কুমার রায় (কণ্ঠ), পরেশ দেব (কণ্ঠ), মানিক মিয়া (সেতার), ওস্তাদ গজেন্দ্র লাল রায় (কণ্ঠ), সালাউদ্দিন চৌধুরী (সেতার), ওস্তাদ উমেশ চন্দ্র বনিক (কণ্ঠ), আমিনুর হোসেন খান (এস্রাজ), ওস্তাদ ইসরাইল খান (এস্রাজ), আব্দুল করিম (কণ্ঠ), মিঃ রবার্ট (বেহালা), এ.এইচ.এম আব্দুল হাই (কণ্ঠ), শিবেন চক্রবর্তী (কণ্ঠ), ওবায়েদউল্লাহ (এস্রাজ), নগেন দাস (কণ্ঠ) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও তিনি ছয় পুত্র ও তিন কন্যা রেখে গেছেন তারা হলেন যথাক্রমে- আবেদ হোসেন খান, বাহাদুর হোসেন খান, মোবারক হোসেন খান, শেখ সাদী খান, তানসেন খান, রুবাইয়াৎ খান (বিটোফেন) এবং কন্যাদের নাম আম্বিয়া খানম, মমতা খানম ও ইয়াসমীন খানম। এঁরা সকলেই অত্যন্ত সংগীতানুরাগী শিল্পী, লেখক, সংগীত বিশ্লেষক হওয়ার পাশাপাশি শুদ্ধ সংগীতের প্রসারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন।

"শিবপুর গ্রামে বসতি, খাঁ-পরিবারের ইতিহাসে নতুন যুগের সূচনা। নদী যেমন নিরবধি বয়ে চলে উৎস থেকে সঙ্গমের পানে, তেমনি খাঁ-পরিবারের ইতিহাসও অতীতের কাহিনী ধরে নদীর গতির মতই ভবিষ্যতের পানে বয়ে চলেছে। রিয়াজউদ্দিন খাঁ থেকে সবদর হোসেন খাঁ- ইতিহাসের ধারার সাক্ষী। আর সে ইতিহাস খাঁ পরিবারের ইতিহাস। তারপর থেকে এক যুগান্তকারী সংগীত ঘরানার ইতিহাস। খাঁ পরিবারের সবাই সুরের সন্ধানে আত্ম-নিবেদিত। সংগীতকে আয়ত্ত করতে গিয়ে তাঁরা পরিচয় দিলো ত্যাগ ও তিতিক্ষার, ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের, নিষ্ঠা ও একাগ্রতার, আগ্রহ ও উদ্যমের, সহনশীলতা ও সংকল্পের দৃঢ়তার। প্রতিটি মানুষই যেন সংগীত সাধনার মেধা ও প্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের জীবনের ঘটনা সে ইতিহাসের সাক্ষী। সংগীত যেমন অনন্তকাল বেঁচে থাকবে তেমনি সংগীতের ইতিহাসে খাঁ পরিবারের অবদান ও সেনী-মাইহার ঘরানা চিরদিন অম্লান হয়ে থাকবে।"[৫]

সেনী-মাইহার ঘরানার বিখ্যাত সংগীতজ্ঞদের চিত্র:

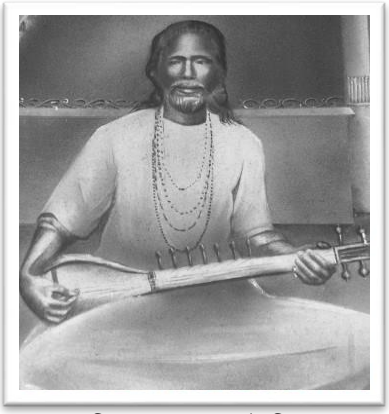

ফকির আফতাব উদ্দিন [৬]

ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ [৭]

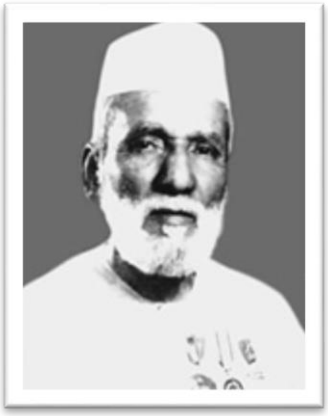

ওস্তাদ আয়াত আলী খাঁ [৮]

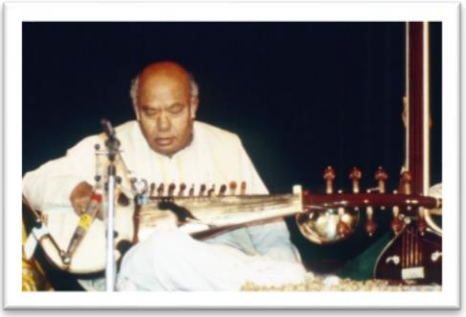

ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ [৯]

অন্নপূর্ণা দেবী [১০]

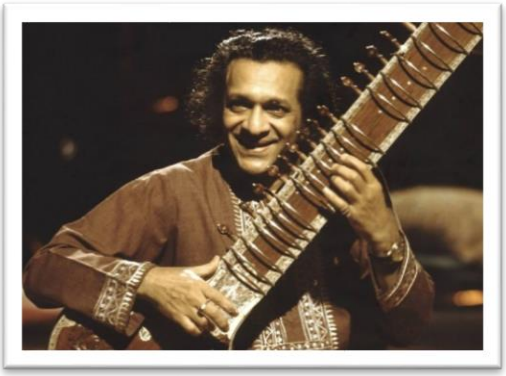

পণ্ডিত রবিশংকর [১১]

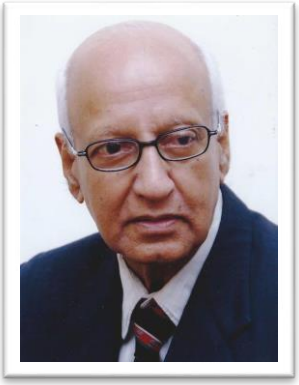

মোবারক হোসেন খান [১২]

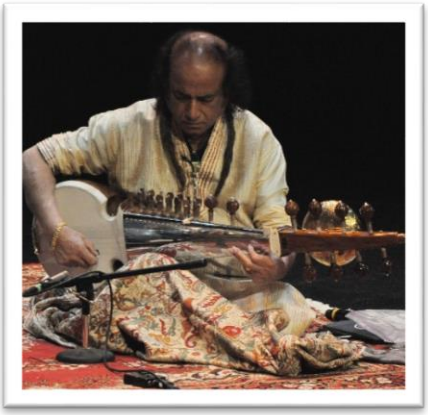

ওস্তাদ আশিশ খাঁ [১৩]

পণ্ডিত হরিপ্রসাদ চৌরাশিয়া [১৪]

তথ্য ও চিত্রসূত্র

১) মোবারক হোসেন খান, *সঙ্গীত দর্পণ*, বাংলা একাডেমি,ঢাকা: ১৯৯৯, পৃ: ৬০

২) প্রাগুক্ত, পৃ: ৬১

৩) প্রাগুক্ত, পৃ: ৬২

৪) প্রাগুক্ত, পৃ: ৬৪

৫) প্রাগুক্ত, পৃ: ৬৪-৬৫

৬) https://www.facebook.com/587506141352529/photos/a.587827571320386/679750308794778/?type=3&theater

৭) https://en.wikipedia.org/wiki/Allauddin_Khan#/media/File:Ustad_Allauddin_Khan_Full_1.jpg

৮) http://en.banglapedia.org/index.php?title=File:KhanUstadAyetAli.jpg

৯) https://en.wikipedia.org/wiki/Ali_Akbar_Khan#/media/File:Dia7275_Ali _Akbar_Khan_r.jpg

১০) http://www.iaslic1955.org/annapurna_devi.html

১১) https://www.bbc.co.uk/music/artists/697f8b9f-0454-40f2-bba2-58f356 68cdbe

১২) https://www.facebook.com/587506141352529/photos/a.587526651350478/590756997694110/?type=3&theater

১৩) https://en.wikipedia.org/wiki/Aashish_Khan#/media/File:Ustad_Aashish _Khan_12.jpg

১৪) https://en.wikipedia.org/wiki/Hariprasad_Chaurasia#/media/File:Hariprasad_Chaurasia_01.jpg

গোলাম আলীর সরোদ ঘরানা

উনিশ শতকের মধ্যভাগে এই ঘরানার সূচনা হয় এবং সংগীতজগতে এই সরোদবাদক পরিবারের উদয় হয়। গোলাম আলীই ছিলেন এই পরিবারের প্রথম খ্যাতনামা সরোদবাদক। পরবর্তী কালে পরিণত বয়সে তাঁর শিষ্য পরম্পরা প্রবর্তিত সরোদবাদন ধারা বিস্তার লাভ করে। তাই এই ঘরোনা গোলাম আলীর সরোদ ঘরানা নামে খ্যাত। একে গোয়ালিয়র সরোদ ঘরানাও বলা হয়ে থাকে। সেইসময় মূলত তিনটি সরোদবাদক বংশের পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন গোলাম আলী খাঁ, নিয়ামতুল্লা খাঁ ও এনায়েত আলী খাঁ। এঁরা তিনজনই কাবুলী রবাব থেকে আধুনিক সরোদবাদনের প্রবর্তন করেন। তবে ওস্তাদ আমজাদ আলী খাঁ দাবী করেছেন যে, আফগানিস্তান থেকে আগত তাঁর পূর্বপুরুষ পাঠান বাঙ্গাশ পরিবারই এর পথিকৃত ছিলেন। তাঁর মতে প্রাচীন রবাবযন্ত্র পরিবর্তন করে আধুনিক রবাবযন্ত্র সৃষ্টি করেছিলেন মহম্মদ হাশমী খাঁ বাঙ্গাশের পুত্র গোলাম বন্দেগী খাঁ বাঙ্গাশ। প্রকৃতপক্ষে এরা সকলেই আফগানিস্তান থেকে এসেছিলেন। এইসকল পাঠানগণ রবাবযন্ত্রে রণসংগীত বাদকরূপে পাঠান সৈন্যদের সাথে আফগানিস্তান থেকে ভারতে আসেন এবং কালক্রমে ভারতের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যান। ভারতীয় সংগীত ও সংগীতজ্ঞদের প্রভাবে তাঁদের বাদনশৈলীতে পরিবর্তন ঘটে এবং বাদ্যযন্ত্রের কাঠামোরও পরিবর্তন শুরু হয়।[১]

গোলাম বন্দেগী খাঁ বাঙ্গাশ কাঠের নির্মিত সরোদ বাজাতেন। তিনি অত্যন্ত গুণীশিল্পী ছিলেন। তিনি মধ্যপ্রদেশের রেওয়া রাজ্যে দরবারী সংগীতজ্ঞরূপে আশ্রয় লাভ করেন। ভারতীয় সংগীতের সংস্পর্শে আসা সত্ত্বেও তিনি রাগালাপ না বাজিয়ে বিভিন্ন লয়ে গৎ বাজাতেন।

গোলাম বন্দেগী খাঁ বাঙ্গাশের পুত্র (কারো মতে পৌত্র) গোলাম আলী তাঁর পিতার কাছেই তালিম নেয়ার পর রেওয়ার দরবারে নিযুক্ত হন এবং রেওয়ার রাজা সংগীতগুণী বিশ্বনাথ সিংহের পৃষ্ঠপোষকতা ও সংগীতে তালিম পান। রেওয়ার রাজদরবারের দরবারী সংগীতজ্ঞ তানসেন বংশীয় জাফর খাঁ ও প্যার খাঁ'র কাছে তিনি রাগবিদ্যা লাভ করেছিলেন বলে কথিত আছে। প্রথমে তিনি কাঠের সরোদযন্ত্রের বাদক থাকলেও পরবর্তী কালে নিয়ামতুল্লা প্রবর্তিত স্টীলপ্লেট সরোদ বাজাতেন বলে জানা যায়। দরবারে নিয়োগপ্রাপ্ত অন্যান্য সংগীতজ্ঞের কাছেও জ্ঞান লাভ করে তিনি সেনী বীণকার ঘরানার একজন উৎকৃষ্ট সংগীতজ্ঞরূপে প্রতিষ্ঠিত হন এবং বিভিন্ন রাজ্য থেকে আমন্ত্রিত হতে থাকেন। পরবর্তী সময়ে তিনি গোয়ালিয়রের রাজদরবারে আশ্রয় লাভ করেন। গোয়ালিয়রের মহারাজা জয়াজীরাও সিন্ধিয়া তাঁকে বসবাসের জন্য একটি অট্টালিকা প্রদান করেন যা আজও গোলাম আলীর সরোদ ঘরানার একটি অমূল্য স্মৃতিস্বরূপ।

গোলাম আলীর তিনপুত্র হোসেন আলী খাঁ, মুরাদ আলী খাঁ ও নান্নে খাঁ- এরা সকলেই উৎকৃষ্ট সরোদবাদক ছিলেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র হোসেন আলী খাঁ সেতার ও সরোদের সমন্বয়ে গঠিত সুরচয়ন, সরোদ ও সুরবাহার বাদনে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। উৎকৃষ্ট আলাপিয়া গোলাম আলী খাঁ পিতার নিকট

সংগীতশিক্ষাসহ সেনী ঘরানার গোলাম মোহাম্মদ খাঁ'র কাছেও তালিম পান। তিনি যে সুরচয়ন বাজাতেন তার তবলী কাঠের নির্মিত এবং অবয়ব সরোদের মত কিন্তু এর পর্দাগুলি ছিল সেতারের মত। এটি সেতারের মেজরাব অথবা সরোদের জর্বার সাহায্যে বাজানো হতো। এই যন্ত্রটি সেতার থেকে আকারে কিছুটা বড় ছিল। আলাপচারীর জন্য এটি ছিল খুবই উপযোগী একটি যন্ত্র। তবে সুরচয়ন ছিল হোসেন আলী খাঁ'র শখের বাদ্যযন্ত্র, সরোদীরূপেই তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠিত।[২]

গোলাম আলীর খাঁ'র দ্বিতীয় পুত্র মুরাদ আলী খাঁ অত্যন্ত গুণী সরোদবাদক ছিলেন। রামপুরে তিনি রাগবিদ্যা লাভ করেন। পিতার ব্যতিরেকে রামপুর ঘরানার অন্যতম প্রবর্তক আমির খাঁ'র নিকট তালিম নিলেও তিনি রামপুরের স্থায়ীবাসিন্দা বা রামপুর ঘরানাদার হননি। আমীর খাঁ ব্যতীত সেনী ঘরানার সুরবাহার বাদক গোলাম মোহাম্মদ খাঁ'র কাছেও তিনি তালিম গ্রহণ করেন এবং কঠোর পরিশ্রম ও সাধনার দ্বারা উৎকৃষ্ট সরোদবাদক হয়ে ওঠেন। বিলম্বিত লয়ে আলাপচারিতে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। নিঃসন্তান হওয়ায় আবদুল্লা খাঁকে তিনি দত্তক পুত্ররূপে গ্রহণ করেন এবং সরোদের উত্তম তালিম দেন।

গোলাম আলীর কনিষ্ঠ পুত্র নান্নে খাঁ (ছুন্নু খাঁ) পিতার নিকটই তালিম পান। তিনি অত্যন্ত গুণী সরোদবাদক ছিলেন এবং রামপুর ও গোয়ালিয়রের দরবারে সংগীতজ্ঞ হিসেবে নিয়োজিত ছিলেন। পিতা ব্যতীত অন্য কোন ওস্তাদের কাছে তিনি তালিম পেয়েছিলেন কিনা সে বিষয়ে তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না।

গোলাম আলীর পৌত্র এবং হোসেন আলীর একমাত্র পুত্র আসগর আলী খাঁ (আহমদ আলী খাঁ) অত্যন্ত প্রতিভাবান সরোদবাদক এবং হোসেন আলী খাঁ'র উপযুক্ত উত্তরসাধক ছিলেন। পিতার তালিমে তিনি উত্তম সরোদ বাদকরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন বটে কিন্তু পিতা ভিন্ন রামপুর ঘরানার আমীর খাঁ'র কনিষ্ঠ ভ্রাতা রহিম খাঁ'র কাছেও তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেন। কথিত আছে, আসগর আলী খাঁ যখন সরোদ বাজাতেন তখন সরোদযন্ত্রে বাঁশীর মত সংগীত সৃষ্টি করতে পারতেন। জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি দ্বারভঙ্গ রাজদরবারে সভাবাদক হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর কোন পুত্র ছিল না। জামাতা আজিজ বক্স উত্তম সরোদবাদক ছিলেন। তবে আসগর আলী নিজ বিদ্যা অন্যকে শেখানোর ক্ষেত্রে ছিলেন খুবই সচেতন এবং কৃপণ। তাই জামাতা আজিজ বক্স তাঁর কাছে তালিম নেয়ার প্রত্যক্ষ সুযোগ পাননি। ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করে যখন তিনি সাধনায় মগ্ন হতেন সেই বাজনা শোনার সৌভাগ্য ও সুযোগ লাভ করতেন তাঁর কন্যা। তাঁর কন্যা সেই বাদনকৌশল স্বামী আজিজ বক্সকে পুনরাবৃত্তি করে শোনাতেন। এভাবেই পরোক্ষভাবে আজিজ বক্স তাঁর শ্বশুর আসগর আলীর সরোদ সম্পদ থেকে সামান্য কিছু লাভ করেছিলেন। ৭০ বছর বয়সে দ্বারভঙ্গেই ১৯১২ সালে আসগর আলী মৃত্যুবরণ করেন।

মুরাদ আলীর দত্তক পুত্র ওস্তাদ আবদুল্লা খাঁ ছিলেন একজন বিখ্যাত সরোদবাদক। পিতার নিকটই তিনি সরোদে তালিম পান। প্রথম জীবনে ময়মনসিংহ জেলার গৌরীপুর স্টেটে নিযুক্ত থাকার পর তিনি বিহারের

দ্বারভঙ্গের দরবারী সংগীতজ্ঞ হিসেবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। সেসময় তিনি জমিদার ব্রজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী, তৎপুত্র বীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, শীতলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রমুখকে শিক্ষাদান করেন। ৮৩ বছর বয়সে দ্বারভঙ্গেই তাঁর মৃত্যু হয়।[৩]

আবদুল্লা খাঁ'র পুত্র ওস্তাদ মহম্মদ আমীর খাঁ দীর্ঘকাল বাংলাদেশে অবস্থানের ফলে বাংলার সংগীত ক্ষেত্রের সাথে গোলাম আলীর সরোদ পরিবারের বিস্তৃতভাবে যোগসূত্র স্থাপিত হয়। যদিও এর সূত্রপাত তাঁর পিতা আবদুল্লা খাঁ'র মাধ্যমেই হয়েছিল। পিতার নিকট শিক্ষালাভের পর আমীর খাঁ একজন সুবিখ্যাত সরোদ বাদকরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। পিতামহ মুরাদ আলীর নিকটও তিনি তালিম গ্রহণ করেন। এরপর তিনি বাংলায় আসেন এবং বিশশতকের প্রথম ভাগে সর্বপ্রথম রাজশাহীর তালন্দে সংগীতজ্ঞ জমিদার ললিত মোহন মৈত্রের আশ্রয় লাভ করেন। আমীর খাঁ সেখানে কয়েক বছর অবস্থানের পর ১৯১৬ সালে ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরীর গৌরীপুর ও কলকাতার সংগীতসভায় নিযুক্ত হন এবং কলকাতার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যান। ১৯৩৪ সালে মাত্র ৫৮ বছর বয়সে কলকাতায় তাঁর দেহান্ত হয়। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী ও তৎপুত্র রাজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, আশুতোষ কুণ্ডু ,বাণী কুমার মুখার্জী, বিমলাকান্ত রায় চৌধুরী, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, রায়বাহাদুর ব্রজেন্দ্রমোহন মৈত্র, কুমার জগৎনাথ মিত্র, নীরেন্দ্র কৃষ্ণ মিত্র, পান্নালাল রায় চৌধুরী, রাধিকা মোহন মৈত্র, শীতলচন্দ্র মুখার্জী, তিমিরবরণ ভট্টাচার্য প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।[৪]

গোলাম আলীর কনিষ্ঠ পুত্র নান্নে খাঁ'র পুত্ররূপ হাফিজ আলীর নাম বংশ তালিকায় উল্লেখ করা হলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি নান্নে খাঁ'র পুত্র নন বলে বিভিন্ন গ্রন্থে উল্লেখ পাওয়া যায় এবং এ বিষয়ে মতভেদ বিদ্যমান। পরবর্তী কালে নানাগুণীর সংস্পর্শে হাফিজ আলীর সংগীতজীবন সমৃদ্ধ হয়। তিনি গোলাম আলীর পরিবারের অতিরিক্ত মথুরার দিকপাল ধ্রুপদী গণেশীলাল চৌবে এবং রামপুর ঘরানার তন্ত্রকার উজীর খাঁ'র কাছে শিক্ষালাভ করেন। সরোদবাদনে দক্ষতার দরুণ তাঁকে সরোদের যাদুকর বলা হয়। তিনি সেতার ও সুরেশৃঙ্গার বাদন এবং ধ্রুপদ-ধামার গায়নেও অদ্বিতীয় ছিলেন। গুরুদের কাছে প্রাপ্ত রাগবিদ্যা তাঁর জীবনে অত্যন্ত ফলপ্রসু হয়েছিল। কুশলী এই সরোদবাদক 'আফতাবে সরোদ', 'দেশিকোত্তম' (বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়) এবং খায়রাগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. লিট. উপাধি পান। এছাড়াও তিনি ১৯২০ সালে গোয়ালিয়রের মহারাজার দরবারে নিযুক্ত হন। ১৯৫৩ সালে তিনি রাষ্ট্রপতি পুরস্কার লাভ করেন ও সংগীত নাটক একাডেমী ফেলো নির্বাচিত হন এবং ১৯৬০ সালে তাকে পদ্মভূষণ উপাধিতে সম্মানিত করা হয়। বিদ্যুৎ গতিতে তাল ও ঝালা বাদন ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য। খুব অল্পসময়ের মধ্যেই তিনি রাগরূপ প্রকাশ করতেন। রসসৃষ্টি ও রাগরূপের বিকাশের প্রতিই তাঁর অধিক মনযোগ ছিল। তিনি ছিলেন গোলাম আলীর সরোদ ঘরানার একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি।

তাঁর দু'জন বাঙালি শিষ্য ছিলেন। তারা হলেন প্রখ্যাত গায়ক লালচাঁদ বড়ালের দ্বিতীয়পুত্র বিষণচাঁদ বড়াল এবং কুমার জগৎনাথ মিত্র। তবে হাফেজ আলীর প্রকৃত শিষ্য ধরা হয় তাঁর শিষ্য ও পুত্র ওস্তাদ আমজাদ আলী খাঁকে। বংশীয় ব্যতিত তাঁর শিষ্যবর্গের মধ্যে কুমার জগৎনাথ মিত্র ও বিষণ চাঁদ বড়াল উল্লেখযোগ্য। ১৯৭২ সালের ২৮ ডিসেম্বর হাফেজ আলী মৃত্যুবরণ করেন।

হাফেজ আলীর জ্যেষ্ঠ পুত্র মুবারক আলী একজন দক্ষ সরোদবাদক ছিলেন। পিতার নিকট শিক্ষা গ্রহণের পর দীর্ঘদিন তিনি ভুপালের মিউজিক কলেজে অধ্যাপনা করেন।

হাফেজ আলী খাঁ'র দ্বিতীয় পুত্র ওস্তাদ রহমত আলী খাঁ অত্যন্ত গুণী ধ্রুপদ অঙ্গের সরোদবাদক ছিলেন। পিতার নিকট তালিম পাওয়ায় তাঁর বাদনে হাফেজ আলীর বাদন বৈশিষ্ট্যের ঝলক পরিলক্ষিত হত। তাঁর বাদনশৈলীতে রাগের শুদ্ধতা কঠোর ভাবে দেখা যেত। দীর্ঘদিন তিনি আকাশবাণীর ধ্রুপদ কেন্দ্রে নিয়োজিত ছিলেন।

হাফেজ আলী খাঁ'র প্রকৃত শিষ্য তাঁর পুত্র আমজাদ আলী খাঁ। ভারতের প্রতিভাবান ও খ্যাতিমান এই শিল্পীর জন্ম ১৯৪৫ সালের ৯ই অক্টোবর। পিতা ব্যতিত কিছুদিন তিনি কৃষ্ণরাও শংকর পণ্ডিতের নিকট তালিম নেন। আকাশবাণী, দুরদর্শনসহ দেশবিদেশের অসংখ্য সংগীত সম্মেলন ও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে তিনি বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করেন। মাত্র ২৫ বছর বয়সেই তাঁর নামের সাথে 'ওস্তাদ' শব্দ যুক্ত হয়। ১৯৬০ সালে প্রয়াগ সংগীত সমিতি থেকে 'সরোদ সম্রাট', ১৯৭০ সালে ইন্টারন্যাশনাল মিউজিক ফোরাম থেকে 'ইউনেস্কো পুরস্কার', ১৯৭৫ সালে 'পদ্মশ্রী', ১৯৭৭ সালে দিল্লীর সাহিত্য কলা পরিষদ থেকে 'বিশেষ সম্মান', ১৯৮০ সালে ভূপালের সংগীতকলা সঙ্গম থেকে 'কলারত্ন', ১৯৮৩ সালে নাগপুরের ভারতীয় বিদ্যাভবন থেকে 'মিউজিসিয়ান অব মিউজিসিয়ানস্', ১৯৮৭ সালে অন্ধ্রপ্রদেশের কলাবেদিকা থেকে 'কলাসরস্বতী অন্ধরত্ন', ১৯৮৭ সালে 'একাডেমী ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড', ১৯৮৯ সালে 'তানসেন পুরস্কার', ১৯৯১ সালে 'পদ্মবিভূষণ'সহ অসংখ্য উপাধি ও পুরস্কার দ্বারা তিনি সম্মানিত হয়েছেন। তাঁর পুত্র আমান আলী ও আয়ান আলীকে তিনি বংশীয় ধারায় সংগীতে তালিম দিয়েছেন। তাঁর অন্যান্য শিষ্যের মধ্যে দিব্যজ্যোতি বসু, গুরুদেব সিংহ, অভীক সরকার, নরেন্দ্রনাথ ধর, মুকেশ সাক্সেনা, সঞ্জয় শর্মা (সরোদ), শরাফৎ খাঁ, কুমারী সরোজ, শ্রীরাম ওমদেকর, সুনীলকান্ত সাক্সেনা (সেতার), কুমারী অনুপ্রিয়া দেওতলে (বেহালা) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

গোলাম আলীর সরোদ ঘরানার আরেক গুণীশিল্পী হলেন অভীক সরকার। ১৯৬৪ সালের ২৯ ডিসেম্বর দিল্লীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা শ্যামল সরকার ছিলেন ওস্তাদ হাফিজ আলী খাঁ'র শিষ্য। পিতার কাছে সংগীতশিক্ষা লাভের পর অভীক সরকার ওস্তাদ আমজাদ আলী খাঁ'র শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন

এবং স্বল্প সময়েই উৎকৃষ্ট সরোদ বাদকরূপে আকাশবাণী, দূরদর্শন তথা দেশের বিভিন্ন সংগীতানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে অনেক প্রশংসিত হয়েছেন।

ওস্তাদ আমজাদ আলী খাঁ'র আরেক শিষ্য কুমারী অনুপ্রিয়া দেওতলে ১৯৬৫ সালের ২৩ আগস্ট মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়নী নগরে জন্মগ্রহণ করেন। শুরুতে তিনি পিএল দণ্ডবতে ও এম.এল কান্তার কাছে সংগীতশিক্ষা নিলেও পরবর্তী কালে ওস্তাদ আমজাদ আলীর শিষ্যা হন। সংগীতে দক্ষতার দরুণ তিনি ১৯৮৮ সালে সুরমনি উপাধি এবং মধ্যপ্রদেশের ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সংগীত একাডেমী থেকে বৃত্তি লাভ করেন। এছাড়াও আকাশবাণী, দূরদর্শনসহ দেশের বিভিন্ন সংগীত সম্মেলন ও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে নিজের সুনাম প্রতিষ্ঠা করেছেন।

গোলাম আলীর সরোদ ঘরানা মূলত সেনী ঘরানারই একটি শাখা। বিভিন্ন সময় সেনী ঘরানার সংগীত গুণীদের দ্বারাই গঠিত হয়েছে সরোদের এই বিখ্যাত ঘরানা।

গোলাম আলীর সরোদ ঘরানার বিখ্যাত সংগীতজ্ঞদের চিত্র:

ওস্তাদ হাফিজ আলী খাঁ [৫]

ওস্তাদ আমজাদ আলী খাঁ [৬]

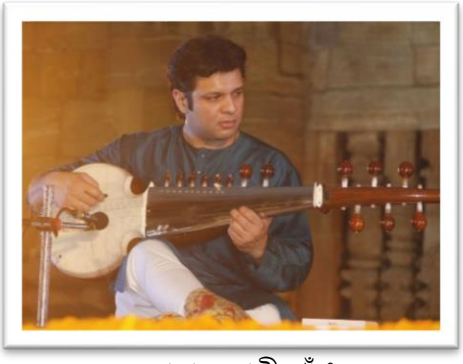

আমান আলী খাঁ [৭]

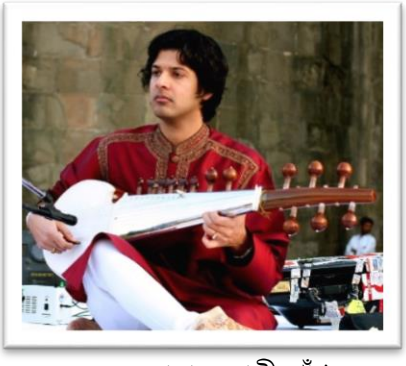

আয়ান আলী খাঁ [৮]

তথ্য ও চিত্রসূত্র

১) করুণাময় গোস্বামী, *সংগীতকোষ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা: ১৯৮৫

২) মোবারক হোসেন খান, *সঙ্গীত দর্পণ*, বাংলা একাডেমি, জুন ১৯৯৯

৩) দিলীপ কুমার মুখোপাধ্যায়, *ভারতীয় সংগীতে ঘরানার ইতিহাস*, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী প্রা:লি:, কলকাতা

৪) প্রাগুক্ত

৫) https://www.youtube.com/watch?v=AVJOTayOad4

৬) http://www.sarod.com/

৭) https://en.wikipedia.org/wiki/Amaan_Ali_Khan#/media/File:Amaan_Ali_Khan_Performing_at_Rajarani_Music_Festival-2016,_Bhubaneswar,_Odish a,_India_(01).JPG

৮) https://en.wikipedia.org/wiki/Ayaan_Ali_Khan#/media/File:Ayaan_Ali_K han_-_Pune_2007_-_2.jpg

নিয়ামতউল্লাহ খাঁ'র সরোদ ঘরানা

ভারতবর্ষে সরোদ যন্ত্রসংগীতের প্রথম প্রচলন দেখা যায় ঊনিশ শতকের মধ্যভাগে। তখন বিশেষ করে তিনটি পরিবার প্রায় একই সময় তাঁদের নিজস্ব পারিবারিক ধারায় সরোদবাদন শুরু করে এবং ধীরে ধীরে তা বিস্তার লাভ করে। সমসাময়িক এই তিন সরোদী বংশের পূর্বপুরুষের নাম যথাক্রমে গোলাম আলী, এনায়েত আলী ও নিয়ামতউল্লাহ খাঁ। নিয়ামতউল্লাহ খাঁ এঁদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ হলেও সরোদী হিসেবে সকলের তুলনায় প্রতিভাবান ছিলেন। তিনি ভারতবর্ষে সরোদবাদনের প্রবর্তকদের মধ্যে অন্যতম। ভারতবর্ষে যখন কাবুলী রবাব থেকে সরোদবাদনের প্রবর্তন হয় তখন কাবুলী রবাবের সংস্কার পূর্বক সরোদ নির্মাণ ও প্রথা অনুসরণ করে তা বাজানোর ক্ষেত্রে নিয়ামতউল্লাহ খাঁ সবচেয়ে কার্যকর অবদান রাখেন এবং অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তাঁর বংশ ও শিষ্যপরম্পরা প্রবর্তিত সরোদ যন্ত্রবাদন ধারাই ঐতিহাসিকভাবে নিয়ামতউল্লাহ খাঁ'র সরোদ ঘরানা নামে পরিচিতি লাভ করে। আনুমানিক ১৮২৭ সালে বুলন্দসরের বাগরাসি গ্রামে নিয়ামতউল্লাহ খাঁ'র জন্ম হয়। যদিও তাঁর পূর্বপুরুষ গজনীবাসী ছিলেন কিন্তু তাঁর ঊর্ধ্বতন তিনপুরুষ থেকেই ভারতবাসী হন। নিয়ামতউল্লাহ খাঁ'র পিতা হকদাদ খাঁ সেইসময়ের কাবুলী রবাববাদক করম খাঁ'র নিকট আত্মীয়াকে বিবাহ করেন এবং তাঁর আমন্ত্রণে হকদাদ খাঁ বুলন্দসরের বাগরাসি গ্রামে তাঁদের বাড়ীর একাংশে বসবাস শুরু করেন। নিয়ামতউল্লাহ্‌র প্রথম কাবুলী রবাব শিক্ষা আরম্ভ হয় করম খাঁ'র কাছেই। লক্ষ্ণৌর নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ্‌'র দরবারে করম খাঁ'র যাতায়াত থাকার সুবাদে সেখানে তানসেন বংশীয় বসত খাঁ'র সাথে নিয়ামতউল্লাহ্‌র যোগাযোগ হয় এবং সেইসময়েই তিনি কাবুলী রবাবের সংস্কার করে আধুনিক সরোদের উদ্ভাবন করেন। এই সরোদযন্ত্র উদ্ভাবনের প্রাথমিক পরিকল্পনাতে তিনি করম খাঁ'র কাছে ঋণী ছিলেন।

"একথার তাৎপর্য এই যে, করম খাঁ কাবুলি-রবাব বাজাতেন সরোদের মতন ক্রোড়ে স্থাপন করে। ভারতে রবাব নামে যে বৃহত্তর যন্ত্র তা ধরবার কায়দা সুরশৃঙ্গারের মতন অর্থাৎ বুকের বাম দিকে খাড়াভাবে রেখে। করম খাঁ সেভাবে অবস্থান করে বাজাতেন না। তবে, যে কাবুলি-রবাব তিনি বাজাতেন তার ধাতুর প্লেট ছিলনা। পুরনো আমলে প্রচলিত কাঠের ওপর তাঁতে বাজানো হত। নিয়ামতউল্লাহ সেই যন্ত্রে বর্তমান সরোদের রূপ দেন স্টীলের প্লেট ও স্টীলেরই তার সন্নিবিষ্ট করে।"[১]

জানা যায় যে, নিয়ামতউল্লাহ খাঁ আধুনিক এই সরোদযন্ত্র আবিষ্কারের কয়েকবছর আগে বসত খাঁ'র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জাফর খাঁ সুরশৃঙ্গার যন্ত্রের প্রবর্তন করেন। তিনি সুরশৃঙ্গার মূলত গঠন করেন রবাবের কাঠের স্থানে ধাতুর প্লেট, তাঁতের পরিবর্তে তার এবং চিকাকার তার যোগ করে। সুরশৃঙ্গার যন্ত্র বাজানোর নিয়মও রবাবের মত বুকে রেখে এবং এটি রবাবের মতই আলাপচারির যন্ত্র, গৎ বাজাবার নয়। পরবর্তী কালে

নিয়ামতউল্লাহ প্রবর্তিত সরোদ যন্ত্রে আলাপচারির সাথে গৎ, তান, তোড়া এবং ঝালা বাজানোর ফলে এই যন্ত্রটি অধিক জনপ্রিয়তা অর্জনে সক্ষম হয়।

নিয়ামতউল্লাহ খাঁ লক্ষ্ণৌ থাকাকালীনই কঠোর সাধনার দ্বারা সরোদবাদনে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন। সেইসময় বসত খাঁ'র অনিচ্ছার কারণে তাঁর তালিম থেকে বঞ্চিত হলেও পরবর্তী কালে যখন ওয়াজেদ আলী লক্ষ্ণৌ থেকে নির্বাসিত হয়ে কলকাতার মেটিয়াবুরুজে বসবাস শুরু করে সংগীত দরবার স্থাপন করেন, তার ক'বছর পর বসত খাঁ ও নিয়ামতউল্লাহ খাঁ ঐ দরবারে নিযুক্ত হন। তখন নিয়ামতউল্লাহ খাঁ বসত খাঁ'র কাছে পূর্ণ তালিমের সুযোগ লাভ করেন। তাই বলা যায় নিয়ামতউল্লাহর সরোদযন্ত্রের শিক্ষা ও চর্চার কেন্দ্রস্থল ছিল কলকাতা। বসত খাঁ'র জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জাফর খাঁ'র পৌত্র ও অত্যন্ত প্রতিভাবান বীণকার রবাবী কাসিম আলী খাঁ'র কাছেও নিয়ামতউল্লাহ খাঁ রাগবিদ্যায় তালিম নেন। সেইসময় কাসিম আলী খাঁ মেটিয়াবুরুজের দরবারে নিযুক্ত ছিলেন। একসঙ্গে থাকার সুবাদে কাসিম আলী- নিয়ামতউল্লাহ'র উপস্থিতিতে দীর্ঘসময় রেওয়াজ করতেন আর মেধাবী নিয়ামতউল্লাহ সেই সঙ্গ লাভের ফলে রাগবিদ্যায় উপকৃত ও পারদর্শী হতেন। ধীরে ধীরে তিনি মেটিয়াবুরুজে সরোদীরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। আধুনিক সরোদযন্ত্র প্রবর্তন করে তাতে গৎ, তোড়া, তান, ঝালা ইত্যাদি সমৃদ্ধ বাদনরীতির প্রবর্তন করে তিনি অত্যন্ত খ্যাতি অর্জন করেন। ওয়াজেদ আলীর মেটিয়াবুরুজের দরবারে কয়েকবছর নিযুক্ত থাকার পর তিনি ১৮৭৪ সালে নেপালের দরবারে যোগ দেন এবং প্রায় ৩০ বছর সেখানে দরবারী বাদকরূপে অবস্থান করেন। ১৯০২ সালে দিল্লীতে সরোদ বাজানোর আমন্ত্রণে আসার কিছুদিন পরই ৭৫ বছর বয়সে নিয়ামতউল্লাহ খাঁ মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর দুই কৃতী পুত্র হলেন কেরামত উল্লাহ্ ও আসাদ উল্লাহ্ খাঁ কৌকভ বা কৌকভ খাঁ। এঁরা দু'জন পরবর্তী কালে পিতার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে হয়ে ওঠেন তাঁর ঐতিহ্যের বাহক।[২]

কেরামত উল্লাহ্র জন্ম হয় ১৮৫১ সালে। পিতার মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স ছিল ৫১ বছর ও তাঁর বৈমাত্রীয় ভ্রাতা আসাদ উল্লাহ্র বয়স ছিল ৩৭ বছর। কাজেই তখন এঁরা দুজনেই পরিণতবয়সী ও সংগীতে যথেষ্ট পারদর্শী ছিলেন। নিয়ামতউল্লাহ ১৮৭৪ সালে নেপালের দরবারে যোগ দেওয়ার সময় তাঁর দুই পুত্রও নেপালে অবস্থান করেন। দীর্ঘ ৩০ বছর নেপালে থাকাকালীন তাঁরা পিতার নিকট সংগীতের নিবিড় শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ লাভ করেন। নিয়ামতউল্লাহ কখনো তাঁর পুত্রদ্বয়কে একসঙ্গে রেওয়াজ করতে বসাতেন আবার কখনো নিজের সাথে বিভিন্ন আসরেও নিয়ে যেতেন। এভাবেই তাঁর দুই পুত্র সরোদযন্ত্রে দক্ষতা অর্জন করেন। নিয়ামতউল্লাহ'র মৃত্যুর পর তাঁর দুই পুত্রের হাতেই এই ঘরানার বাদনরীতি সুরক্ষিত ও সুপ্রচারিত হয়। তাঁর উভয় পুত্রই সরোদ ভিন্ন অন্য যন্ত্রেও পারদর্শী ছিলেন। এঁদের মাধ্যমেই নিয়ামতউল্লাহ খাঁ'র ঘরানা বাংলায় প্রচারিত ও প্রসারিত হয়।

পিতার মৃত্যুর পর পাথুরিয়া ঘাটা ঠাকুরবাড়ির মহারাজা যতীন্দ্র মোহন ও শৌরীন্দ্রমোহনের কল্যাণে কৌকভ খাঁ ১৯০৭ সালে কাশী থেকে কলকাতায় বসতি স্থাপন করেন এবং মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি কলকাতায় অবস্থানপূর্বক অনেক বাঙালি শিষ্যমণ্ডলী গঠন করেন। এসময় তিনি কলকাতার বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগদানপূর্বক শিষ্যদের শিক্ষাদানের মাধ্যমে বাংলায় সরোদবাদন বিশেষভাবে সমাদৃত হয় ও এর ব্যাপক প্রচার ও প্রসার ঘটে। এক বাঙালি শিষ্যের সহায়তায় কৌকভ খাঁ *সংগীত পরিচয় প্রথম ভাগ* নামে বাংলায় একটি পুস্তক রচনা করেন। কৌকভ খাঁ সরোদ ছাড়াও একাধিক যন্ত্রে পারদর্শী ছিলেন এবং তিনি এর শিক্ষাও দিয়ে গেছেন। কখনো কখনো আসরে তিনি ব্যাঞ্জো বাজাতেন। ব্যাঞ্জোতে ভূপালী, বৃন্দাবনী সাড়ং, মাঝ খাম্বাজ, গারা, ঝিলা ও ভৈরবী রাগে তাঁর তিনটি রেকর্ড ছিল বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। কৌকভ খাঁ'র বাঙালি শিষ্যদের মধ্যে ধীরেন্দ্রনাথ বসু সরোদীরূপে অত্যন্ত খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯০৮ সাল থেকে ধীরেন্দ্রনাথ কৌকভ খাঁ'র কাছে সরোদের তালিম নেওয়া শুরু করেন, যার ফলে বাংলায় সরোদবাদনের একটি ধারার প্রবর্তন হয়। কৌকভ খাঁ'র অন্যান্য বাঙালি শিষ্যের মধ্যে হরেন্দ্রকৃষ্ণ শীল (সুরবাহার সেতার), শিবকুমার ঠাকুর (শৌরীন্দ্রমোহনের পুত্র, সেতার), হীরালাল হালদার (সেতার), কালিদাস পাল (এসরাজ), ননী মোতিলাল (সেতার), যতীন্দ্রচরণ গুহ (সেতার), সাখাওয়াৎ হোসেন (জামাতা, সরোদ, এনায়েত আলী সরোদীর পৌত্র), ওয়ালীউল্লা (পুত্র, সেতার) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। তাঁর পুত্র ওয়ালীউল্লাহ খাঁ সেতারীরূপে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। ১৯৫৫ সালে ওয়ালীউল্লাহ মেটিয়াবুরুজে মৃত্যুবরণ করেন।

১৯১৫ সালে কৌকভ খাঁ'র আকস্মিক মৃত্যুর পর 'সংগীত সংঘ' কর্তৃপক্ষ তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কেরামত উল্লাহকে এলাহাবাদ থেকে কলকাতায় আমন্ত্রণ করেন। দীর্ঘ ১৫ বছর কেরামত উল্লাহ্ কলকাতার সংগীতক্ষেত্রে সরোদীরূপে অবস্থান করেন। এসময় ভ্রাতা কৌকভের বেশ কিছু শিষ্য যেমন: ধীরেন্দ্রনাথ, কালিদাস, হরেন্দ্রকৃষ্ণ প্রমুখ তাঁর কাছে শিক্ষাগ্রহণ করেন। জীবনের অন্তিম সময়ে কেরামত উল্লাহ কলকাতা থেকে লক্ষ্ণৌবাসী হন এবং ১৯৩৩ সালে ৮২ বছর বয়সে লক্ষ্ণৌতেই তাঁর মৃত্যু হয়।

কেরামত উল্লার বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র পুত্র ইসতিয়াক পিতার নিকট শিক্ষালাভের বিশেষ সুযোগ পাননি। তিনি কালিদাস পালের শিক্ষায় বিশিষ্ট সরোদ বাদকরূপে খ্যাতিলাভ করেন এবং দিল্লী বেতার কেন্দ্রে সরোদীরূপে যোগদান করেন।

কৌকভ খাঁ'র কন্যা বংশ ও শিষ্য ধীরেন্দ্র বসুর মাধ্যমেই নিয়ামতউল্লাহ খাঁ'র সরোদ ঘরানা প্রবহমান থাকে, পদ্ধতিগত আলাপচারী, প্রথাগত শুদ্ধতা, গৎ, তান, তোড়া, ঝালা ইত্যাদি এই ঘরানার বাদনরীতির বৈশিষ্ট্য বলে স্বীকৃত।

নিয়ামতউল্লাহ খাঁ'র সরোদ ঘরানার বিখ্যাত সংগীতজ্ঞদের চিত্র:

ওস্তাদ নিয়ামতউল্লাহ খাঁ [৩]

ওস্তাদ আসাদউল্লাহ্ খাঁ
(কৌকভ খাঁ) [৪]

ওস্তাদ সাখাওয়াৎ হোসেন খাঁ [৫]

তথ্য ও চিত্রসূত্র

১) দিলীপ কুমার মুখোপাধ্যায়, *ভারতীয় সংগীতে ঘরানার ইতিহাস*, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী প্রা: লি:, কলকাতা: ১৩৮৪, পৃ: ৪৮।

২) প্রাগুক্ত।

৩) দিলীপ কুমার মুখোপাধ্যায়, *ভারতীয় সংগীতে ঘরানার ইতিহাস*, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী প্রা: লি:, কলকাতা: ১৩৮৪।

৪) https://www.youtube.com/watch?v=MHOJJZJ-1S0

৫) https://www.youtube.com/watch?v=eKDBo4mFskI

শাহজাহানপুর সরোদ ঘরানা

রামপুর থেকে প্রায় একশত মাইল পূর্ব-দক্ষিণে এবং লক্ষ্ণৌ থেকে প্রায় দেড়শত মাইল উত্তর-পশ্চিমে শাহজাহানপুর নগর অবস্থিত। শাহজাহানপুর, ফররুখাবাদ ও বুলন্দসর হচ্ছে উত্তর ভারতে সরোদযন্ত্র বাদনের তিনটি প্রধানকেন্দ্র। এই তিনটি স্থানই পাঠান অধ্যুষিত অঞ্চল। কথিত আছে মধ্যযুগে আফগানিস্তান থেকে ভারতে আগত ফৌজের সঙ্গে পাঠান রবাব বাদকেরাও এই নগর সহ উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাস শুরু করেন। ভাগ্যান্বেষী এইসকল যন্ত্রী আফগানরা ফৌজী পাঠানদের মত পুরুষানুক্রমে ভারতবাসী হয়ে যান। এইসকল কাবুলী রবাবীরা ভারতীয় রাগসংগীত ও সংগীতজ্ঞদের সংস্পর্শে এসে ক্রমে তাঁরা ভারতীয় সংগীতজ্ঞ হয়ে ওঠেন। কালের বিবর্তনে কাবুলী রবাবের রূপ পরিবর্তিত হয়ে সরোদ যন্ত্রে পরিণত হয়। বলা হয় যে, আফগানিস্তানে কাবুলী রবাব সারুদ বা সুরুদ নামে পরিচিত ছিল বলেই সম্ভবত এই যন্ত্রটির নাম সরোদ রাখা হয়েছে। সেইসময় শাহজাহানপুরে সরোদের চর্চা অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ার দরুণ সেখানে সরোদীদের এগারটি পাড়া বা মহল্লা গড়ে ওঠে। তাঁদের মধ্যে একটি পরিবার ভারতীয় সংগীতজগতে যথেষ্ট সম্মানের অধিকারী হয়েছিলেন। এই পরিবারের বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ এনায়েত আলী এই ঘরানার প্রচার ও প্রসারে সর্বাধিক কৃতিত্বের দাবীদার। তবে নজফ আলী খাঁ হলেন ভারতবর্ষে এই সরোদ পরিবারের আদিপুরুষ। তাঁর পূর্বপুরুষদের সবাই বংশানুক্রমে কাবুলী রবাববাদক ছিলেন এবং আফগানিস্তানের জালালাবাদ জেলার গজনী শহরে বসবাস করতেন। নজফ আলী খাঁ ভারতে এসে প্রথমে দিল্লীতে এবং পরবর্তী কালে শাহজাহানপুরে বসতি স্থাপন করেন।[১]

নজফ আলীর মত তাঁর পুত্র খালের খাঁ, পৌত্র হুসেন আলী খাঁ সকলেই সেইসময় ক্ষুদ্র সরোদ বা কাবুলী রবাব যন্ত্র বাজাতেন। নজফ আলীর পৌত্র হুসেন আলীই এই বংশে প্রথম ভারতীয় রাগসংগীতের চর্চা আরম্ভ করেন। তিনি তানসেনের পুত্রবংশীয় প্যারে খাঁ'র নিকট কিছুদিন তালিম নেন।

১৯৭০ সালে শাহজাহানপুরে হুসেন আলী খাঁ'র পুত্র এনায়েত আলীর জন্ম হয়। এনায়েত আলীই ছিলেন এই পরিবারে প্রথম স্টীল সরোদবাদক। তাঁর পিতা হুসেন আলী সরোদ ও রবাব যন্ত্রে অত্যন্ত দক্ষ ছিলেন। পিতার নিকটই তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়। পরবর্তী কালে অবশ্য লক্ষ্ণৌ, রামপুর প্রভৃতি সংগীত কেন্দ্রের সাথে তাঁদের যোগসূত্র স্থাপিত হয়। তানসেন বংশীয় কাশিম আলী খাঁ'র শিষ্যত্ব গ্রহণ করার পর থেকেই এই ঘরানা বৃহত্তর সেনী ঘরানার অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হতে থাকে। কাশিম আলী ছিলেন ভাওয়াল রজ্যের দরবারী সংগীতজ্ঞ। এনায়েত আলীও কিছুদিন পর গুরু কাশিম আলীর সাথে ভাওয়ালের মহারাজা

রাজেন্দ্র নারায়ণের সভা সংগীতজ্ঞ নিযুক্ত হন। তিনিই প্রথম ভারতীয় যন্ত্রশিল্পী যিনি ইংল্যান্ডের রাণী ভিক্টোরিয়ার আমন্ত্রণে সিলভার জুবিলী উৎসবের সংগীতানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

মহারাজা রাজেন্দ্রনারায়নের সহায়তায় তিনি সেখানে যাওয়ায় সুযোগ লাভ করেন। তাঁর সঙ্গে তবলায় সঙ্গতকারী হিসেবে মুর্শিদাবাদের আতা হুসেন খাঁ'কে পাঠানো হয়। এনায়েত আলী খাঁ'র মনোমুগ্ধকর বাদনের কারণে পরবর্তী উৎসবেও তিনি আমন্ত্রিত হন। দক্ষতা, সাধনা ও অধ্যবসায়ই এনায়েত আলীর বাদনশৈলীকে অন্যদের থেকে ভিন্ন করে তোলে এবং তার ফলেই এই ঘরানা শাহজাহানপুর সরোদ ঘরানা নামে খ্যাত হয়।

লক্ষ্ণৌ নিবাসী ফিদা হোসেন খাঁ এই ঘরানার আরেক গুণীশিল্পী ছিলেন। ১৮৫৫ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন লক্ষ্ণৌ নিবাসী হুসেন আলী খাঁ। ভারতের একজন শ্রেষ্ঠ সরোদবাদক হিসেবে ফিদা হোসেনকে গণ্য করা হয়। তিনি সরোদ, সুরবাহার, রবাব প্রভৃতি যন্ত্রে অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। প্রখ্যাত সরোদী নিয়ামতউল্লাহ খাঁ'সহ সেনী ঘরানার আমির খাঁ'র কাছেও তিনি তালিম গ্রহণ করেন। এছাড়া দীর্ঘকাল তিনি রামপুরের নবাব হামিদ আলী খাঁ'র দরবারে নিযুক্ত থাকেন। ১৯২৭ সালে এই মহান শিল্পী মৃত্যুবরণ করেন।

এনায়েত আলী খাঁ'র পুত্র সাফায়েত আলী খাঁ ১৮৪৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নিকট সংগীত শিক্ষালাভের পর তিনি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ হন এবং বিভিন্ন রাজসভায় নিযুক্ত থাকেন। বিখ্যাত সরোদী নিয়ামতউল্লাহ খাঁ'র কন্যাকে বিবাহ করার সুবাদে এনায়েত আলীর সঙ্গে নিয়ামতউল্লাহ খাঁ'র বৈবাহিক ও পারিবারিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। জামাতা হওয়া সত্ত্বেও সাফায়েত আলী খাঁ'র বাদনশৈলীতে নিয়ামতউল্লাহ খাঁ'র বাদনশৈলীর কোন প্রভাব পরিলক্ষিত হয়নি একথা সত্য তবে এই দুই ঘরানার মধ্যে একটি নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। ১৯২০ সালে সাফায়েত আলী খাঁ ইহলোক ত্যাগ করেন।[২]

সাফায়েত আলী খাঁ'র পুত্র সাখাওয়াত আলী খাঁ ১৮৭৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নিকট তিনি সরোদে প্রাথমিক শিক্ষালাভ করেন। ধীরে ধীরে তিনি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ সরোদবাদক হয়ে ওঠেন এবং জু'নগরের নবাব রসুল খাঁ'র দরবারী সংগীতজ্ঞ হিসেবে নিযুক্ত হন। সাখাওয়াত খাঁ নিয়ামতউল্লাহ খাঁ'র পুত্র কৌকভ খাঁ'র কন্যাকে বিবাহ করায় কৌকভ খাঁ'র কাছেও তালিম পাওয়ার সুযোগ লাভ করেন। ১৯৩৫ সাল থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত লন্ডন ও বার্লিনসহ ইউরোপের বিভিন্ন স্থান তথা অন্যান্য দেশেও সংগীত পরিবেশন ও অনুষ্ঠানে যোগদান করে তিনি অত্যন্ত প্রশংসিত হন। লক্ষ্ণৌর ভাতখণ্ডে সংগীত বিদ্যাপীঠে প্রায় ৩০ বছর অধ্যাপকরূপে থাকার পর ১৯৫৪ সালে এই মহান শিল্পী মৃত্যুবরন করেন।

সাখাওয়াত আলী খাঁ'র জ্যেষ্ঠ পুত্র উমর খাঁ ১৯১২ সালে কলকাতার মেটিয়াবুরুজে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নিকট সরোদে তালিম গ্রহণের পর তিনি অত্যন্ত দক্ষ সরোদ বাদকরূপে খ্যাতিলাভ করেন। দেশের বিভিন্ন সংগীতানুষ্ঠানে অংশগ্রহণসহ তিনি পিতার সাথে সহযোগী শিল্পীরূপে ইউরোপের নানাস্থানে ভ্রমন করেন। গুণী সরোদবাদক হওয়ার পাশাপাশি তিনি দক্ষ গায়ক হিসেবেও প্রসিদ্ধি লাভ করেন। লক্ষ্ণৌর ভাতখণ্ডে সংগীত বিদ্যাপীঠে ১৫ বছর অধ্যাপনার পর তিনি জলপাইগুড়ির দরবারে নিযুক্ত হন এবং সেখানকার নবাব পুত্রী বেগম জব্বার সাহেবা ও সন্তোষ স্বামীকে শিক্ষাদান করেন। এছাড়া বংশীয় অনেকেই তাঁর কাছে শিক্ষালাভের সুযোগ পান। কলকাতা নিবাসী হয়ে বাঙালি শিষ্যদের সরোদসহ অন্যান্য যন্ত্রের শিক্ষাদানের মাধ্যমে উমর খাঁ তাঁর ঘরানাকে বাংলায় জনপ্রিয় করে তুলেছেন। ১৯৮৬ সালে এই মহান শিল্পী মৃত্যুবরণ করেন।[৩]

সখাওয়াত আলী খাঁ'র দ্বিতীয় পুত্র ইলিয়াস খাঁ ১৯১৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ভারতবর্ষে একজন বিখ্যাত সরোদ বাদকরূপে স্বীকৃত। বংশীয় ব্যতিরেকে তিনি লক্ষ্ণৌর আব্দুল গনি খাঁ ও ইউসুফ আলী খাঁ'র কাছে সংগীতে তালিম গ্রহণ করেন। ইলিয়াস খাঁ দীর্ঘদিন লক্ষ্ণৌর ভাতখণ্ডে মিউজিক কলেজে (পূর্বতন মরিস কলেজ) যন্ত্রসংগীত বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। বিখ্যাত গজলসম্রাজ্ঞী বেগম আখতার তাঁর শিষ্যা ছিলেন।

সখাওয়াত আলীর এই দুই পুত্র উমর-ইলিয়াস ভাতৃদ্বয়ের মাধ্যমেই বস্তুত এনায়েত আলীর প্রতিষ্ঠিত শাহজাহানপুর সরোদ ঘরানা বর্তমানকাল পর্যন্ত পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে। ধ্রুপদাঙ্গ বাদন, ঘরানাদার গৎ, তোড়া, তান, ঝালা ইত্যাদি সহযোগে বিশুদ্ধ রাগ পরিবেশনই এই ঘরানার প্রধান সাংগীতিক বৈশিষ্ট্য।

শাহজাহানপুর সরোদ ঘরানার বিখ্যাত সংগীতজ্ঞদের চিত্র:

ওস্তাদ উমর খাঁ [৪]

ওস্তাদ ইলিয়াস খাঁ [৫]

তথ্য ও চিত্রসূত্র

১) করুণাময় গোস্বামী, *সংগীতকোষ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা: ১৯৮৫

২) দিলীপ কুমার মুখোপাধ্যায়, *ভারতীয় সংগীতে ঘরানার ইতিহাস*, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী প্রা: লি:, কলকাতা: ১৩৮৪

৩) প্রাগুক্ত

৪) https://allevents.in/kolkata/ustad-umar-khan-sangit-sabha-concert/207503 4129189780

৫) https://www.youtube.com/watch?v=HBp7RiquFHg

এমদাদ খাঁ'র সেতার-সুরবাহার ঘরানা

এমদাদ খাঁ'র শিষ্য ও বংশ পরম্পরা থেকেই এই ঘরানার সূত্রপাত। এমদাদ খাঁ'র পিতা ছিলেন সাহাবদাদ খাঁ। তিনি হিন্দু রাজপুত ছিলেন এবং নাম ছিল সাহেব সিং (হদ্দু সিং)। ধর্মান্তরিত হওয়ার পর হন সাহাবদাদ খাঁ। তিনি অতিগুণী ধ্রুপদ, সারেঙ্গী ও জলতরঙ্গবাদক ছিলেন। সাহাবদাদ খাঁ'র পিতা উত্তরপ্রদেশের এটাওয়া নিবাসী সুজান সিংহ ধ্রুপদ বাদনে পারদর্শী ছিলেন এবং দিল্লীর মোঘল দরবারে নিযুক্ত ছিলেন। সাহাবদাদ খাঁ তাঁর পিতা ব্যতিরেকে নির্মল শাহ (সেনী) এবং গোয়ালিয়র ঘরানার হস্‌সু ও হদ্দু খাঁ'র কাছে তালিম গ্রহণ করেন। সাহাবদাদ খাঁ প্রধানত খেয়াল গায়ক ছিলেন এবং শখে সেতার বাজাতেন।[১]

১৮৪৮ সালে উত্তরপ্রদেশের এটাওয়া নগরীতে সাহাবদাদ খাঁ'র পুত্র এমদাদ খানি বাজের প্রবর্তক ও অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী এমদাদ খাঁ'র জন্ম হয়। পিতার নিকট তাঁর সংগীতশিক্ষা শুরু হয়। সাহাবদাদ খাঁ পুত্রকে খেয়াল গানের শিক্ষা দিয়েছিলেন কিন্তু যন্ত্রসংগীতের প্রতি এমদাদ খাঁ'র একান্ত আগ্রহের কারণে তিনি সেতার ও সুরবাহার চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। দেশের বিভিন্ন সংগীতকেন্দ্র পরিক্রম করে তিনি নানা গুণীর নিকট শিক্ষালাভের সুযোগ পান। তিনি ইন্দোরের বীণকার কিরানা ঘরানার বন্দে আলী খাঁ, জয়পুর ঘরানার সেতারী অমৃত সেন ও রজব আলী খাঁ ও কলকাতার সুরবাহারী সেনী ঘরানার সাজ্জাদ মহম্মদ খাঁ'র কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেন। স্বল্প সময়ে তিনি অপ্রতিদ্বন্দী সেতার ও সুরবাহার বাদকরূপে ভারতবর্ষে খ্যাতিলাভ করেন। বিভিন্ন সময়ে তিনি নওগা, বেনারস, লক্ষ্ণৌর ওয়াজেদ আলী শাহ ও কলকাতার মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও শেষবয়সে বরোদা ও ইন্দোরের দরবারে সভা সংগীতজ্ঞরূপে স্বল্পকাল করে নিয়োজিত ছিলেন। সেতার ও সুরবাহার বাদনে চর্চা ও সাধনার মাধ্যমে এমদাদ খাঁ এই দুই যন্ত্রেরই প্রসিদ্ধবাদক হয়ে উঠেছিলেন। সুরবাহারে তিনি প্রথমে খেয়াল অঙ্গের আলাপ ও পরে গৎ বাজাতেন। এমদাদ খাঁ সেতারবাদনের কিছু রেকর্ড করেছিলেন। তিনি সেতারে দরবারী কানাড়ার আলাপ এবং ভৈঁরো, ইমনকল্যাণ, বেহাগ, কাফি, সোহিনী ও খাম্বাজ রাগের গৎ রেকর্ড করেন। আর সুরবাহারে শুধু জৌনপুরী রাগের আলাপের রেকর্ড পাওয়া যায়। কলকাতায় বসবাসকালীন অধিকাংশ সময় তিনি সংগীতপ্রেমী তারাপ্রসাদ ঘোষের আশ্রয়ে কাটান। শেষ বয়সে তিনি ইন্দোরে অবস্থান করেন এবং ১৯২০ সালে এটাওয়া থেকে ইন্দোর যাওয়ার সময় ট্রেনে তাঁর মৃত্যু হয়। বংশীয় ছাড়া তাঁর শিষ্যের মধ্যে কল্যাণী মল্লিক (সেতার), ড. প্রকাশ চন্দ্র সেন (এস্রাজ), ব্রজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী ও মম্মন খাঁ (সারেঙ্গী) উল্লেখযোগ্য।[২]

এমদাদ খাঁ'র দুই পুত্রের মধ্য জ্যেষ্ঠ পুত্র এনায়েত খাঁ'র জন্ম হয় আনুমানিক ১৮৯৪ সালের ১৬ জুন এটাওয়াতে। পিতার নিকট তাঁর সংগীতের প্রারম্ভিক শিক্ষা শুরু হয়। পিতার সাথে তিনি ইন্দোর রাজদরবারে নিযুক্ত থাকেন। পরবর্তী কালে তিনি জয়পুরের আল্লাদিয়া খাঁ, আল্লাবন্দে খাঁ ও জাকির উদ্দিন খাঁ'র কাছে তালিম গ্রহণ করে অত্যন্ত দক্ষ সেতার ও সুরবাহার বাদকরূপে খ্যাতি অর্জন করেন। ধ্রুপদ-ধামার তথা সংগীতশাস্ত্রে তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। পিতার মৃত্যুর পর কলকাতা এসে তিনি এমদাদ খাঁ'র অত্যন্ত কাছের মানুষ প্রখ্যাত সংগীতজ্ঞ তারা প্রসাদ ঘোষের আশ্রয় লাভ করেন।

"১৯২৪ সালে গুরুভ্রাতা ব্রজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরীর ইচ্ছানুসারে তিনি গৌরীপুর স্টেটের সভা সংগীতজ্ঞ নিযুক্ত হন এবং সেখানেই স্থায়ীরূপে বসবাস আরম্ভ করেন। ১৯৩৮ সালে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত সংগীত সম্মেলনে তিনি আমন্ত্রিত হন কিন্তু হঠাৎ অসুস্থ হওয়ায় বালক বিলায়ত খাঁকে দিয়ে সেই অনুষ্ঠান করানো হয়। অসুস্থ অবস্থায় তিনি কলকাতায় চলে আসেন। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যেই ১৯৩৮ সালের ১১ নভেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়। বংশধর ছাড়া তাঁর শিষ্যের মধ্যে অমিয়কান্ত ভট্টাচার্য, ক্ষেত্রমোহন ঠাকুর, জন গোমেশ, জিতেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, জ্যোতিন্দ্র চৌধুরী, জ্ঞানদাকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী (কালীপুর), ধ্রুবতারা যোশী, বিপিনচন্দ্র দাস, বিমলাকান্ত রায় চৌধুরী ও বীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী (গৌরীপুর), বীরেন্দ্র মিত্র, ব্রজেশ্বর নন্দী, ভোলানাথ মল্লিক, মনোজমোহন রায়, মনোরঞ্জন মুখার্জী, রেনুকা সাহা, শ্রীনিবাস রাগ, শ্রীপতি দাস ও হরেন্দ্র মোহন দাশগুপ্ত উল্লেখযোগ্য।"[৩]

সুরবাহার যন্ত্রে এনায়েত খাঁ'র আলাপচারীর রেকর্ড পাওয়া যায় বাগেশ্রী, মূলতানী, বেহাগ ও ভৈঁরো রাগে। আর সেতারের গৎ-এর মধ্যে পিলু (ঠুমরী), খাম্বাজ (ঠুমরী), ভৈরবী (ঠুমরী), যোগিয়া, ভুপালী ও তিলোককামোদ রাগের রেকর্ড পাওয়া যায়।

ওস্তাদ এমদাদ খাঁ'র দ্বিতীয় পুত্র ওয়াহিদ খাঁ'র জন্ম হয় ১৮৯৬ সালে এটাওয়া নগরে। পিতার নিকট তালিম গ্রহণের পর তিনি একজন দক্ষ সেতারবাদক ও গায়করূপে প্রতিষ্ঠিত হন এবং পিতার সাথে ইন্দোর রাজদরবারে নিযুক্ত হন। পরবর্তী কালে পিতার মৃত্যুরপর তিনি পাঞ্জাবের পাতিয়ালা স্টেটের সভাসংগীতজ্ঞ নিযুক্ত হন। সেখানে কিছুকাল অতিবাহিত করে কলকাতায় আসেন এবং জীবনের শেষসময় পর্যন্ত কলকাতায়ই অবস্থান করে ১৯৬১ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

শাহারানপুরের এক প্রসিদ্ধ সংগীত পরিবারের কন্যা ও এনায়েত খাঁ'র পত্নী বসীরন বিবি ছিলেন এক উৎকৃষ্ট গায়িকা। প্রসিদ্ধ গায়ক পিতা বন্দে হুসেন খাঁ ও ভ্রাতা জিন্দা হুসেন খাঁ'র কাছে তিনি সংগীতে তালিম পান। স্বামীর অকাল মৃত্যুর পর তিনি স্বয়ং তাঁর দুই পুত্রের সংগীতের শিক্ষাভার গ্রহণ করেন।

ওস্তাদ এনায়েত খাঁ'র জ্যেষ্ঠ পুত্র ওস্তাদ বিলায়েত খাঁ ১৯২৮ সালে ময়মনসিংহ জেলার গৌরীপুর স্টেটে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সেতার বাদকরূপে অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ছিলেন। মাত্র ১১ বছর বয়সে পিতার অকাল মৃত্যুর পর মাতা বসীরণ বিবির কাছেই তিনি শিক্ষালাভ করেন। পরবর্তী কালে বিলায়েত খাঁ একাধিক গায়ক শিল্পীর কাছে সংগীতশিক্ষা লাভ করেন। বিশেষ করে মাতামহ বন্দে হোসেন ও মাতুল জিন্দা হোসেনের মত খেয়াল গায়কদের কাছে তিনি তালিমপ্রাপ্ত হন। মাতামহ বন্দে হোসেন খাঁ'র কাছে তিনি ১৯৩৮ সাল থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত তালিম নেন। চাচা ওয়াহিদ খাঁ'র কাছে সুরবাহার এবং কিছুদিন আগ্রা ঘরানার ফৈয়াজ খাঁ'র কাছেও শিক্ষালাভ করেন। ১৯৪৪ সালে মুম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত সংগীত সম্মেলনে বাজিয়ে তিনি এতটাই দর্শকশ্রোতাকে বিমোহিত করেছিলেন যে তাদের অনুরোধে তাঁকে পাঁচবার মঞ্চে অবতীর্ণ হতে হয়। দেশ বিদেশে সংগীত পরিবেশন করে তিনি অত্যন্ত খ্যাতি অর্জন করেন। মধ্যপ্রদেশ সরকার কর্তৃক তিনি 'কালিদাস শিখর' সম্মান প্রাপ্ত হন। তাঁর পুত্র সুজাত খাঁ ভারতের একজন প্রসিদ্ধ সেতারবাদক হিসেবে খ্যাত। আত্মীয় ব্যতিরেকে তাঁর শিষ্যের মধ্যে অরবিন্দ পারেখ, কালীনাথ মুখার্জী, কল্যাণী রায়, বিন্দু বনাবেরী, বেঞ্জামিন গোমেশ ও হসমত আলী খাঁ উল্লেখযোগ্য।[৪]

ওস্তাদ এনায়েত খাঁ'র কনিষ্ঠ পুত্র ও ওস্তাদ বিলায়েত খাঁ'র (অগ্রজ) শিষ্য ইমরাত খাঁ ১৯৩৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইমরাত খাঁ একজন সুবিখ্যাত সেতারবাদক হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। বিলায়েত খাঁ'র সাথে দেশ বিদেশের বিভিন্ন সংগীতানুষ্ঠান ও সংগীত সম্মেলনে অংশগ্রহণ, একক ও যুগল রেকর্ড, আকাশবাণীতে অংশগ্রহণ, ১৯৮৮ সালে ইমরত খাঁ 'সংগীত নাটক একাডেমী' পুরস্কার লাভ ইত্যাদির মাধ্যমে তিনি অত্যন্ত যশস্বী হয়েছেন। তাঁর পুত্র বজহত খাঁ উদীয়মান সেতারীরূপে খ্যাতিলাভ করেছে।

ওস্তাদ এনায়েত খাঁ'র দৌহিত্র (কন্যা নসীরন বিবির পুত্র) রইস খাঁ অত্যন্ত অল্প বয়সেই সুদক্ষ সেতার বাদকরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। তবে রইস খাঁ অন্য ঘরানার। তাঁর পিতা মহম্মদ খাঁ কিরানা ঘরানার বিখ্যাত বীণকার ছিলেন। পিতার নিকট তিনি তালিম পান। মাতুল বিলায়েত খাঁ'র কাছেও তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেন। সাধনা ও বিচক্ষণতার মাধ্যমে তিনি সেতারবাদনে বিশ্বজোড়া খ্যাতিলাভ করেছেন।

এছাড়াও কলকাতা নিবাসী জন গোমেশ, প্রসিদ্ধ সেতারবাদক জিতেন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, ভবানীপুরের জমিদার রায়বাহাদুর চৌধুরীর পুত্র জ্যোতিশচন্দ্র চৌধুরী, সুবিখ্যাত সেতারবাদক-গায়ক-সংগীতশাস্ত্রী ধ্রুবতারা যোশী, বাংলার সুপ্রসিদ্ধ সংগীতজ্ঞ বিপিণ চন্দ্র দাস, বাংলার প্রসিদ্ধ সংগীতজ্ঞ ও উৎকৃষ্ট সেতারবাদক মনোরঞ্জন মুখার্জী, বাংলার বিখ্যাত সেতারবাদক শ্রীনিবাস নাগ, অনিল কুমার রায় চৌধুরী, কালীনাথ মুখার্জী, প্রসিদ্ধ সেতারবাদক শ্রীপতি দাস, দিলীপ বসু, সেতারী কল্যাণী রায়, অঞ্জন চ্যাটার্জী, কলকাতা নিবাসী অমৃতলাল ব্যানার্জী, ডা. তৃণা পুরোহিত, ডা. সতী ঘোষ, দিপ্তী চন্দ্র, নৃপেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী,

বিশ্বজিত ঘোষ, রজনীকান্ত চতুর্বেদী, শংকর কুমার ঠাকুর, শক্তিধারা চ্যাটার্জী, তুষার মুখার্জী প্রমুখ শিল্পীবৃন্দ এই ঘরানার এক একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। এভাবেই নিজ বংশ ও শিষ্য পরম্পরা নিয়ে এমদাদ খাঁ'র সেতার ও সুরবাহার ঘরানা বর্তমানকাল পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে।

এমদাদ খাঁ'র সেতার ও সুরবাহার ঘরানা ঘরানার বিখ্যাত সংগীতজ্ঞদের চিত্র:

ওস্তাদ এমদাদ খাঁ [৫]

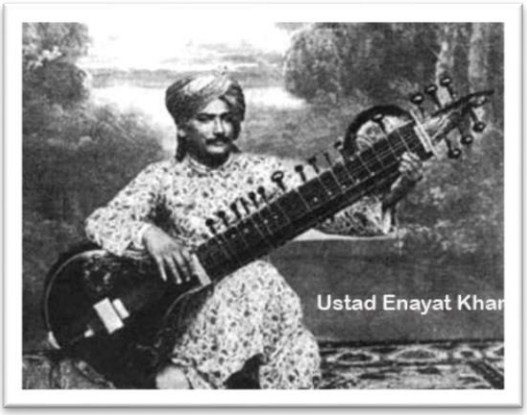

ওস্তাদ এনায়েত খাঁ [৬]

ওস্তাদ ওয়াহিদ খাঁ [৭]

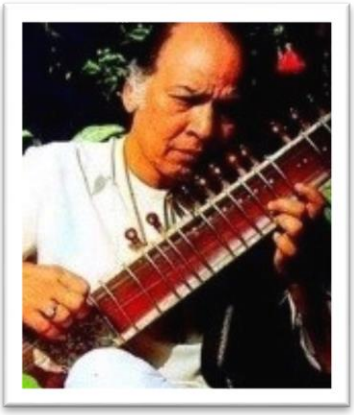
ওস্তাদ বিলায়েত খাঁ [৮]

ওস্তাদ ইমরাত খাঁ [৯]

তথ্য ও চিত্রসূত্র

১) করুণাময় গোস্বামী, *সংগীতকোষ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা: ১৯৮৫।

২) দিলীপ কুমার মুখোপাধ্যায়, *ভারতীয় সংগীতে ঘরানার ইতিহাস*, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী প্রা: লি:, কলকাতা: ১৩৮৪।

৩) অমল দাশ শর্মা, *প্রাচীন ও নবীন সংগীতজ্ঞ এবং ঘরানার ইতিবৃত্ত*, দরবারী প্রকাশন, কলকাতা: ১৯৯৫, পৃ: ৩১০-৩১১।

৪) প্রাগুক্ত।

৫) http://vilayatkhan.com/vk/?page_id=2

৬) http://vilayatkhan.com/vk/?page_id=2

৭) http://vilayatkhan.com/vk/?page_id=2

৮) http://vilayatkhan.com/vk/?page_id=2

৯) http://vilayatkhan.com/vk/?page_id=2

ইন্দোর বীণকার ঘরানা

ভারতের ইন্দোর রাজ্যের বিখ্যাত বীণকার বন্দে আলী খাঁ কর্তৃক রচিত বীণাবাদন ঘরানা ইন্দোর ঘরানা নামে পরিচিত। কেউ কেউ একে বন্দে আলীর বীণা ঘরানাও বলে থাকেন। ১৮৩০ সালে কিরানায় ওস্তাদ গোলাম জাফর খাঁ'র পুত্র বন্দে আলী খাঁ'র জন্ম হয়। কিরানায় জন্মগ্রহন করলেও তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় ইন্দোরে থেকে বীণকার ঘরানার প্রবর্তন করেন। বন্দে আলীর বীণাচর্চা কিরানা ঘরানা থেকে প্রাপ্ত নয়। এমনকি তাঁর পূর্বপুরুষদের থেকেও তিনি তেমন শিক্ষালাভ করেননি। মাতুল জয়পুরের বহরম খাঁ'র কাছে তিনি তালিম পেয়েছিলেন। তিনি গোয়ালিয়রের প্রসিদ্ধ গায়ক হদ্দু খাঁ'র কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। ইন্দোরে অবস্থানকালে সেইসময় তাঁর প্রথম শিষ্য হন মুরাদ খাঁ। তিনিও ইন্দোর নিবাসী ছিলেন। মুরাদ খাঁ ই তাঁর নিকট বীণাবাদনে তালিম পান। বাকী যারা তাঁর শিষ্য ছিলেন তাঁরা সকলেই কণ্ঠসংগীতে শিক্ষাগ্রহন করেছিলেন। মুরাদ আলী খাঁ তাঁর নিকট শিক্ষালাভের পর ইন্দোরে বীণকার শিষ্যমণ্ডলী গড়ে তোলেন যারা সকলেই ইন্দোরের বাসিন্দা ছিলেন। সেইসকল শিষ্যমণ্ডলী আবার কেউ তাদের পুত্রকে, কেউ বা আত্মীয়কে অথবা ছাত্রকে শিক্ষাদানের মাধ্যমে এই ঘরানা বিস্তার লাভ করে এবং পরবর্তী পর্যায়ে এই বীণাবাদন ধারা প্রসারিত হয়। এভাবেই গড়ে ওঠে ইন্দোর বীণকার ঘরানা। মাতুল ধ্রুপদী বৈরাম খাঁ'র নিকট বন্দে আলী খাঁ ধ্রুপদ গানে তালিম নেন। ধ্রুপদের এই শিক্ষা ছিল তাঁর সংগীত জীবনের ভিত্তি। তিনি বীণাবাদনে আকৃষ্ট হন আপন প্রবণতায়। বন্দে আলী খাঁ কারো তালিমে বীণকার হননি। তাঁর সাধনার ফলস্বরূপ বীণাবাদনের একটি স্বতন্ত্র ধারার পত্তন হয়েছিল। ইন্দোর ঘরানা বলতে সেখানকার বীণকার ঘরানাকেই বোঝানো হয়ে থাকে যার উৎসমূলে আছেন বীণাসাধক বন্দে আলী খাঁ।[১]

বন্দে আলী খাঁ যেমন বীণাবাদনে তাঁর অসাধারণ দক্ষতার কারণে প্রসিদ্ধ ছিলেন, তেমনি তন্ত্রবাদনে তাঁর একমাত্র উত্তরাধিকারী মুরাদ খাঁ সাধনা দ্বারা তাঁর যোগ্য উত্তরসাধক হয়ে ওঠেন। নিঃসন্তান মুরাদ খাঁ বরাবরই ইন্দোর নিবাসী ছিলেন। বীণাবাদনে বন্দে আলী খাঁ'র একমাত্র উত্তরাধিকারী মুরাদ খাঁ হলেও মুরাদ খাঁ'র চারজন বীণকার শিষ্য ছিলেন। এঁরা হলেন- বাবু খাঁ, লতিফ খাঁ ও মজিদ খাঁ ভ্রাতৃদ্বয় এবং রজব আলী। তাঁদের মধ্যে রজব আলী প্রতিষ্ঠিত হন খেয়াল গায়করূপে। বিভিন্ন দরবার বা আসরে রজব আলী বীণাবাদন না করে খেয়াল গানই গাইতেন। শুধুমাত্র ঘরানার আসরে তিনি বীণা বাজাতেন। সেই কারণে রজব আলীর কোন বীণকার শিষ্যের তথ্যও পাওয়া যায় না। মুরাদ খাঁ'র অপর তিন শিষ্য বাবু খাঁ, লতিফ খাঁ ও মজিদ খাঁ বীণকার রূপেই প্রসিদ্ধ ছিলেন। এঁরা সকলেই ইন্দোর নিবাসী ছিলেন বলে মুরাদ খাঁ হয়েছিলেন বন্দে আলী খাঁ'র বীণাবাদনের যোগ্য উত্তরসূরী এবং ধারক ও বাহক। এঁদের মধ্যে

বীণাবাদনে সবচেয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করেন বাবু খাঁ। বাবু খাঁ'র শিষ্য জাফর খাঁ সেতারীরূপে সুপ্রসিদ্ধ হয়েছেন। মুরাদ খাঁ'র অপর শিষ্য লতিফ খাঁ ছিলেন অপুত্রক। তাঁর ভ্রাতা মজিদ খাঁ'র পুত্র মহম্মদ খাঁ বীণকার রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। পিতা মজিদ খাঁ'র নিকটই মহম্মদ খাঁ শিক্ষালাভ করেন। মহম্মদ খাঁ'র পুত্র রইস খাঁ সাম্প্রতিক কালের বিখ্যাত সেতারীরূপে খ্যাত। এখানে উল্লেখ্য যে, রইস খাঁ হলেন বিখ্যাত সেতারবাদক এনায়েত খাঁ'র দৌহিত্র।[২]

বন্দে আলী খাঁ ও মুরাদ খাঁ'র এই ইন্দোর বীণকার ঘরানা মুরাদ খাঁ'র চার শিষ্যের পর ধীরে ধীরে সেতারে রূপান্তরিত হয়েছে এবং সেতার বাদনে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

ইন্দোর বীণকার ঘরানা ঘরানার বিখ্যাত সংগীতজ্ঞদের চিত্র:

ওস্তাদ বন্দে আলী খাঁ [৩]

ওস্তাদ মুরাদ খাঁ [৪]

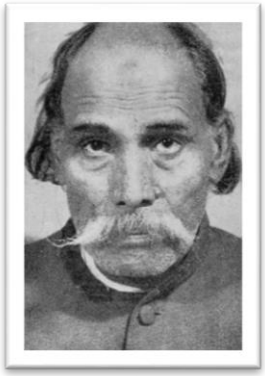

ওস্তাদ রজব আলী খাঁ [৫]

১) দিলীপ কুমার মুখোপাধ্যায়, *ভারতীয় সংগীতে ঘরানার ইতিহাস*, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী প্রা: লি:, কলকাতা: ১৩৮৪।

২) প্রাগুক্ত।

৩) http://rudravina.com/html_gb/pop_musn7.html

৪) http://www.hindrajdivekar.org/photogallery/view_photo/80

৫) https://www.parrikar.org/vpl/?page_id=462

দিল্লী তবলা ঘরানা

"দিল্লীর সিংহাসনে মহম্মদ শাহ রঙ্গীলে (১৭১১-১৭৪৮) ছিলেন সংগীতের একজন একনিষ্ঠ সেবক, তাঁর রাজসভায় বহু বিদগ্ধ সংগীতজ্ঞ জ্ঞানী ছিলেন। ঐ সময় থেকেই ধীরে ধীরে ভারতের উচ্চাঙ্গ সংগীতের দিক পরিবর্তন শুরু হয়। ধ্রুপদ, ধামার, বীণা, সুরবাহার ইত্যাদির স্থানে খেয়াল, ঠুমরী, দাদ্‌রা, কাওয়ালী, সেতার এবং সেইসাথে পাখোয়াজের স্থানে তবলার আধিপত্য বিস্তার লাভ করতে থাকে। মহম্মদ শাহের দরবারে তখন বিখ্যাত কণ্ঠশিল্পী নিয়ামৎ খাঁ অর্থাৎ 'সদারঙ্গ' শিরোমনি গায়ক ছিলেন। তিনি ধ্রুপদ ও বীণা অর্থাৎ যুগপৎ কণ্ঠে এবং যন্ত্রেও বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। বস্তুত: তাঁরই প্রচেষ্টায় ঐ যুগে খেয়াল এবং তার সাথে তবলা যন্ত্রবাদন বিস্তার লাভ করতে থাকে। তাঁর রচিত বহু খেয়াল গান আজও সমান আদরণীয়। ঠিক ঐ সময়েই বিশিষ্ট তবলা বাদক তথা দিল্লী ঘরানার জনক ওস্তাদ সিধার খাঁ'র আবির্ভাব।"[১]

খলিফা আমির খুসরো (১২৩৪-১৩২৫) বংশীয় তবলা নওয়াজ বড়ে আমান আলী খা'রঁ জ্যেষ্ঠ পুত্র সুধার খাঁ (সিদ্ধার খাঁ) কে দিল্লী তবলা ঘরানার প্রবর্তক বলা হয়। বড়ে আমান আলী খাঁ অতিগুণী পাখোয়াজ ও তবলা বাদক ছিলেন। ফারসি ভাষায় তিনি *হাঙ্গামে তবলা নওয়াজী* নামক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর পুত্র সুধার খাঁ বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ এবং অদ্বিতীয় তবলা ও পাখোয়াজ বাদক হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। সুধার খাঁ'র বংশ ও শিষ্য প্রশিষ্যক্রমে বিস্তৃত তবলা বাদন ধারাই দিল্লী তবলা ঘরানা নামে পরিচিতি লাভ করে। পদ্ধতিগত তবলা বাদনে সুধার খাঁ ছিলেন অদ্বিতীয়। তাঁর প্রবর্তিত তবলা বাদন ধারাকে দিল্লী তবলাবাজও বলা হয়। সুধার খাঁ'র তিনপুত্র বুগরা খাঁ, ঘসিট খাঁ ও মেহতাব খাঁ। জ্যেষ্ঠ পুত্র বুগরা খাঁ দিল্লী দরবারে নিযুক্ত ছিলেন এবং তবলা ও পাখোয়াজ বাদনে বিখ্যাত ছিলেন। বংশধর ব্যতীত তাঁর শিষ্যবর্গের মধ্যে বুগরা খাঁ'র দুই পুত্র সিতাব খাঁ ও গুলাব খাঁ উভয়েই পাখোয়াজ ও তবলা বাদকরূপে অত্যন্ত প্রতিষ্ঠা লাভ করেন এবং বাদশাহ বাহাদুর শাহের (১ম, ১৭০৭-১৭১২) দরবারী সংগীতজ্ঞ হিসেবে নিয়োজিত হন। সুধার খাঁ'র দ্বিতীয় পুত্র ঘসিট খাঁ'র দুই পুত্রের নাম বুদ্দু খাঁ ও মক্‌দুম খাঁ।

বুগার খাঁ'র জ্যেষ্ঠ পুত্র সিতাব খাঁ'র পুত্র-প্রপৌত্র ক্রমে নজির আলী, বড়ে কালে খাঁ ও বলি বখ্‌শ সাহেব বিখ্যাত তবলাবাদক ছিলেন। ওস্তাদ বলি বখ্‌শের পুত্র ওস্তাদ নথ্‌থু খাঁ ও তাঁর শিষ্য ওস্তাদ মুনীর খাঁ খ্যাতনামা তবলাবাদক ছিলেন। ওস্তাদ নথ্‌থু খাঁ'র শিষ্য ওস্তাদ আহমেদ জান থিরকুয়া বিখ্যাত তবলাবাদক শিল্পীরূপে বিশেষ পরিচিতি লাভ করেন।

ওস্তাদ বুগরা খাঁ'র দ্বিতীয় পুত্র গুলাব খাঁ'র বংশানুক্রমে পুত্র মহম্মদ খাঁ, মহম্মদ খাঁ'র পুত্র ছোটে কালে খাঁ, ছোটে কালে খাঁ'র পুত্র গামী খাঁ, গামী খাঁ'র পুত্র ইমাম আলী খাঁ- এঁরা সকলেই খ্যাতিমান তবলা শিল্পীরূপে পরিচিত। বিখ্যাত তবলাবাদক শ্রী ভগবৎ শরণ শর্মা এই ঘরানার শিষ্য ছিলেন।

ওস্তাদ সুধার খাঁ'র তৃতীয় পুত্র মেহেতাব খাঁ'র তিনপুত্র মম্মু খাঁ, বক্সু খাঁ বা মিঞা বক্সু ও মোদু খাঁ। মম্মু খাঁ দিল্লীতে তাঁর সংগীতচর্চায় নিয়োজিত থাকেন এবং অপর দুই ভাই ওস্তাদ মোদু খাঁ ও ওস্তাদ বক্সু খাঁ লক্ষ্ণৌ নবাবের দরবারে আমন্ত্রিত হয়ে লক্ষ্ণৌ গমন করেন এবং এই ভ্রাতৃদ্বয়ের যুগ্ম প্রচেষ্টায় লক্ষ্ণৌ বাজের উৎপত্তি হয়। পরবর্তী কালে মোদু খাঁ তাঁর শিষ্য রামসহায়ের মাধ্যমে বারানসী তবলা ঘরানা স্থাপনেও অবদান রাখেন। এছাড়া সুধার খাঁ'র পৌত্র সিতাব খাঁ'র দুই শিষ্য মীরু খাঁ ও কল্লু খাঁ অজরাড়া ঘরানার প্রতিষ্ঠাতা।[২]

ওস্তাদ সুধার খাঁ'র কনিষ্ঠ ভ্রাতা ওস্তাদ চাঁদ খাঁ বিখ্যাত তবলাবাদক ছিলেন। তাঁর পুত্র প্রপৌত্র ক্রমে দিল্লীর মসীত খাঁ ও ওস্তাদ লঙ্গড়ে হুসেন বক্স খাঁ এই ঘরানার বিখ্যাত বাদক হিসেবে খ্যাত। লঙ্গড়ে হুসেন বক্সের পুত্র খলিফা ননহে খাঁ সুবিখ্যাত পাখোয়াজ ও তবলাবাদক ছিলেন। বিভিন্ন সংগীতসম্মেলন ও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে তিনি অত্যন্ত খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর শিক্ষানুক্রমে ওস্তাদ জুগনু খাঁ তবলাবাদনে বিশেষ সুনাম অর্জন করেন। তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যক্রমে ওস্তাদ মেহবুব খাঁ ও শ্রীমধুকর গনেশ গোড়বোলে উল্লেখযোগ্য তবলা শিল্পীরূপে সুপরিচিত। এছাড়াও ওস্তাদ সুধার খাঁ'র আরো শিষ্যের মধ্যে রোশন খাঁ, কাল্লু খাঁ ও ভুল্লন খাঁ দিল্লী ঘরানার বিখ্যাত বাদকরূপে খ্যাত ছিলেন।

দিল্লী তবলা ঘরানার শিষ্য-প্রশিষ্যের মাধ্যমেই লক্ষ্ণৌ, বারানসী, অজরাড়া প্রভৃতি তবলা ঘরানা বা তবলাবাজের উৎপত্তি হয়েছে। দিল্লী তবলা ঘরানা তাই প্রধান তবলা ঘরানা সমূহের মাতৃরূপা। এই ঘরানার বৈশিষ্ট্যের কথা বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় এটি একটি বিশুদ্ধ তবলা ঘরানা। এই ঘরানার বাদনশৈলী সম্পূর্ণ কৌশল নির্ভর। তাই দৈহিক কসরৎ অন্যান্য ঘরানা থেকে অপেক্ষাকৃত কম। শ্রুতিনন্দন ও দৃষ্টিনন্দন এই ঘরানার বাদন অত্যন্ত কোমল ও মধুর। দুই হাতের দুই দুই চার আঙ্গুলের সাহায্যেই প্রায় পুরো তবলাটি বাজানো হয়ে তাকে। পেশকার, ছোট আকারের কায়দা ও রেলার প্রাধান্য এই ঘরানায় অধিক। ছোট ছোট মুখড়া, মোহড়া, টুকরা ইত্যাদির সুন্দর বন্দিশ এই ঘরানায় দেখা যায়। একে 'কিনার কা বাজ'ও বলা হয়ে থাকে। বাজনায় কানির প্রাধান্য বেশী থাকায় হয়ত একে 'কিনার কা বাজ' বলা হয়।

"এই ঘরানায় যতটা কানির প্রাধান্য ঠিক ততটাই গাবের প্রাধান্য আছে। কায়দার আধিক্য হেতুই 'কিনার কা বাজ' বলা হয়। এই ঘরানার শিল্পীদের মুদ্রাদোষ খুব কম, হাত তবলা থেকে ওঠে না, দেখলে মনে হবে হাত দুটি আঠার মত তবলার উপর লেগে আছে। এই ঘরানায় 'তেটে' এবং 'তেরেকেটে' এই দুটি বাণীই সবথেকে বেশি ব্যবহার করা হয়। 'ধেরে ধেরে'-এর হাত তবলার মধ্যেই থাকে, তবলা থেকে হাত বেরিয়ে থাকে না। চতস্র জাতির রচনাই এ ঘরে অধিক দেখা যায়।"[৩]

তথ্যসূত্র

১) দুলাল ভট্টাচার্য, *তবলার ঘরানা*, নাথ পাবলিশিং, কলকাতা: ২০০৫, পৃ: ১৭।

২) শম্ভুনাথ ঘোষ, *তবলার ইতিবৃত্ত*, সঙ্গীত প্রকাশন, কলকাতা: ১৯৭২।

৩) দুলাল ভট্টাচার্য, *তবলার ঘরানা*, নাথ পাবলিশিং, কলকাতা: ২০০৫, পৃ: ১৮।

লক্ষ্ণৌ তবলা ঘরানা

ভারতের উত্তরপ্রান্তে তবলা বাদনের ক্ষেত্রে প্রধান যে দুটি ধারা স্বীকৃত তা হচ্ছে- দিল্লীবাজ এবং পূর্বী বা পূরববাজ। এই পূর্বী বা পূর্বাঞ্চলের বাদ্যধারায় আবার দুটি বিভাগ দেখা যায় যা লক্ষ্ণৌ ঘরানা ও বারানসী ঘরানা বা বেনারস বাজ নামে পরিচিত। তন্মধ্যে লক্ষ্ণৌ ঘরানা অধিক প্রাচীনতম।

"উত্তরপ্রদেশের রাজধানী লক্ষ্ণৌ একটি প্রাচীন নগর। কথিত আছে যে, প্রাচীনকালে শ্রীরামচন্দ্রের ভ্রাতা লক্ষ্মণ এই নগর নির্মাণ করেছিলেন। মোঘল শাসনকালে এইনগর অত্যন্ত সমৃদ্ধিলাভ করে। নবাব আসাফউদ্দৌলার (১৭৭৫-১৭৯৭) সময়-এর বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হয়। লক্ষ্ণৌর শেষ নবাব ওয়াজিদ আলীশাহ্ (১৮২২-১৮৮৭) কেবল সঙ্গীতের পরম পৃষ্ঠপোষকই নয় বরং স্বয়ং একজন উচ্চস্তরের সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। ১৮৫৬ সালে লর্ড ডালহৌসী তাকে গদিচ্যুত করেন এবং এইপ্রদেশ ইংরেজদের শাসনাধীন হয়ে যায়। সাংস্কৃতিক ও ব্যবসায়িক উভয় ক্ষেত্রেই লক্ষ্ণৌ মহত্ত্বপূর্ণ। তামা ও পিতলের কারুকার্য, কাচের চুড়ি, জর্দা, তামাক, আতর প্রভৃতি শিল্প, হস্তিদন্ত শিল্প ইত্যাদির জন্য এই নগর বিখ্যাত। এখানে অনেক বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, চারু ও কারু শিল্প মহাবিদ্যালয় প্রভৃতি বিবিধ শিক্ষাকেন্দ্র আছে। সংগীতের পীঠস্থান হিসাবে এখানকার ভাতখণ্ডে সংগীত বিদ্যাপীঠ প্রসিদ্ধ। আর প্রখর শিষ্টাচারের ক্ষেত্রেও এই নগর সুপরিচিত।"[১]

অষ্টাদশ শতকের শেষ কিংবা উনিশ শতকের প্রথমার্ধে লক্ষ্ণৌ রাজ্যে যে তবলা বাদন ধারার সূত্রপাত ঘটে তা বংশানুক্রমিক চর্চায় প্রসিদ্ধি লাভ করে। এই ধারাটিই লক্ষ্ণৌ বাজ বা লক্ষ্ণৌ তবলা ঘরানা নামে খ্যাত। এই ঘরানার প্রতিষ্ঠাতা দিল্লীর সুধার খাঁ'র পৌত্র তথা কাল্লু খাঁ'র পুত্র বক্সু মিঞা (হুসেন বক্স খাঁ) ও তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা মখসু বা মোদু খাঁ। তবে এই ঘরানার চিহ্নিত ধারা বক্সু মিঞা ও তাঁর অধস্তন পুরুষদের নিয়েই গঠিত। বক্সু মিঞার জন্ম অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে। ওই শতাব্দীর শেষভাগে তিনি লক্ষ্ণৌতে অবস্থান করতে এসেছিলেন। লক্ষ্ণৌর তবলা ঘরানার লালন পালন ভূমি ছিল লক্ষ্ণৌ রাজদরবার। এই ঘরানা শুরু থেকে কয়েক পর্যায় পর্যন্ত লক্ষ্ণৌ নগর ও লক্ষ্ণৌ রাজদরবারের অনুকূলে পরিপুষ্ট ছিল। বক্সু খাঁ'র আদিনিবাস স্থান পাঞ্জাবের কোন অঞ্চল হওয়া সত্ত্বেও লক্ষ্ণৌতে অবস্থানের সময় এই তবলা ঘরানা লক্ষ্ণৌ দরবারের দাক্ষিণ্য প্রাপ্ত হয়েছিল বলে খ্যাত। সঙ্গতকার হিসেবে বক্সু মিঞা অধিক প্রসিদ্ধ ছিলেন।

"লক্ষ্ণৌর রাজদরবারে তিনি বাদকরূপে নিযুক্ত হন এবং এই দরবারকে কেন্দ্র করেই এই তবলা ঘরানা প্রবৃদ্ধ হয়। লক্ষ্ণৌর দরবার ক্রমে কত্থক নৃত্যের কেন্দ্রে পরিণত হলে লক্ষ্ণৌর তবলাবাদন নৃত্য সংগীতেও

খ্যাতিলাভ করে। কত্থক অত্যন্ত তালাশ্রয়ী নৃত্য। লক্ষ্ণৌর দরবারে এই নৃত্যের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার তবলাবাদন, নৃত্যাঙ্গবাদনেও বিশেষ কুশলী হয়ে ওঠে।"[২]

লক্ষ্ণৌর শেষ নবাব ওয়াজেদ আলীকে (১৮৪৮-১৮৫৬) লক্ষ্ণৌ নৃত্য ঘরানার প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে গণ্য করা হয়। ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রচার ও প্রসারে তার অবদান অনস্বীকার্য। লক্ষ্ণৌ তবলা ঘরানার সকলেই যে তবলাবাদক ছিলেন তা নয়, সংগীতের অন্যান্য শাখাতেও তাঁরা সমান দক্ষ ছিলেন। বক্সু মিঞার পৌত্র ও সালারি মিঞার জ্যেষ্ঠপুত্র ছোটে মিঞা(ছোটে খাঁ) বিখ্যাত গায়ক হওয়ার পাশাপাশি নবাব ওয়াজেদ আলী শাহের দরবারী সংগীতজ্ঞ হিসেবেও নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর পত্নী ছোটে বিবিও নবাবের সভাসংগীতজ্ঞ ছিলেন। ছোটে বিবি অত্যন্ত দক্ষ তবলাবাদক ছিলেন এবং নবাবের দরবারে পুরুষ সংগীতজ্ঞদের সাথে পর্দার অন্তরাল থেকে সঙ্গত করতেন। তাদের পুত্র বাবু খাঁ তবলায় তাঁর মাতা ছোটে বিবির কাছ থেকেই তালিম নেন।

পরবর্তী কালে বাংলার সংগীত সমাজ লক্ষ্ণৌর শিল্পীদের শিক্ষা ও সহবতে অনেক লাভবান হয় কারণ লক্ষ্ণৌ পতনের পর নবাবের সঙ্গে অনেক সংগীত শিল্পী কলকাতায় এসে বসবাস শুরু করেন। যার ফলে বাংলার সংগীত সমাজে লক্ষ্ণৌ ঘরানার পরবর্তী পর্যায় বিস্তার লাভ করে। বাবু খাঁ তাঁর মাতার কাছে প্রথম তবলা শিক্ষা গ্রহণের পর মেটিয়াবুরুজে অবস্থিত নবাবের দরবারী সংগীতজ্ঞ হিসেবে নিযুক্ত হন এবং কলকাতায় একজন দক্ষ তবলাবাদক ও শিক্ষক হিসেবে জনপ্রিয়তা লাভ করেন। তাঁর শিষ্যবর্গের মধ্যে অরুণ মুখার্জী, ইনায়তুল্লা খাঁ, গোবর্ধন পাল, জ্ঞানেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী, নগেন্দ্রনাথ বসু, বিধুভূষণ দত্ত, ভুতেশ্বর দে, মনিলাল মিত্র, মন্মথনাথ গাঙ্গুলী, লক্ষ্মীনারায়ণ বাবাজী (ভট্টাচার্য) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। ১৮৯৯ সালে কলকাতায় বাবু খাঁ'র মৃত্যুর পর এই ঘরানার উত্তরসাধকরূপে দেখা যায় তাঁর শিষ্য নগেন্দ্রনাথ বসুকে। নগেন্দ্রনাথ বসু বাবু খাঁ'র অন্যতম শিষ্য ছিলেন। সেইকারণে বাবু খাঁর মৃত্যুর পর তার একাধিক শিষ্য নগেন্দ্রনাথের কাছেও শিক্ষা গ্রহণ করেন, যেমন: মন্মথনাথ গাঙ্গুলী, জ্ঞানেন্দ্র নাথ প্রমুখ। এইভাবে বাবু খাঁ ও ব্যানার্জী নগেন্দ্রনাথ বসুসহ তাঁর অন্য শিষ্যগোষ্ঠী ও প্রশিষ্যদের দ্বারা লক্ষ্ণৌ তবলা ঘরানা বাংলায় বিস্তার লাভ করে।

বাবু খাঁ'র পিতৃব্য এবং ছোটো মিঞার কনিষ্ঠ পুত্র মুন্নে খাঁ ও তাঁর পুত্র এবং পৌত্রদের সহযোগিতায় বাংলার সঙ্গে পুনরায় এই ঘরানার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। মুন্নে খাঁ'র কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন মেহ্মুদ খাঁ (মম্মু খাঁ)। বিষ্ণুপুরের গুণীশিল্পী রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় বিভিন্ন রীতির গায়ক ও যন্ত্রী হিসেবে মেদেনীপুরে নাড়াজোল রাজসভায় কলাবৎ হিসেবে নিযুক্ত থাকাকালীন মেহ্মুদ খাঁ'র কাছে তবলা বিদ্যা লাভ করেন। পরবর্তী কালে মেহ্মুদ খাঁ'র তিন পুত্রের মধ্যে কনিষ্ঠ দুইপুত্র আদিব হোসেন ও নাদির হোসেন বাংলার

সংগীত সমাজে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মুন্নে খাঁ (দ্বিতীয়) মধ্য প্রদেশের রায়গড় দরবারের সংগীতপ্রেমী রাজা চক্রধর সিংহের দরবারে দীর্ঘকাল নিযুক্ত ছিলেন।

খলিফারূপে সম্মানিত আবিদ হুসেন খাঁ এই ঘরানার প্রতিনিধি তবলাবাদক হিসেবে স্বীকৃত ও প্রসিদ্ধ। লক্ষ্ণৌর মাহমুদ নগরে ১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দে আবিদ হোসেন জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শৈশবে পিতার কাছে তবলা শিক্ষাগ্রহণ করেন এবং ১২ বছর বয়সে পিতার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মুন্নে খাঁ'র কাছে তালিম পান। তিনি বাঁ হাতে তবলাবাজাতেন। কণ্ঠ, যন্ত্র, নৃত্য এবং একক বাদনে তিনি সমান পারদর্শী ছিলেন। দেশের বিভিন্ন সংগীতানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে তিনি অত্যন্ত খ্যাতি অর্জন করেন। লক্ষ্ণৌর ভাতখণ্ডে সংগীত বিদ্যাপীঠে তিনি কিছুকাল শিক্ষকতা করেন। সারা ভারতে তাঁর অগণিত বিদগ্ধ শিষ্য রয়েছে যার মধ্যে ওয়াজিদ হুসেন খাঁ (ভ্রাতুস্পুত্র ও জামাতা), ক্ষিতিশচন্দ্র লাহিড়ী, চুনীলাল গাঙ্গুলী, জাহাঙ্গীর খাঁ (ইন্দোর), দেবীপ্রসন্ন ঘোষ, বেনারসের বারু (বীরু) মিশ্র, মনীন্দ্র মোহন ব্যানার্জী (মন্টুবাবু), রায়বাহাদুর কেশবচন্দ্র ব্যানার্জী, রাসবিহারী দত্ত, সতীশচন্দ্র দাস, শিশির শোভন ভট্টাচার্য, হরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, হীরেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। খলিফা আবিদ হোসেনের অধিকাংশ শিষ্য বাঙালি হওয়ায় পরবর্তী পর্যায়ে ঘরানার উত্তরাধিকার বাংলায় বিস্তার লাভ করে। আবিদ হোসেনের উত্তরসাধক রূপে হীরেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় সংগীতক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করেন। মাত্র নয় বছর বয়স থেকে তিনি গুরুর কাছে তালিম গ্রহণ শুরু করেন। সৌখিন ও অপেশাদার এই গুণীশিল্পী তাঁর পিতা মন্মথনাথ (বাবু খাঁ'র শিষ্য) ও আবিদ হোসেনের কাছে তালিম পাওয়ার পর নিজের একনিষ্ঠ চেষ্টা ও সাধনায় ভারতের একজন নেতৃস্থানীয় তবলাগুণী হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন।[৩]

মম্মু খাঁ'র তৃতীয় পুত্র নাদির হুসেন ছোট্টন খাঁ নামেও পরিচিত ছিল। তিনি উৎকৃষ্ট তবলাবাদক ছিলেন। সুফি প্রকৃতির এই শিল্পী সাধকের মত জীবনযাপন করেছেন। বংশধর ব্যতীত তিনি কৃষ্ণকুমার গাঙ্গুলীকে (নাটু বাবু) শিক্ষাদান করেন।

ছোট্টন খাঁ'র পুত্র এবং আবিদ হোসেনের কৃতি শিষ্য ও জামাতা ওয়াজিদ হোসেন খাঁ (১৯০৬-১৯৭৮) সুবিখ্যাত তবলাবাদক ছিলেন। দেশ বিদেশের বিভিন্ন সংগীতানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর অন্যতম শিষ্য হলেন অনিল ভট্টাচার্য।

লক্ষ্ণৌর এই তবলা ঘরানা ও তবলাবাদক বংশের আরেক উত্তর পুরুষ হলেন আবিদ হোসেন খাঁ'র দৌহিত্র এবং ওয়াজিদ হোসেন খাঁ'র পুত্র আফাক হোসেন খাঁ। তিনি কলকাতায় অবস্থান ও শিক্ষাদান করে বাংলায়

এই ঘরানার প্রতিনিধিত্বকারী হিসেবে উজ্জ্বল আছেন। এইভাবে বাবু খাঁ থেকে আফাক হোসেন খাঁ পর্যন্ত বাংলার সংগীতজগতে লক্ষ্ণৌ ঘরানার একশ বছরের সংযোগ ঘটেছে।

এই ঘরানার উৎপত্তির উৎস দিল্লী ঘরানা হলেও লক্ষ্ণৌ ঘরানায় পাখোয়াজের প্রভাব বিশেষভাবে দেখা যায়। এছাড়া কত্থক নৃত্যের প্রভাবে এই ঘরানার বাজনা একটু খোলা হাতে বাজানো হয় এবং এর পরিশ্রমও অন্য ঘরানার তুলনায় অধিক পরিলক্ষিত হয়। গাবের কাজের আধিক্য, বাঁয়ায় মীড়ের ব্যবহার, কত্থক নৃত্যের বোলবাণী, কায়দার আধিক্য এবং অপেক্ষাকৃত বড় কায়দা, লগ্গী ও লড়ীর ব্যবহার এই ঘরানার প্রধান সাংগীতিক বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে অন্যতম। লক্ষ্ণৌ দরবার ছিল ঠুমরী ধারার শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র। তাই কত্থক নৃত্য ছাড়াও ঠুমরীতে তবলা সঙ্গতও এই ঘরানার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।[৪]

লক্ষ্ণৌ তবলা ঘরানার বিখ্যাত বাদকদের চিত্র:

ওয়াজিদ হুসেন খাঁ [৫]

আফাক হোসেন খাঁ [৬]

তথ্য ও চিত্রসূত্র

১) অমল দাশ শর্মা, *প্রাচীন ও নবীন সংগীতজ্ঞ এবং ঘরানার ইতিবৃত্ত*, দরবারী প্রকাশন, কলকাতা , প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৫, পৃ: ৩৯৬-৩৯৭।

২) করুণাময় গোস্বামী, *সংগীতকোষ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা: ১৯৮৫, পৃ: ১৮৪।

৩) দুলাল ভট্টাচার্য, *তবলার ঘরানা*, নাথ পাবলিশিং, কলকাতা: ২০০৫।

৪) করুণাময় গোস্বামী, *সংগীতকোষ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা: ১৯৮৫।

৫) https://www.youtube.com/watch?v=1JvNMOy1DV8

৬) https://www.swadiksha.com/lessons/view?lesson_id=86

বেনারস (বারানসী) তবলা ঘরানা

একথা সর্বজন বিদিত যে সংগীতের গীত, বাদ্য, নৃত্যের সকল ক্ষেত্রেই অসংখ্য উজ্জ্বল তারকা ও গুণীশিল্পীর অভ্যুদয়স্থান হিসেবে বেনারস উল্লেখযোগ্য। বেনারস তবলা ঘরানার প্রতিষ্ঠাতা পণ্ডিত রামসহায়। বেনারসের কবীর চৌরাতে ভারতের এই অন্যতম শ্রেষ্ঠ তবলাবাদক তথা বেনারস ঘরানার প্রবর্তক রামসহায় মিশ্রের (১৮৩০-১৯১৩) জন্ম হয়। যদিও তাঁদের পূর্বতন বাসস্থান ছিল জৌনপুরের অন্তর্গত গোপালপুর নামকস্থানে, কারণ রামসহায়জীর পিতা গোপালপুর ত্যাগ করে বেনারসে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। অতি অল্প বয়সেই রামসহায় তবলার প্রতি আকৃষ্ট হন। মাত্র নয় বছর বয়সেই তিনি খ্যাতিমান সংগীতজ্ঞদের সাথে সঙ্গত করা শুরু করেন। একবার রামসহায়জী তাঁর সংগীত শিল্পী চাচার সাথে লক্ষ্ণৌ নবাবের দরবারে একটি সংগীত অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকাকালীন লক্ষ্ণৌ তবলা ঘরানার প্রতিষ্ঠাতা ওস্তাদ মোদু খাঁ'র দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং তাঁর অদ্ভুত প্রতিভায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে মোদু খাঁ বালক রামসহায়ের শিক্ষাভার গ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করেন। ১২ বছর মোদু খাঁ'র কাছে তালিম গ্রহণের পর তিনি অতুলনীয় তবলা বাদকরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। শোনা যায় যে অনাত্মীয় রামসহায়কে তালিম দেয়ার কারণে মোদু খাঁ'কে অনেকে কটাক্ষ করায় মোদু খাঁ ক্ষোভে রামসহায়কে শপথ করান যেন মোদু খাঁ'র শেখানো বোল, পরণ তিনি অন্য কাউকে না শেখান। গুরুর কাছে শপথ গ্রহণের পরে মর্মাহত রামসহায় স্বয়ং বহু বিচিত্র বোল, পরন রচনা করে শিষ্যদের শিক্ষা দিতে থাকেন। ধীরে ধীরে সেইসকল নবীন বাদনশৈলীই বেনারস বাজ নামে খ্যাত হয় এবং পরবর্তী কালে বেনারস তবলা ঘরানার উৎপত্তি হয়। এই বাদনরীতির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে রামসহায়ের প্রবল আস্থা ছিল এবং এইধারা যা একসময় বেনারস বাজ নামে খ্যাত হবে তা তিনি বহু পূর্বেই তাঁর শিষ্যদের মাঝে চর্চা করে গেছেন।[১]

সমগ্র দেশে অত্যন্ত জনপ্রিয় থাকলেও বেনারসেই তিনি জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়েছেন। তাঁর অগণিত শিষ্যের মধ্যে ভ্রাতা জানকীসহায় মিশ্র, ভ্রাতৃষ্পুত্র ভৈরবসহায় মিশ্র, ভগতজী মিশ্র, ভৈরবপ্রসাদ মিশ্র (ভৈরো মহারাজ), মহারাজ প্রতাপ মিশ্র (পরতপ্পুজী), রামশরণ মিশ্র প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

রামসহায় মিশ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা জানকীসহায় মিশ্র একজন সুপ্রসিদ্ধ নৃত্যশিল্পী ছিলেন। বেনারস কত্থক নৃত্যশৈলীর প্রবর্তক তিনি। কিন্তু অগ্রজের নির্দেশানুসারে তিনি তবলাবাদনে আগ্রহী হয়ে তবলাচর্চা আরম্ভ করেন এবং অল্পসময়ের মধ্যেই দক্ষ তবলা বাদকরূপে খ্যাতিলাভ করেন। রামসহায় মিশ্রের একজন আদিশিষ্য ছিলেন তিনি। তাঁর শিষ্যের মধ্যে গোকুলজী মিশ্র এবং বিশ্বনাথজী মিশ্রের নাম উল্লেখযোগ্য।

রামসহায় মিশ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গৌরীসহায় মিশ্রের পুত্র ভৈরবসহায় মিশ্র আনুমানিক ১৮৭০ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁকে 'কায়দে কে সম্রাট' বলা হত। চাচা রামসহায়ের কাছেই তাঁর তবলাবাদন শিক্ষা শুরু হয়। অসাধারণ প্রতিভাবান এই শিল্পী ক্রমে একজন দক্ষ তবলা বাদকরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন এবং কিছুদিন নেপালের রাণা দরবারে নিযুক্ত হন। এছাড়াও দেশের বিভিন্ন সম্মেলন ও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করেন।

"নেপালের সেই উচ্চমানের সংগীত দরবারে ভৈরবসহায় হলেন বেনারস বাজের প্রথম প্রতিভূ। শরদী নিয়ামতউল্লাহ সে সময় রাণা দরবারে নিযুক্ত ছিলেন। একদিন তাঁর শরদ বাজনার সঙ্গতে প্রভুত গুণপনা দেখান ভৈরবসহায়। আসরে সমবেত বড় বড় কলাবৎ সেদিন তবলায় লড়ন্ত দেখে বিস্ময় মেনেছিলেন। আর নিয়ামতউল্লাহ তাঁকে এই বলে অভিনন্দিত করেছিলেন- 'ইনি তবলিয়া নন- দেবদূত'।"[২]

উগ্র মেজাজের কারণে কোথাও বেশিদিন অধিককাল অবস্থান করতে না পারায় জীবনের অধিকাংশ সময়ই তিনি কাটান বেনারসে। তিনি সাধকোচিত জীবনযাপন করতেন। তাঁর অসংখ্য শিষ্যের মধ্যে অনোখেলাল মিশ্র, বলদেব সহায় (পুত্র), দুর্গা সহায় (পৌত্র) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। তাঁর কন্যা বংশে ছিলেন কণ্ঠে মহারাজ ও হরি মহারাজ।

রামসহায় মিশ্রের আরেক কৃতিশিষ্য প্রতাপ মহারাজ (বিখ্যাত গনেশ মহারাজের পুত্র) অত্যন্ত দক্ষ ও তেজী তবলাবাদক হিসেবে খ্যাতিলাভ করেন। তিনি কালীসাধক ছিলেন। রামসহায় মিশ্রের মৃত্যুর পর তিনি জানকীসহায়েরও তালিম পান। তাঁর পুত্র জগন্নাথ মহারাজ, জগন্নাথ মহারাজে পুত্রদ্বয় শিবসুন্দর মহারাজ ও বাচা মহারাজ, শিষ্য সত্য নারায়ণ, জয়কৃষ্ণ মাইতি-এঁরা সকলেই সংগীতজগতে বিখ্যাত হয়েছেন।

ভৈরবসহায়ের পুত্র বলদেবসহায় বেনারস ঘরানার শিল্পী হলেও বলদেবসহায় থেকে বেনারস ঘরানার আরেকটি শাখা বিস্তৃতি লাভ করে কারণ বলদেবসহায় পাঞ্চাব ঘরানার বিশিষ্ট তবলাবাদক ওস্তাদ হদ্দু খাঁ'র একজন বিশিষ্ট শিষ্য ছিলেন। তাঁর চারপুত্র যথাক্রমে দুর্গা সহায়, লছ্মী সহায়, দেবী সহায় ও ভগবতী সহায়। বলদেবসহায় মিশ্র ছিলেন বেনারস তবলা ঘরানার প্রতিনিধি বাদকদের মধ্যে একজন। তাঁর বাদনশৈলী ছিল অত্যন্ত লয়দার ও সুললিত। দীর্ঘকাল তিনি নেপালের দরবারে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর শিষ্যের মধ্যে কণ্ঠে মহারাজ, দূর্ঘা সহায় (পুত্র), বিক্কুজী মিশ্র, হরিসুন্দর মিশ্র (বাচাগুরু)– প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

বলদেব সহায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র দুর্গা সহায় (১৮৯২-১৯২৬) অসাধারণ সংগীত প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। দৃষ্টিহীন হওয়ার জন্য তাঁকে সুরদাস বলা হতো। পিতার ব্যস্ততার কারণে তিনি পিতার শিষ্য কণ্ঠে মহারাজের নিকট শিক্ষালাভ করেন। বাংলাদেশের মুক্তাগাছার মহারাজ শশীকান্ত আচার্য চৌধুরীর সভায় তিনি অত্যন্ত তরুণ বয়সে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর শিষ্যের মধ্যে কৃষ্ণকুমার গাঙ্গুলী (নাটু বাবু), হরিসুন্দর মিশ্র (বাচাগুরু), শ্যাম লালজী মিশ্র প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

বলদেবসহায়ের পৌত্র ও ভগবতী সহায়ের পুত্র সারদাসহায় মিশ্র একজন উৎকৃষ্ট তবলা বাদকরূপে খ্যাত। তিনি কণ্ঠে মহারাজের কাছে শিক্ষালাভ করেন। সাধনার মাধ্যমে তিনি এতটাই দক্ষতা অর্জন করেন যে গীত, যন্ত্রসংগীত, নৃত্য সবকিছুর সাথেই সঙ্গত করতে সক্ষম ছিলেন। মহাবীর হনুমানের ভক্ত সারদা সহায় অত্যন্ত সরল ও বিনয়ী ছিলেন। আকাশবাণীসহ দেশের বিভিন্ন সংগীতসম্মেলনে অংশগ্রহণ করে তিনি অত্যন্ত খ্যাতি অর্জন করেন। কিছুদিন বেনারসের হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে 'মিউজিক এ্যান্ড ফাইন আর্টস' বিভাগে নিযুক্ত থাকারপর তিনি তবলা শিক্ষকরূপে আমেরিকা প্রস্থান করে প্রবাস জীবনযাপন করেন। তাঁর ভারতীয় শিষ্যদের মধ্যে বাংলার তরুণ কৃতি তবলাবাদক বনমালি দাস অন্যতম।[৩]

'বাদ্য শিরোমনি' কণ্ঠে মহারাজ ১৮৮০ সালে বেনারসে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন বাদ্য রসরাজ বলদেবসহায় মিশ্রের উপযুক্ত শিষ্য ও জ্ঞাতি ভ্রাতা। দীর্ঘ তেইশ বছর শিক্ষা গ্রহণের পর তিনি দেশের বিভিন্ন সংগীত সম্মেলনে যোগদান করে অত্যন্ত খ্যাতিলাভ করেন। বলদেবসহায়ের সঙ্গে তিনিও নেপালের দরবারে নিযুক্ত ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি কলকাতায় এসে বসবাস শুরু করেন এবং অনেক শিষ্য তৈরি করেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে কিষাণ মহারাজ (ভাতৃষ্পুত্র), আশুতোষ ভট্টাচার্য, দুর্গা সহায়, কৃষ্ণ কুমার গাঙ্গুলী (নাটু বাবু), নানকু মহারাজ (জামাতা), বদ্রি মহারাজ, রামনাথ মিশ্র, শামতা প্রসাদ, শীতল মিশ্র, সারদাসহায় প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। ১৯৭০ সালে বারানসীতে এই মহান শিল্পী মৃত্যুবরণ করেন।

১৯২৩ সালের ৩ সেপ্টেম্বর জান্মাষ্টমীর দিন বেনারসের কবীর চৌরাতে হরি মহারাজের পুত্র পদ্মশ্রী পণ্ডিত কিষাণ মহারাজের জন্ম হয়। জন্মাষ্টমীর দিন জন্ম বলেই তাঁর নাম রাখা হয় কিষাণ। অত্যন্ত ছোটবেলা থেকেই তিনি তবলার আওয়াজে আকৃষ্ট হন। চাচা পণ্ডিত কণ্ঠে মহারাজের ছত্রছায়ায় তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয়। কণ্ঠে মহারাজজীর অত্যন্ত প্রিয় এই শিষ্য বাল্যকালেই কিংবদন্তিতে পরিণত হন। তিনি লয়কারীতে অত্যন্ত কুশল ছিলেন। অসাধারণ প্রতিভাবান এই শিল্পী সমমাত্রার তাল ছেড়ে ৯, ১১, ১৩, ১৫, ১৭, ১৯, ২১ মাত্রা বিশিষ্ট বিষমমাত্রার তালেই হয়ে ওঠেন সিদ্ধহস্ত।

“প্রাক যৌবনেই একটি আসরে তিনি অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় রেখেছিলেন। জনৈক নৃত্যশিল্পীর সঙ্গে সঙ্গতে বসেছেন কিষাণ মহারাজ। নৃত্যশিল্পী সবাইকে চমকে দিয়ে হঠাৎ ঘোষণা করলেন ২১ মাত্রার তালে তিনি নৃত্য পরিবেশন করবেন। বিন্দুমাত্র বিচলিত না হয়ে ভয়লেশহীন মুখে সাবলীল সঙ্গত করে গেলেন মহারাজ। শিল্পী-শ্রোতা উভয়েই অবাক হয়ে গিয়েছিলেন সেদিন। ২১ মাত্রা তিনি জানতেন না, জানা সম্ভবও ছিল না ঐ বয়সে। কিন্তু গাণিতিক হিসাবে এবং লয়কারীর ভগ্নাংশে তিনি শৈশবেই পরিপক্ক হয়ে উঠেছিলেন সুতরাং কোন মাত্রাই তাঁর কাছে কোনদিন ভয়াবহ হয়ে ওঠেনি বরং পরবর্তীকালে তাঁকেই ভয় করে চলতে হয়েছে অনেক শিল্পীকেই।”[৪]

আকাশবাণীসহ দেশ ও বিদেশের বহু সংগীতানুষ্ঠানে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। কবিতার প্রতি তাঁর যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। তিনি ‘মালিক’ ছদ্মনামে বেশ কিছু কবিতা রচনা করে গেছেন। ১৯৫৪ সালে তিনি ভারতীয় সাংস্কৃতিক দলের প্রতিনিধিত্ব করেন। যন্ত্র, নৃত্য ও এককবাদনে তিনি তাঁর প্রতিভার সাক্ষর রাখলেও নৃত্যের সাথে সঙ্গতে তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁর বেশকিছু একক বাদনের গ্রামোফোন রেকর্ড পাওয়া যায়। ১৯৭৩ সালে তিনি ভারত সরকার প্রদত্ত ‘পদ্মশ্রী’ প্রাপ্ত হন। এছাড়াও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে তিনি ‘সঙ্গত সম্রাট’, ‘সংগীতরত্ন’ ইত্যাদি উপাধিতে ভূষিত হন। পরবর্তীকালে ভারত সরকার কর্তৃক ‘পদ্মবিভূষণ’ উপাধি পান। শিকার ও ছবি আঁকা তাঁর শখ ছিল। তবলাবাদনকে উচ্চাসনে বসাবার জন্য তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। তাঁর অসংখ্য শিষ্যের মধ্যে পুরুণ মিশ্র (পুত্র), পণ্ডিত সারদাসহায়, পণ্ডিত কুমার বোস, পণ্ডিত অনিল পালিত, পণ্ডিত সুখবিন্দর সিং প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। ২০০৮ সালের ৪ মে ভারতের খেজুরিতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

ভগবান মিশ্রের পুত্র বীরু মিশ্র (১৮৯৬-১৯৩৫) ছিলেন অত্যন্ত দক্ষ ও প্রতিভাবান একজন তবলাবাদক। তাঁর পিতামহ বিশ্বনাথ মিশ্র ছিলেন জানকীসহায় মিশ্রের শিষ্য। বাল্যকাল থেকেই তিনি তবলায় আকৃষ্ট হন। পিতা ও ভৈরো মহারাজ ব্যতীত তিনি লক্ষ্ণৌ তবলা ঘরানার খলিফা আবিদ হুসেনের কাছেও শিক্ষাগ্রহণ করেন। জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি কলকাতায় অতিবাহিত করেন। শেষজীবনে তিনি কিছুদিন নেপালের দরবারে নিযুক্ত ছিলেন। সেখানেই রহস্যজনকভাবে তাঁর মৃত্যু হয়। স্বল্প আয়ুর এই শিল্পী তাঁর অল্পকালীন জীবনের মধ্যেই সমগ্র দেশে অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। তাঁর শিষ্যের মধ্যে বাসুদেব মিশ্রের নামে উল্লেখযোগ্য।

বেনারস তবলা ঘরানার প্রবর্তক পণ্ডিত রামসহায় মিশ্রের শিষ্য রামশরণজী মিশ্রের পৌত্র বিক্কুজী মিশ্র ছিলেন অসাধারণ প্রতিভাবান একজন তবলাবাদক। তিনি অত্যন্ত উচ্চ পরম্পরায় শিক্ষিত ছিলেন। তাঁর দক্ষতার কারণে তিনি খলিফা নামে খ্যাত হন। পিতা দরঘাইলাল মিশ্রও অত্যন্ত দক্ষ তবলাবাদক ছিলেন

এবং বাংলার বিভিন্ন রাজ্যে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে নিয়োজিত ছিলেন। বিক্কুজীর পুত্র গামাজী মিশ্রও বিখ্যাত তবলাবাদক ছিলেন। গামাজী মিশ্র 'তবলা সম্রাট' নামে খ্যাত শামতা প্রসাদ মিশ্রের গুরু ছিলেন। গামাজীর তিন পুত্রের সকলেই অত্যন্ত শিক্ষিত। তাঁদের মধ্যে প্রফেসর রঘুনাথ মিশ্র লক্ষ্ণৌর ভাতখণ্ডে সংগীত বিদ্যাপীঠে এবং সুরেন্দ্র মোহনমিশ্র গোরখপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত আছেন।

বেনারস ঘরানার বাদন পদ্ধতিই বেনারস বাজ নামে খ্যাত। যদিও লক্ষ্ণৌ ঘরানার প্রতিষ্ঠাতা ওস্তাদ মোদু খাঁ ও বক্সু খাঁ'ই ছিলেন বেনারস ও ফররুখাবাদ ঘরানার উৎসমূল তথাপি এই ঘরানার বাদনশৈলী পৃথকরূপে উপস্থাপিত হয়েছে। এমনকি তবলা নিয়ে বসার ভঙ্গিমাও এই ঘরানায় অন্য ঘরানা থেকে আলাদা। এই ঘরানার প্রায় সব শিল্পীই 'বীরাসনে' বসে তবলাবাজান যা অন্য কোন ঘরানায় দেখা যায় না। বেনারস তবলা ঘরানার প্রতিষ্ঠাতা রামসহায়জী তাঁর গুরুকে গুরু দক্ষিণা দিতে পুরো পাখোয়াজকে তবলার অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন যার ফলে আঙ্গুল চালনাতেও আমূল পরিবর্তন করতে হয়। এতে দৈহিক কসরত বেড়ে যায় ও সুর, চাটি এবং পুরো হাতে বাজানো এই ঘরানার বৈশিষ্ট্য হয়ে ওঠে। বাদনের বলিষ্ঠতা খোলা বোলের প্রাধান্য, বাঁয়ার কাজের বেশি ব্যবহার, সুরের কাজের প্রাধান্য, টুকরার ব্যবহারে ঝোঁক, পাখোয়াজের বোলের ব্যবহার, কত্থক প্রভৃতি নৃত্য সংগীত, মন্ত্র, শ্লোক প্রভৃতি অবৃত্তির অনুসরণে তবলায় বোল বাদন, তিন অঙ্গুলীর প্রয়োগ, মুখে বোল উচ্চারণ করে তবলাতে ছন্দ প্রদর্শন করা এই ঘরানার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই ঘরানায় ধেটে ধেটে, ক্রেধান, তকঘড়ান, তগেন্ন, দিনতক, দিড়ন্ন ধিত্তা, ধিন গিন, তক তক , ধাগে তেটে কড়ান, কতান, ঘড়ান ধিনতা, গদিগন, ধির ধির কিট তক ইত্যাদি বোলের অধিক প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়।

বেনারস তবলা ঘরানার শিল্পীরা ভারতীয় সংগীতের এক একটি রত্নস্বরূপ। এঁদের মাধ্যমেই এই ঘরানা ভারতীয় সংগীতজগতে আজও প্রাণবন্তরূপে বিরাজমান।

বেনারস তবলা ঘরানার বিখ্যাত বাদকদের চিত্র:

রামসহায় মিশ্র [৫]

ভৈরবসহায় মিশ্র [৬]

বলদেব সহায় মিশ্র [৭]

দূর্গাসহায় মিশ্র [৮]

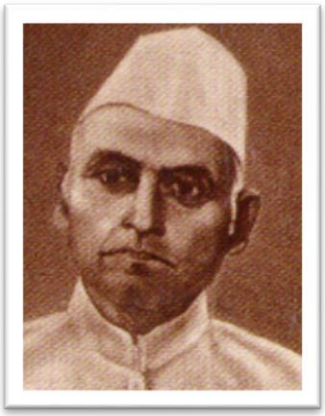

কণ্ঠে মহারাজ [৯]

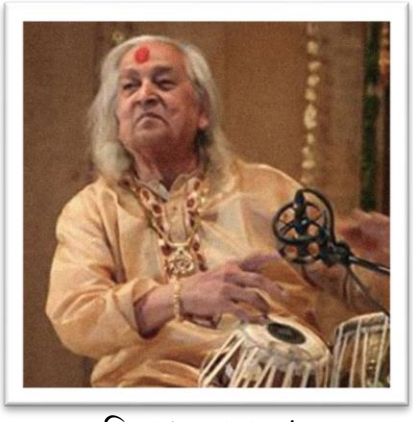

কিষাণ মহারাজ [১০]

পণ্ডিত কুমার বোস [১১]

তথ্য ও চিত্রসূত্র

১) করুণাময় গোস্বামী, *সংগীতকোষ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা: ১৯৮৫।

২) দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়, *ভারতীয় সংগীতে ঘরানার ইতিহাস*, এ মুখার্জী এ্যান্ড কোম্পানী প্রা: লি:, কলকাতা: ১৩৮৪, পৃ: ১০৪।

৩) দুলাল ভট্টাচার্য, *তবলার ঘরানা*, নাথ পাবলিশিং, কলকাতা:২০০৫, পৃ: ৭৩।

৪) প্রাগুক্ত।

৫) https://shawnmativetsky.com/benares-gharana

৬) https://shawnmativetsky.com/benares-gharana

৭) https://shawnmativetsky.com/benares-gharana

৮) https://shawnmativetsky.com/benares-gharana

৯) https://www.parrikar.org/vpl/?page_id=530

১০) https://www.mysticamusic.com/artists/tabla-player-kishan-maharaj

১১)https://www.justdial.com/entertainment/artist/Pandit-Kumar-Bose/A325604

পাঞ্জাব তবলা ঘরানা

পাঞ্জাব তবলা ঘরানা একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র তবলাবাজ নামে খ্যাত। লক্ষ্ণৌ, বারানসী ও ফররুখাবাদ ঘরানার সাথে দিল্লী ঘরানার গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান কারণ দিল্লী ঘরানার গুণীদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবেই এইসকল ঘরানার উৎপত্তি। কিন্তু পাঞ্জাব তবলা ঘরানার উদ্ভবের সাথে দিল্লী তবলা ঘরানার কোন সম্পর্ক নেই। পাঞ্জাব তবলা ঘরানার প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে হুসেন বক্সের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। পাঞ্জাব তবলা ঘরানার উৎপত্তি পাখোয়াজ থেকে। পাখোয়াজকে পাঞ্জাবে 'ডুক্কর' বলা হয় বলে এই ঘরানা 'ডুক্কর বাজ' নামেও পরিচিত। পাঞ্জাবে পাখোয়াজের প্রচলন বেশী থাকায় এই ঘরানার বাদনশৈলী, ঠেকা, বোল, পরণ প্রভৃতি পাখোয়াজ দ্বারা প্রভাবিত। বর্তমানে এই ঘরানার অবস্থান পাকিস্তানে হওয়ায় এর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। ভারতে এই ঘরানার প্রচলন অন্যান্য ঘরানার চেয়ে অপেক্ষাকৃত কম। এই ঘরানার আদি বাদক ও উদ্ভাবক সদ্দু হুসেন বক্স খাঁ উনিশ শতকের প্রথমার্ধ্বে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি লাহোর নিবাসী ছিলেন। অত্যন্ত গুণী তবলা ও পাখোয়াজ বাদক হুসেন বক্স খাঁকে এই ঘরানার উদ্ভাবক বলা হলেও অনেকের মতে হুসেন বক্সের পুত্র ফকির বক্সই সর্বপ্রথম পাখোয়াজের বোল-বাণী তবলায় রূপান্তরিত করে পাঞ্জাব ঘরানার সৃষ্টি করেন। তবে এই ঘরানার জনপ্রিয়তার পেছনে ওস্তাদ ফকির বক্স ও তাঁর পুত্র ওস্তাদ কাদের বক্সের (দ্বিতীয়) অবদান অনস্বীকার্য।[১]

হুসেন বক্স খাঁ'র পুত্র ফকির বক্স খাঁ অত্যন্ত বিখ্যাত তবলা ও পাখোয়াজ বাদক ছিলেন। পিতার নিকট তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়। পরবর্তী কালে লালা ভবানীদাসের (ভবানী সিং) নিকট শিক্ষালাভ করেন। দেশের বিভিন্ন সংগীতানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে তিনি প্রশংসিত হয়েছেন। তাঁর শিষ্যবর্গের মধ্যে কাদের বক্স খাঁ (পুত্র), ফিরোজ খাঁ, করম ইলাহি প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

১৯০২ সালে লাহোরে ফকির বক্স খাঁর পুত্র কাদের বক্স খাঁর জন্ম হয়। তিনি একজন সুবিখ্যাত তবলা ও পাখোয়াজ বাদক ছিলেন। পিতার নিকটই তিনি তালিম নেন এবং দেশের বিভিন্ন সংগীত সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে খ্যাতিলাভ করেন। নিঃসন্তান এই শিল্পী বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রাজ্যের সভা সংগীতজ্ঞরূপে নিযুক্ত ছিলেন এবং সেখানেও যথেষ্ট সম্মান ও প্রশংসা পেয়েছেন। তবে ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর তিনি পাকিস্তানে বসবাস শুরু করেন এবং সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর

ভারতীয় শিষ্যের মধ্যে আল্লারাখা খাঁ, লাল মহম্মদ খাঁ, মহারাজা টিকমগড় ও মহারাজা রাজগড় উল্লেখযোগ্য।

ওস্তাদ ফকির বক্সের শিষ্য ওস্তাদ ফিরোজ খাঁর জন্ম হয় উনিশ শতকের শেষের দিকে লাহোরে। পাখোয়াজ ও তবলা বাদনে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি দেশের বিভিন্নস্থানে তাঁর বাদন প্রদর্শনপূর্বক অত্যন্ত খ্যাতি অর্জন করেন। বিভিন্ন সময় তিনি বিভিন্ন রাজ্যের সভা সংগীতজ্ঞরূপেও নিয়োজিত ছিলেন। কলকাতায় গুরু ফকির বক্সের নিকট থাকাকালীন তাঁর কাছে কিছু দিক্পাল তবলাবাদক তালিম নেন। তাঁদের মধ্যে পণ্ডিত অনাথ বসু, পণ্ডিত শ্যামলাল বসু, পণ্ডিত জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, পণ্ডিত শংকর ঘোষ, পণ্ডিত মানিক পাল প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

১৯১৯ সালের ২৯ এপ্রিল জম্মুর অন্তর্গত ফাগবাল নামক গ্রামে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তবলাবাদক আল্লারাখা খাঁর জন্ম হয়। সংগীতের প্রতি অত্যন্ত আগ্রহের কারণে শৈশবেই তিনি পাঞ্জাবের ওস্তাদ ঝুন্ড খাঁর কাছে কিছুদিন তালিম নেন। পিতা হাশিম আলী খাঁর আর্থিক অবস্থা ভাল না থাকায় অভাবের তাড়নায় এবং উচ্চ শিক্ষালাভের আশায় মাত্র ১২ বছর বয়সে তাঁর এক চাচার আশ্রয়ে পূর্ব পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলার অন্তর্গত রতনগড় গ্রামে চলে আসেন। ১৬ বছর বয়সে তিনি পাঠান কোর্টের এক নাটকমণ্ডলীতে যোগ দেন। সেখানেই তাঁর পরিচয় হয় পাঞ্জাব ঘরানার বিশিষ্ট তবলাবাদক ওস্তাদ লাল মহম্মদের সাথে। লাল মহম্মদের নিকট তবলা শিক্ষার পাশাপাশি তিনি পাঠান কোর্টের বিখ্যাত ধ্রুপদগায়ক মীর চাঁদের কাছে ধ্রুপদ-ধামার শেখেন। পরবর্তী কালে তিনি পাতিয়ালা ঘরানার বিখ্যাত গায়ক আশিক আলী খাঁর কাছে খেয়াল ও ঠুমরীর তালিম গ্রহণ করেন। পাঁচ বছর পাঠান কোর্টে থাকার পর তিনি লাহোরে এসে পাঞ্জাব ঘরানার বিশিষ্ট তবলাবাদক কাদের বক্সের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। দীর্ঘকাল তিনি লাহোর রেডিওতে নিযুক্ত ছিলেন । ১৯৩৭ সালে তিনি লাহোর ত্যাগ করে মুম্বাই চলে আসেন। দেশ-বিদেশের বহু সংগীতানুষ্ঠানে অংশগ্রহণসহ পণ্ডিত রবি শংকরের সঙ্গে সঙ্গত আরম্ভ করার পরেই তিনি বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেন। ১৯৪২ সালে তিনি বম্বে ফিল্মে যোগ দেন এবং ইকবাল কুরেশী ছদ্মনামে খানদান, মা-বাপ (১৯৪৪), মাদারী (১৯৫০), সবক (১৯৫০), বেওয়াফা (১৯৫২) প্রভৃতি ছবিতে সংগীত পরিচালনা করেন। ভারত সরকার প্রদত্ত 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে বিভূষিত ওস্তাদ আল্লারাখা খাঁ ১৯৯০ সালের ৭ মে 'ওস্তাদ

হাফিজ আলী খাঁ' পুরস্কারে সম্মানিত হন। ২০০৩ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি এই মহান শিল্পী মৃত্যু বরণ করেন।[২]

ওস্তাদ আল্লারখা খাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র জাকির হোসেন খাঁ (জ: ১৯৫৮) উৎকৃষ্ট তবলা বাদকরূপে বিশ্বজুড়ে খ্যাতিলাভ করেছেন। স্বমহিমায় মহিমাণ্বিত ওস্তাদ জাকির হোসেন ঠিক বিশুদ্ধ পাঞ্জাব ঘরানা বাদনশৈলী অনুসরণ করেন না। থেরকুয়া খাঁ সাহেব ও ওস্তাদ আফাক হোসেনের কাছে কিছু সময় তালিম নেওয়ার কারণে প্রায় সব ঘরানার বোল বাণী বাজানোর ক্ষেত্রে ওস্তাদ জাকির হোসেন সিদ্ধহস্ত। ১৯৮৮ সালে জাকির হোসেন পদ্মভূষণ এবং ১৯৯১ সালে সংগীত নাটক একাডেমী পুরস্কার লাভ করেন। নিরহংকার ও বিনয়ী এই শিল্পী ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও জনপ্রিয় আনদ্ধবাদক হিসেবে স্বীকৃত।

এই ঘরানার বাদনশৈলীতে পাখোয়াজের বোলকে (খোলাবোল) বন্দবোল রূপে তবলায় বাজানো হয়। বোল- খোলা এবং জোরদার হয়ে থাকে। এই ঘরানার কায়দা, গৎ, পরণ, রেলা ইত্যাদির বোল অন্যান্য ঘরানা অপেক্ষা আকৃতিতে বৃহৎ হয়ে থাকে। অন্যান্য ঘরানায় যেমন অন্যতাল অপেক্ষা তিনতালের বিস্তার অধিক দেখা যায় কিন্তু পাঞ্জাব ঘরানায় তিনতাল সহ অন্য তালেও অধিক বিস্তার পরিলক্ষিত হয়। ধনীংনান, নগতে কড়ান, ধেটত, ধির ধির কেৎ, দুঙ্গ দুঙ্গ নগ নগ, গদিন্নাড় ইত্যাদি বর্ণ সমূহের অধিক প্রয়োগ এই ঘরানায় পরিলক্ষিত হয়।[৩]

পাঞ্জাব তবলা ঘরানার বিখ্যাত বাদকদের চিত্র:

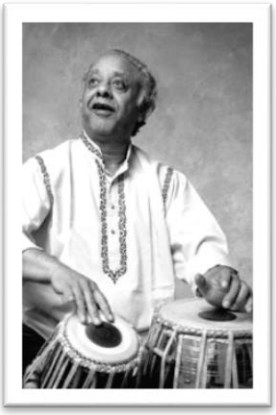

ওস্তাদ আল্লারখা খাঁ [৪]

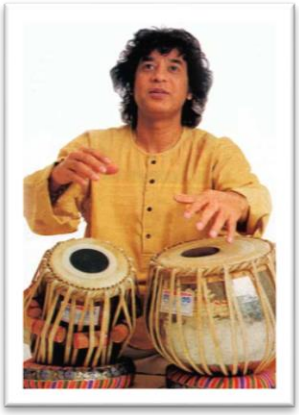

জাকির হোসেন খাঁ [৫]

তথ্য ও চিত্রসূত্র

১) দুলাল ভট্টাচার্য, *তবলার ঘরানা*, নাথ পাবলিশিং, কলকাতা: ২০০৫।

২) প্রাগুক্ত।

৩) প্রাগুক্ত।

৪) http://bestmusiciansstock.blogspot.com/2013/07/ustad-alla-rakha-khan.html

৫) http://www.thinklink.in/blog/ustad-zakir-hussain

অজরাড়া তবলা ঘরানা

অজরাড়া তবলা ঘরানার প্রবর্তক হিসেবে ওস্তাদ কল্লু খাঁ ও ওস্তাদ মীরু খাঁ নামক ভাতৃদ্বয়ের নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁরা মীরাট জেলার অজরাড়া গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। দিল্লী ঘরানার সিতাব খাঁ'র শিষ্য এই ভাতৃদ্বয় দিল্লী ঘরানার বাদন ধারাকে ভেঙ্গে অজরাড়া ঘরানার সূচনা করেন। এর বোলবাণীর কিছু পার্থক্য থাকলেও আঙ্গুল চালনা দিল্লী ঘরানার মতই। মীরু খাঁ'র বংশাবলী বিশেষ জানা যায় না। কাল্লু খাঁ'র পুত্র ওস্তাদ মহম্মদী বক্স, মহম্মদী বক্সের পুত্র ওস্তাদ চাঁদ খাঁ, চাঁদ খাঁ'র পুত্র ওস্তাদ কালে খাঁ, কালে খাঁ'র পুত্র ওস্তাদ হস্সু খাঁ, হস্সু খাঁ'র পুত্র ওস্তাদ শম্মু খাঁ (মুন্সীজী) সকলেই অজরাড়া ঘরানার বিখ্যাত তবলাবাদক ছিলেন। শম্মু খাঁ সংগীত মহলে 'মুন্সী জী' নামে অধিক পরিচিত ছিলেন কারণ তাঁর তবলাবাদন শুনে নাকি মনে হতো কোন মুন্সী বসে কবিতা লিখছেন। এই ঘরানায় সঙ্গতের প্রচলন ছিল না। সবাই একক বাদনে অভ্যস্থ ছিলেন। শম্মু খাঁ'ই সর্বপ্রথম এই ঘরানায় সহযোগী শিল্পী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন। শম্মু খাঁ'র পুত্র ওস্তাদ হাবীবুদ্দিন খাঁ এবং ভাতৃষ্পুত্র ওস্তাদ আব্দুল করিম খাঁ এই ঘরানার প্রতিনিধি শিল্পীরূপে বর্তমান কালের তবলা গুণীদের মধ্যে বিশেষ স্থানের অধিকারী। এই ঘরানার উৎপত্তি নিয়ে ওস্তাদ হাবিবুদ্দীন খাঁ ও তাঁর ভাতৃষ্পুত্র ওস্তাদ রমজান খাঁ একটি স্বতন্ত্র কাহিনীর অবতারণা করেছেন।

"তাঁদের মতে ১৮শ শতাব্দীতে অজরাড়া গ্রামের এক দরগাতে এক নিষ্ঠাবান দরবেশ ছিলেন, যিনি হাতের আঙ্গুলে পাথর বাজিয়ে গান গাইতেন। একদিন তিনি দৈববাণীর মাধ্যমে নাকি তবলা শিক্ষা করার নির্দেশ প্রাপ্ত হন। ফলস্বরূপ তিনি তবলা চর্চা আরম্ভ করেন এবং কালে উৎকৃষ্ট তবলা বাদকরূপে খ্যাতিলাভ করেন। অজরাড়া তবলা ঘরানার প্রবর্তকরূপে কথিত খুদাবক্স খাঁ যিনি মিঞা কান্হাই নামে পরিচিত ছিলেন, মোন্দি বক্স খাঁ এবং তাদের খুল্লতাত ভ্রাতা হাবীবুল্লা খাঁ উক্ত দরবেশের শিষ্য ছিলেন।"[১]

ভারতের তিন বিখ্যাত তবলাবাদক খুদাবক্স খাঁ (মিঞা কান্হাই), মোন্দি বক্স খাঁ ও হাবীবুল্লা খাঁ দিল্লীর দরবারে নিযুক্ত থাকাকালীন তাঁদের পারদর্শীতার জন্য মোঘল রাজদরবার অজরাড়া নামক একটি স্বতন্ত্র ঘরানার স্বীকৃতি দেয়। যেহেতু এই ঘরানার অধিকাংশ শিল্পীরাই দিল্লী ঘরানার সংগীতজ্ঞদের শিষ্য ছিলেন তাই সম্ভবত এই ঘরানার বাদনশৈলীর সাথে দিল্লী ঘরানার বাদনশৈলীর সাদৃশ্য বিদ্যমান। অজরাড়া ঘরানার অনেক শিল্পীই তবলা ও সারেঙ্গী বাদনে যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করেছিলেন তবে এঁদের সম্পর্কে তেমন কোন তথ্য পাওয়া যায় না।

১৮৯৯ সালে মীরাটে মুন্সী শম্মু খাঁ'র পুত্র হাবীবুদ্দীন খাঁ'র জন্ম হয়। পিতার ন্যায় তিনি একজন সুপ্রসিদ্ধ তবলাবাদক এবং অসাধারণ প্রতিভাবান ব্যক্তি ছিলেন। পিতার কাছেই তাঁর তবলা শিক্ষা শুরু হয়। পরবর্তী কালে পিতার অন্তরঙ্গ বন্ধু দিল্লী ঘরানার নথ্থু খাঁ'র কাছে তিনি তালিম পান। মৃত্যুকালে পিতা তাঁর বন্ধু নথ্থু খাঁকে অনুরোধ করেন পুত্রের শিক্ষাভার গ্রহণের জন্য। নথ্থু খাঁ তাঁকে পুত্রস্নেহে উত্তরমরূপে তালিম দেন এবং ধীরে ধীরে তিনি অত্যন্ত দক্ষ তবলা বাদকরূপে পরিণত হন। লক্ষ্ণৌ সংগীত সম্মেলন তাঁকে 'সংগীত সম্রাট' উপাধি দেন এবং আকাশবাণী দুরদর্শনসহ দেশের বিভিন্ন সংগীত সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেও তিনি অত্যন্ত খ্যাতি অর্জন করেন। ১৯৭২ সালের ১লা জুলাই মীরাটে এই মহান শিল্পী মৃত্যুবরন করেন। তাঁর শিষ্যের মধ্যে রমজান খাঁ (ভ্রাতৃষ্পুত্র), মনমোহন সিংহ, মিট্ঠন লাল (দিল্লী), পণ্ডিত শ্রীধর (আগরা) ও পণ্ডিত সুধীর কুমার সাক্সেনা (প্রাক্তন অধ্যাপক, এম.এস ইউনিভার্সিটি, বরোদা) উল্লেখযোগ্য।[২]

আজিজুদ্দিন খাঁ'র তৃতীয় পুত্র রমজান খাঁ'র জন্ম হয় ১৯৪০ সালে। তাঁর পিতাও বিখ্যাত তবলাবাদক ছিলেন। পিতার নিকটই তাঁর তবলার প্রারম্ভিক শিক্ষা শুরু হয়। পরবর্তী কালে তিনি পিতৃব্য হাবিবুদ্দীন খাঁ'র কাছে তালিম নেন। দীর্ঘকাল তিনি আকাশবাণীর দিল্লী কেন্দ্রে নিযুক্ত ছিলেন। এছাড়াও দেশ ও বিদেশের বিভিন্ন সংগীতানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে তিনি যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করেন। রমজান খাঁ'র গুরুভ্রাতা ও অন্তরঙ্গ বন্ধু মনমোহন সিংহের জন্ম হয় ১৯৪০ সালে। তিনিও অজরাড়া ঘরানার বিখ্যাত তবলাবাদক ছিলেন এবং আকাশবাণীর দিল্লী কেন্দ্রে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর শিষ্যবর্গের মধ্যে পুত্র ললিত কুমার ও রাজকুমার মজুমদার আকাশবাণী ও দুরদর্শনের জনপ্রিয় শিল্পী এবং দক্ষ সংগীতজ্ঞ হিসেবে উল্লেখযোগ্য।

অজরাড়া ঘরানার বাদন পদ্ধতিই অজরাড়া বাজ নামে প্রচলিত। এই ঘরানার বাজের সাথে দিল্লী বাজের সাদৃশ্য পাওয়া যায়। কায়দার বিশেষ প্রয়োগ এই ঘরানায় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। এই বাজের কায়দাগুলি কঠিন বলে দিল্লী বাজের মত অধিক হয় না। অজরাড়া ঘরানায় আড় লয়ের কায়দা বেশি দেখা যায়। পেশকার, কায়দা ও রেলার প্রাচুর্য, ছোট ছোট গৎ-এর প্রয়োগ এই ঘরানার বৈশিষ্ট্য। এই বাজে ধা ঘে ঘে নকধিন, ঘেতক ঘিনক, দিংগ দিন ধিন, ধা গড়ান ধা, ধাতক ধৈতক, ঘেন ধাড় ধা, ধাড় গিন ইত্যাদি বোলের প্রয়োগ অধিক প্রচলিত।[৩]

অজরাড়া তবলা ঘরানার বিখ্যাত বাদকদের চিত্র:

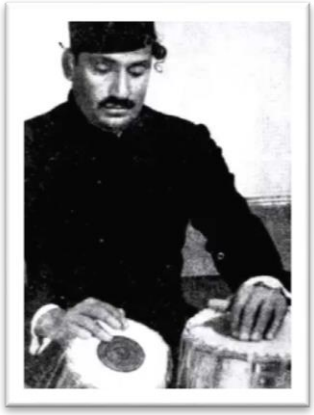

ওস্তাদ হাবীবুদ্দিন খাঁ [৪]

পণ্ডিত সুধীর কুমার সাক্সেনা [৫]

তথ্য ও চিত্রসূত্র

১) অমল দাশ শর্মা, *প্রাচীন ও নবীন সংগীতজ্ঞ এবং ঘরানার ইতিবৃত্ত*, দরবারী প্রকাশন, কলিকাতা: ১৯৯৫, পৃ: ৪০৩।

২) প্রাগুক্ত।

৩) দুলাল ভট্টাচার্য, *তবলার ঘরানা*, নাথ পাবলিশিং, কলকাতা: ২০০৫।

৪) https://www.youtube.com/watch?v=D9E0AzrJnng

৫) http://www.akshartablaacademy.com/about_guruji

ফররুখাবাদ তবলা ঘরানা

গঙ্গাতীরের একটি জেলার নাম ফররুখাবাদ। এর উত্তরে শাজাহানপুর এবং বুদায়ূন, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্বে এটাওয়া ও কানপুর, পূর্বে হরদোই এবং পশ্চিমে এটাহ্ ও মৈনপুরী। এই শহরের নাম ফরাক্কাবাদ নামে উচ্চারিত হলেও এর সঠিক নাম ফররুখাবাদ। কারণ মোঘল বাদশা ফররুখশিয়রের নামে তাঁর এক সামন্ত মহম্মদ খাঁ এই শহরটি পত্তন করেন। পরবর্তী কালে সেই নামানুসারে ফররুখাবাদ জেলার নামরকণ করা হয়।[১]

ফররুখাবাদ তবলা ঘরানার প্রতিষ্ঠাতা ওস্তাদ বিলায়েৎ আলী খাঁ। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে তাঁর জন্ম হয়। তিনি লক্ষ্ণৌ তবলা ঘরানার প্রবর্তক বক্সু মিঞার জামাতা এবং বক্সু ও মক্সু মিঞার শিষ্য ছিলেন। তাঁর মাধ্যমে ফররুখাবাদ তবলাবাদন রীতিও সংগীতজগতে পরিচিতি লাভ করে। বক্সু মিঞা তাঁর জামাতা বিলায়েৎ আলী খাঁ'কে যৌতুকস্বরূপ বারোটি কায়দা উপহার দিয়েছিলেন। হাজী বিলায়েৎ খাঁ একজন অসাধারণ প্রতিভাবান ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর একনিষ্ঠ সাধনা ও নিষ্ঠার ফলে তিনি ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় পাখোয়াজ ও তবলা বাদকরূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। শ্রেষ্ঠ সংগীতজ্ঞ হওয়ার কামনায় তিনি একাধিকবার হজ্জ্ব পালন করেন, সেই কারণেই তিনি 'হাজী সাহেব' নামে খ্যাত ছিলেন। দেশের বিভিন্ন সংগীতানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে তিনি প্রশংসিত হন। জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি ফররুখাবাদেই কাটান এবং সেখানেই নিঃসন্তান এই মহান শিল্পী ইহলোক ত্যাগ করেন। তাঁর শিষ্যবর্গের মধ্যে ছুন্নু খাঁ, ইমাম বক্স চুড়িওয়ালে, মুবারক আলী খাঁ, বাবা কলবন্দর বক্স খাঁ (মোরাদাবাদ), সালারি মিঞা, নন্হে খাঁ পারওয়ালে, মসীদুল্লা খাঁ ও হুসেন আলী খাঁ উল্লেখযোগ্য।[২]

"হাজী সাহেবের শিষ্যদের মধ্যে ওস্তাদ ইমাম বক্স একজন বিশিষ্ট তবলাবিদ ছিলেন। এই ইমাম বক্স পূর্বে একজন বিখ্যাত পাখোয়াজ বাদক ছিলেন। তৎকালীন ওস্তাদেরা নিজ বংশের বাইরে কোন লোককে সাধারণত শেখাতে চাইতেন না। ইমাম বক্স হাজী সাহেবের বাজনা শুনে এমনই মুগ্ধ হয়ে যান যে তাঁর কাছে শেখার জন্য বিশেষ আগ্রহী হয়ে পড়েন, কিন্তু কোন উপায় ছিল না, অগত্যা তিনি হাজী সাহেবের বাড়ীতে গৃহভৃত্যের চাকরী নেন। এই রকম একজন নামী ও প্রতিষ্ঠিত পাখোয়াজবাদক নিছক শেখার আগ্রহে আরেকজনের কাছে গৃহভৃত্য সেজে থাকা, এ এক বিরল দৃষ্টান্ত। সেখানে তিনি ওস্তাদের ঘরে তামাক সাজেন আর লুকিয়ে বাজনা শোনেন এবং লুকিয়েই সেইসব বোলবাণী কঠোর পরিশ্রমে আয়ত্ত করতে থাকেন, অবশ্য গুরুপত্নীও তাঁকে খুব স্নেহ করতেন এবং কিছু কিছু শেখাতেনও। হঠাৎ একদিন হাজী সাহেব ইমাম বক্সের বাজনা শুনে ফেলেন। সর্বনাশ ইমাম বক্স তো ভয়েই অস্থির। কিন্তু না-উদারচেতা হাজী সাহেব পরমস্নেহে তাঁকে গাণ্ডা বাঁধার আহ্বান জানালেন। গুরুপত্নী ইমাম বক্সকে খুবই

স্নেহ করতেন। গাণ্ডা বাঁধার দিন গুরূপত্নী তাঁর নিজ হাতের চুড়ি খুলে ইমাম বক্সের হাতে পরিচয় দিলেন। তিনি গুরূপত্নীকে খুবই ভক্তি ও শ্রদ্ধা করতেন। সেই চুড়ি তিনি আর কোনদিনই হাত থেকে খোলেননি। পরে তাঁর নামই হয়ে গিয়েছিল চুড়িওয়ালে বা চুড়িয়া ইমাম বক্স।"[৩]

হাজী বিলায়েৎ আলী খাঁ'র আরেক শিষ্য হুসেন আলী খাঁ একজন সুপ্রসিদ্ধ পাখোয়াজ ও তবলাবাদক ছিলেন। বিলায়েৎ আলীর শিষ্যদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা খ্যাতিলাভ করেন হুসেন আলী। অনেকের মতে হুসেন আলী ছিলেন বিলায়েৎ আলীর পুত্র। তবে অন্যসূত্রে জানা যায় যে, হাজী বিলায়েৎ আলী ছিলেন নিঃসন্তান। তাই ধারণা করা হয় যে, হুসেন আলী ছিলেন তাঁর পোষ্যপুত্র। বিলায়েৎ আলীর নিকট শিক্ষা-দীক্ষা লাভের পর প্রথমে তিনি নবাব ওয়াজিদ আলী শাহের দরবারের নিযুক্ত হন। পরবর্তীকালে রামপুর দরবারে চলে আসেন এবং জীবনের বাকী সময় সেখানেই বসবাস করেন। তাঁর অনেক শিষ্যের মধ্যে নন্হে খাঁ পারওয়ালে, মসীদুল্লা খাঁ, মুনীর খাঁ প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

নন্হে খাঁ পারওয়ালের জন্ম উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মোরাদাবাদে। তিনি একজন বিখ্যাত বাদ্যকার ছিলেন। হুসেন আলী খাঁ'র প্রিয় শিষ্য নন্হে খাঁ তার প্রতিভা ও সাধনার মাধ্যমে উৎকৃষ্ট তবলা ও পাখোয়াজ বাদকরূপে খ্যাতিলাভ করেন। বিভিন্নসময় তিনি রামপুর ও লক্ষ্ণৌ দরবারে সংগীতজ্ঞ হিসেবে নিযুক্ত ছিলেন। রামপুর দরবারে সেইসময় নন্হে খাঁ নামে অপর এক শিল্পী থাকায় তাঁর নামের পূর্বে পারওয়ালে সংযোগ করে দেওয়া হয় কারণ তিনি গঙ্গার ওপারে মোরাদাবাদের বাসিন্দা ছিলেন। তাঁর পুত্র মসীদুল্লা খাঁ পিতার কাছেই শিক্ষালাভ করেন। নন্হে খাঁ'র অপর শিষ্যের মধ্যে আজিম খাঁ, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, কেরামতুল্লা খাঁ (পৌত্র), মণীন্দ্রমোহন ব্যানার্জী (মন্টুবাবু) ও রাইচাঁদ বড়াল উল্লেখযোগ্য।

১৮৬০ সালে উত্তরপ্রদেশের মীরাট জেলার লালিয়ানা গ্রামে বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ মুনীর খাঁ'র জন্ম হয়। মুনীর খাঁ ছিলেন হুসেন আলীর অপর শিষ্য। মীরাটের সন্তান মুনীর খাঁ প্রায় ৮ বছর হুসেন আলীর নিকট তালিম গ্রহণ করেন। পরবর্তী কালে বলীবখ্শের নিকট তালিম নিলেও ফররুখাবাদ ঘরানার বাদকরূপেই তিনিই অধিক সমাদৃত। নিজ প্রতিভা ও সাধনার গুনে তিনি হুসেন আলীর শ্রেষ্ঠ শিষ্যত্বের কৃতিত্ব লাভপূর্বক বিশিষ্ট তবলাগুণী হিসেবে ভারতবর্ষে অত্যন্ত খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত হন আহমদ জান থিরকুয়া। এছাড়াও বশীর খাঁ, আমীর হুসেন খাঁ (ভাগিনেয়), সাদিক হুসেন খাঁ, গোলাম হুসেন খাঁ, শামসুদ্দীন খাঁ প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। তাঁর ভগ্নিপতি আহমদ বক্স খাঁ একজন উৎকৃষ্ট তবলা ও সারেঙ্গীবাদক ছিলেন। ১৯৩৭ সালের ১১ ডিসেম্বর ৭৫ বছর বয়সে এই মহান শিল্পীর মৃত্যু হয়।[৪]

নন্‌হে খাঁ'র পুত্র মসীদুল্লা খাঁ (১৮৯০-১৯৭৪) পিতা ও হুসেন আলীর নিকট উত্তম তালিমপ্রাপ্ত হন। তিনি মসীদ খাঁ নামে সর্বাধিক পরিচিত ছিলেন। মসীদ খাঁ'র শিক্ষা ও প্রথম জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয় রামপুরে। বহুদিন তিনি রামপুর দরবারে নিযুক্ত ছিলেন। মধ্যবয়সে তিনি কলকাতার বাসিন্দা এবং অতিগুণী পাখোয়াজ ও তবলা বাদকরূপে যশস্বী হন। তাঁর শিষ্যের মধ্যে কেরামতুল্লা খাঁ (পুত্র), কানাই লাল দত্ত, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, মণীন্দ্রমোহন ব্যানার্জী (মন্টু বাবু), রাইচাঁদ বড়াল, হরেন্দ্ররায় চৌধুরী (রামগোপালপুর) ও হেমেন্দ্রনাথ সরকার উল্লেখযোগ্য। ৮৪ বছর বয়সে কলকাতায় এই মহান শিল্পী ইহলোক ত্যাগ করেন।

ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তবলিয়া আহমদ জান থিরকুয়া ফররুখাবাদ ঘরানার সাথে নানাভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। তিনি ছিলেন মুনীর খাঁ'র অন্যতম শিষ্য। ফররুখাবাদ ঘরানার শের খাঁ, ভুঁদিয়া ইমাম বক্স এবং মুনীর খাঁ'র কাছে তিনি তালিম গ্রহণ করেন। তাই তাঁকে এই ঘরানার উত্তরাধিকারীরূপে গণ্য করা যায়। তাঁর মাধ্যমেই ফররুখাবাদ তবলা ঘরানা বাংলার সংগীতক্ষেত্রে বিস্তার লাভ করে। বাংলায় তাঁর শিষ্যবর্গের মধ্যে চুনীলাল গঙ্গোপাধ্যায়, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, মনীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিসাধন সরকার প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

১৮৯৫ সালে আহমদ বক্স খাঁ'র পুত্র আমীর হুসেন খাঁ'র জন্ম হয়। পিতা এবং মুনীর খাঁ'র নিকট তিনি তালিম গ্রহণ করেন। পরবর্তী কালে তিনি একজন বিখ্যাত তবলা বাদকরূপে প্রতিষ্ঠিত হন এবং অত্যন্ত খ্যাতিলাভ করেন।

১৯১৮ সালে রামপুরে মসীদুল্লা খাঁ'র পুত্র কেরামতুল্লা খাঁ'র জন্ম হয়। তিনি শুধু গুণী তবলাবাদকই ছিলেন না, গায়ক হিসেবেও তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। মসীদ খাঁর একান্ত তালিমে কেরামতুল্লা খাঁ'র সংগীতজীবনের শুরু হয়। প্রথম থেকেই তিনি কলকাতা নিবাসী ছিলেন। সঙ্গতকার হিসেবে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়। পিতার ন্যয় তিনিও অত্যন্ত লয়দার বাদনের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। ১৯৭৭ সালে এই মহান শিল্পী মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর শিষ্যের মধ্যে অনিলকুমার সাহা, অনিল রায় চৌধুরী, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, বিমল চ্যাটার্জী, উমা মিত্র (দে) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। বস্তুত এভাবেই কয়েকটি বংশ ও শিষ্যপরম্পরায় ফররুখাবাদ তবলা ঘরানা বর্তমানকাল পর্যন্ত প্রসারিত হয়।

ফররুখাবাদ ঘরানার বৈশিষ্ট্য হলো- এই ঘরানার ছন্দবৈচিত্র্য, নান্দনিক, গুনগতমান, লয়বৈচিত্র্য সকল দিক দিয়েই একটি অদ্বিতীয় ঘরানা। লক্ষ্ণৌ ঘরানা থেকে এই ঘরানা সৃষ্টি হলেও দিল্লী ও লক্ষ্ণৌ উভয় ঘরানার সাথেই এই ঘরানার সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। তবে দিল্লী ঘরানার তুলনায় লক্ষ্ণৌ ঘরানার রীতি

এখানে বেশি দেখা যায়। তাই এই বাজকে কেউ কেউ মিশ্র বাজও বলে থাকেন। কায়দা ও রেলার বিশেষ প্রয়োগ এবং খোলা ও জোরদার বোলের প্রয়োগ করা হয়। এছাড়া এই ঘরানায় কিছু কিছু নাচের বোলের ব্যবহারও করা হয়। স্বতন্ত্র বাদনের প্রথমে পেশকার বাজানোর পর- কায়দা, টুকরা, গৎ, রেলা ইত্যাদি বাজানো হয়। এই ঘরানায় তিপল্লী, চৌপল্লী ইত্যাদির বিশেষ মহত্ব আছে। এই বাজে ঘিড়নক, দিনতক, ত্রিঘড়ান, ধা ধা ধিন তা, ধা কৃধা ধিন ইত্যাদি বোলের অধিক প্রয়োগ হয়ে থাকে।

"ফররুখাবাদ ঘরানার ওস্তাদ মসীদ খাঁ, ওস্তাদ কেরামতুল্লা খাঁ, ওস্তাদ সাবীর খাঁ, ওস্তাদ আমীর হোসেন, ওস্তাদ আহমদজান থিরকুয়া, ওস্তাদ আজীম খাঁ, ওস্তাদ নিজামুদ্দিন খাঁ, ওস্তাদ মুন্নে খাঁ, পণ্ডিত জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, পণ্ডিত নিখিল ঘোষ, পণ্ডিত কানাই দত্ত, পণ্ডিত শংকর ঘোষ, পণ্ডিত শ্যামল বসু, পণ্ডিত গোবিন্দ বসু, পণ্ডিত অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায়, পণ্ডিত সঞ্চয় মুখোপাধ্যায়, পণ্ডিত অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট শিল্পীরা ভারতীয় সংগীতের এক একটি রত্নস্বরূপ। এছাড়াও এই ঘরানার নতুন প্রজন্মের এক বিরাট সংখ্যক তবলাশিল্পী পাদ প্রদীপের আলোয় দ্রুত উঠে আসছে, যা বোধহয় অন্যকোন ঘরানায় নেই। "[৫]

ফররুখাবাদ তবলা ঘরানার বিখ্যাত বাদকদের চিত্র:

হাজী বিলায়েৎ আলী খাঁ [৬]

আহমেদজান থিরকুয়া [৭]

ওস্তাদ আমীর হোসেন [৮]

তথ্য ও চিত্রসূত্র

১) দুলাল ভট্টাচার্য, *তবলার ঘরানা*, নাথ পাবলিশিং, কলকাতা: ২০০৫।

২) অমল দাশ শর্মা, *প্রাচীন ও নবীন সংগীতজ্ঞ এবং ঘরানার ইতিবৃত্ত*, দরবারী প্রকাশন, কলকাতা।

৩) দুলাল ভট্টাচার্য, *তবলার ঘরানা*, নাথ পাবলিশিং, কলকাতা: ২০০৫, পৃ: ৪৫।

৪) দেবব্রত দত্ত, *সঙ্গীত-তত্ত্ব (তবলা প্রসঙ্গ)*, ব্রতী প্রকাশনী, কলকাতা: ১৯৮২।

৫) দুলাল ভট্টাচার্য, *তবলার ঘরানা*, নাথ পাবলিশিং, কলকাতা: ২০০৫, পৃ: ৫১।

৬) https://plus.google.com/114309822823957324679/posts/UuRXG7RpG9N

৭) https://www.parrikar.org/vpl/?page_id=804

৮) https://www.youtube.com/watch?v=eEpGOEYqaUk

নৃত্যের ঘরানা

ভারতীয় নৃত্যের ইতিহাসের বর্ণনা ধারাবাহিকভাবে পাওয়া যায় না। নৃত্যের প্রাচীনতম ইতিহাস না পেয়ে প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা এর ইতিহাস বর্ণনায় পুরাণাদির আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেই অনুসারে মহাদেবকে এর সৃষ্টিকর্তা বলে মনে করা হয়। মহাদেবের ডমরুর ধ্বনির সাথে দেহছন্দের সংযুক্তি হয়ে সৃষ্টি হয়েছে নৃত্যকলার। ব্রহ্মা, মহাদেবের কাছ থেকে সর্বপ্রথম সংগীতশিক্ষা গ্রহণ করে তাঁর পঞ্চশিষ্য নারদ, রম্ভা, রহু, তুম্বুরু ও ভরতকে শিক্ষা দেন। পরবর্তী কালে ভরতমুনি পৃথিবীতে সংগীত (গীত, বাদ্য ও নৃত্য) প্রচার করেন।

বিভিন্ন যুগে ভারতীয় নৃত্যের যে বিভিন্ন ধারা আমরা দেখতে পাই তা হলো:

- **বৈদিক যুগ**- বৈদিক যুগের নৃত্য, ঋক বেদের নৃত্য, ঋক-সংহিতায় নৃত্য, গৃহসূত্র, সামবেদে নৃত্য, যজুর্বেদে নৃত্য, অথর্ববেদে নৃত্য ইত্যাদি ।
- **পৌরাণিক যুগ**- রামায়ণে নৃত্য, মহাভারতে নৃত্য, হরিবংশ পুরাণে নৃত্য, হল্লীসক নৃত্য, অসারিত নৃত্য, তাণ্ডব ও লাস্য নৃত্য ইত্যাদি।
- **আধুনিক যুগ**- কুচিপুড়ি নৃত্য, ওড়িশী নৃত্য, ভরত নাট্যম নৃত্য, কথাকলি নৃত্য, মোহিনী আট্যম, কেরালার 'কলি' নৃত্য, কত্থক নৃত্য, মনিপুরী নৃত্য, বিভিন্ন প্রদেশের লোকনৃত্য ইত্যাদি।[১]

এইসকল ধারার নৃত্যের ধরণ বা সৃষ্টির ইতিহাস পাওয়া গেলেও যেহেতু শুধুমাত্র কত্থক নৃত্যের ঘরানারই উল্লেখ পাওয়া যায়, তাই বর্তমান গবেষণায় নৃত্যকলার আলোচনায় কত্থক নৃত্যের ঘরানা নিয়ে আলোচনা করাই আবশ্যক বিবেচনা করি।

কত্থক নৃত্য ও তার ঘরানা

কত্থক উত্তর ভারতের একটি অন্যতম ধ্রুপদী নৃত্যকলা। যার জন্মস্থান লক্ষ্ণৌ ও জয়পুর বলে জানা যায়। কত্থকনৃত্যে ভরতনাট্যমের মত তিনটি উপাদান রয়েছে- তা হলো নৃত্ত, নৃত্য ও নাট্য। নৃত্ত হলো বিশুদ্ধ ছন্দভিত্তিক নাচ, নৃত্য রস প্রকাশের উপযোগী নাচ আর নাট্য হলো অভিনয় সমৃদ্ধ নাচ। এই তিনটি উপাদানের সমন্বয়েই কত্থক নাচের ভিত্তি স্থাপিত হয়। কত্থক প্রধানত ছন্দভিত্তিক নাচ। মুদ্রার ব্যবহার এতে কম থাকে। সুক্ষ্ম পায়ের কাজকে এই নাচের প্রাণ হিসেবে মনে করা হয়। পূর্বে কত্থকনৃত্যকে বলা হত নটবরী নৃত্য। কারণ দেব-মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণ ভগবানের সম্মুখে এই নৃত্য প্রদর্শিত হত।

"শ্রীকৃষ্ণকে শ্রেষ্ঠ শিল্পী নটবররূপে কল্পনা করা হত এবং এর নৃত্যকাহিনী রচিত হত রাধাকৃষ্ণের লীলামাহাত্ম্য থেকে। পূজার্চনা ও আরতির পর পবিত্রতা ও শুচিতার সঙ্গে এই নৃত্য বিগ্রহের সামনে- তাঁর মনোরঞ্জনার্থে প্রদর্শিত হত। আজও যাঁরা বিশুদ্ধতার সঙ্গে কৃষ্ণলীলাকে কত্থক নৃত্যের দ্বারা রূপদান করেন, তাঁরা একে নটবরী নৃত্য নামেই অভিহিত করেন"।[২]

কত্থক শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে গাথাকার। প্রাচীন বিভিন্ন গ্রন্থে কত্থক শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। অনেকে মনে করেন এলাহাবাদের হন্ডিয়া তহশীল গ্রামের কত্থক সম্প্রদায়ের লুপ্ত নৃত্য 'অরখা'ই কত্থক নৃত্য নামে পরবর্তী কালে পরিচিতি লাভ করেছে। এই কত্থক সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে কেউ কেউ জীবিকা অর্জনের জন্য নৃত্য গীতের মাধ্যমে রাধাকৃষ্ণের লীলা জনসাধারণের মধ্যে পরিবেশন করে অর্থ উপার্জন করতেন। কালক্রমে এইধারাই কত্থক নৃত্যে পরিণত হয়েছে এবং গ্রাম থেকে মন্দির, মন্দির থেকে রাজদরবার এবং যুগভেদে সামাজিক বিবর্তন ও রুচির পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে এইশৈলী রাজদরবার থেকে সাধারণ রঙ্গমঞ্চে চলে এসেছে।[৩]

মুঘল আমলের শেষের দিকে ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনামলের শুরুতে ভারতের নৃত্য শিল্পীরা বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে সেইসকল স্থানে তাঁদের নৃত্যচর্চা অব্যাহত রাখেন। সেইরকম এক নৃত্য সম্প্রদায় গড়ে ওঠে ভারতের লক্ষ্ণৌ ও জয়পুর অঞ্চলে এবং ধীরে ধীরে তাঁদের নৃত্যশৈলী লক্ষ্ণৌ ও জয়পুর ঘরানা নামে পরিচিতি লাভ করে। পরবর্তী কালে জয়পুর ঘরানার উত্তরাধিকারীদের দ্বারা বেনারস ঘরানার উদ্ভব হয়। তাই আমরা বলতে পারি কত্থক নৃত্যের ঘরানা তিনটি:

(১) লক্ষ্ণৌ কত্থক ঘরানা

(২) জয়পুর কত্থক ঘরানা

(৩) বেনারস কত্থক ঘরানা

তথ্যসূত্র

১) শংকর লাল মুখোপাধ্যায়, *ভারতীয় নৃত্য ধারার সমীক্ষা*, ফার্মা কে.এ.প্রা:লি: কলকাতা: ১৯৯৭।

২) প্রাগুক্ত পৃ: ৪৫৬।

৩) অভিজিত রায়, *কত্থকনৃত্যের উৎস ও প্রাসঙ্গিকতা*, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা: ১৪০৫।

লক্ষ্ণৌ কত্থক ঘরানা

কত্থক নৃত্যে লক্ষ্ণৌ ঘরানাই বর্তমানে সর্বাধিক জনপ্রিয়তা অর্জনপূর্বক প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এলাহাবাদের নৃত্যসাধক ঈশ্বরী প্রসাদের প্রপৌত্র নৃত্যাচার্য ঠাকুরপ্রসাদ ঊনবিংশ শতকে এই ঘরানার পত্তন করেন। ঈশ্বরীপ্রসাদ এলাহাবাদের অর্ন্তগত হন্ডিয়া গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। কথিত আছে সেইসময় নটবরী নৃত্যের দূর্দশা দেখে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান কৃষ্ণভক্ত ঈশ্বরীপ্রসাদকে স্বপ্নাদেশ দেন কত্থক নৃত্য পুনরুদ্ধারের জন্য। কৃষ্ণের আদেশ পেয়ে ঈশ্বরী প্রসাদ কত্থক নৃত্যকে তাঁর আরাধ্য হিসাবে গ্রহণ করে এর প্রচার করেন । তাঁর তিনপুত্র অরগু, খরগু ও তুলারাম কে তিনি উত্তমরূপে এই নৃত্যের তালিম দেন এবং এঁরা সকলেই কত্থক নৃত্যে অত্যন্ত পারদর্শী হয়ে ওঠেন। অরগুজীর তিনপুত্র প্রকাশজী, দয়ালজী ও হরিলালজীও বংশপরম্পরা অনুসারে এই নৃত্যের শিক্ষালাভ করেন। অরগুজীর মৃত্যুর পর তাঁর তিনপুত্র লক্ষ্ণৌ চলে আসেন এবং প্রসাদজী লক্ষ্ণৌর নবাব আসাফউদ্দৌলার দরবারে নৃত্যবিদ হিসেবে নিযুক্ত হন। প্রকাশজীর তিনপুত্র দুর্গা প্রসাদ, ঠাকুর প্রসাদ ও মানসিংহও এই নৃত্যশৈলীতে দক্ষতা অর্জন করেন। অনেকের ধারণা প্রকাশজীর পুত্র ঠাকুর প্রসাদ লক্ষ্ণৌতে ওয়াজেদ আলী শাহের দরবারে নৃত্যবিদ হিসাবে যোগদান করার সময় থেকেই লক্ষ্ণৌ ঘরানার যাত্রা শুরু হয়। তাঁর সময়েই এই ঘরানা সমৃদ্ধিলাভ করে ও এর ব্যাপক প্রচার হয়। লক্ষ্ণৌ নবাবদের বিস্তারিত আলোচনায় খুশী মহারাজের নাম পাওয়া যায় এবং পরবর্তী নবাবগণ সাদাত আলী খান, গাজীউদ্দিন হায়দার ও নাসিরউদ্দিন হায়দারের সময় দরবারী নৃত্যশিল্পীদের মধ্যে প্রকাশজী ও তাঁর ভাতৃদ্বয়ের নাম পাওয়া যায়। তবে ধারণা করা হয় খুশী মহারাজ নামক যে দক্ষ কত্থক শিল্পীর নাম জানা যায় তিনি এই বংশেরই কোন উত্তরাধিকারী হতে পারেন। কিন্তু এ বিষয়ে সঠিক তথ্যের উল্লেখ নেই। তবে একথা সর্বজন বিদিত ও সত্য যে আসাফউদ্দৌলার সময়কালে বা পরবর্তী নবাবদের সময়কালে লক্ষ্ণৌ দরবারে নৃত্যশিল্পীরূপে প্রকাশজীর আবির্ভাবের ফলে এই দরবারের সাথে তাঁর পরিবারের যোগসুত্র স্থাপিত হয়।[১]

লক্ষ্ণৌ ঘরানা মূলত বৈষ্ণবধর্মের অনুরাগী। সুফীধর্মের ভাবাবেগ এতে বিদ্যমান। তাই নৃত্যের পরিবেশনায় ভাবাবেগকে অধিক প্রাধান্য দেওয়া হয়। এই ঘরানার সাথে সংশ্লিষ্ট মুসলমান পৃষ্ঠপোষকগণ কত্থক নৃত্যের আঙ্গিকগত নৈপুণ্যে সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাঁরা এই নৃত্যের মাধ্যমে জীবনের বিশেষ বিশেষ ভাব দেখতে চাইতেন। ফলে এই ঘরানার কত্থকনৃত্যে অত্যন্ত সুক্ষ্ম ভাবের প্রকাশ ঘটতে থাকে এবং নৃত্যশিল্পীরা নাট্যশাস্ত্রের নায়ক-নায়িকার সাহায্যে এই ভাবকে বিভিন্নভাবে উপস্থাপিত করেন। এভাবেই ঠুমরী, দাদ্‌রা ও গজলের সাথে কত্থক নৃত্য পরিবেশন জনপ্রিয় হয়ে ওঠে এবং নৃত্যে তোড়া-টুকরার

প্রাধান্য কমে গিয়ে কিছু নতুন বোলের সংযোজন ঘটে। যার ফলে পরবর্তী কালে পাখোয়াজের পরিবর্তে তবলা যন্ত্র কত্থক নৃত্যের সাথে সঙ্গত হতে থাকে।

নবাব ওয়াজেদ আলী শাহ ছিলেন ঠুমরী গানের প্রবর্তক তাই তাঁর দরবারেই ঠুমরীর সাথে কত্থক নৃত্যের প্রচলন শুরু হয়। ওয়াজেদ আলী শাহ, ঠাকুর প্রসাদজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ পূর্বক গুরুর প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তির কারণে তাঁর রাজসভায় নিজের স্থানের পাশেই ঠাকুর প্রসাদজীর বসবার স্থান নির্দিষ্ট করেন। ঠাকুর প্রসাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দুর্গা প্রসাদ ওয়াজেদ আলীর দরবারে যোগদান করেন। দুর্গা প্রসাদের তিনপুত্র বিন্দাদীন, কালকা প্রসাদ ও ভৈরব। এঁদের মধ্যে বিন্দাদীন ও কালকা প্রসাদ নৃত্যগুরু ও নৃত্য শিল্পী হিসেবে অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করেন। বিন্দাদীন মহারাজ সংগীত রচয়িতা ও কালকা মহারাজ তবলাবাদক হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেন।

কৃষ্ণভক্ত বিন্দাদীন মহারাজ নবাব ওয়াজেদ আলীর পৃষ্ঠপোষকতায় শৃঙ্গার রসাত্মক ও লাস্যভাবের সমন্বয়ে রাধাকৃষ্ণের কাহিনী নৃত্যে রূপায়িত করেন। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে নিঃসন্তান বিন্দাদীন মহারাজ দেহাবসানের পর তাঁর উত্তরাধিকারী হলেন কালকা প্রসাদের তিনপুত্র- অচ্ছন মহারাজ (জগন্নাথ প্রসাদ), লচ্ছু মহারাজ (বৈজুনাথ) ও শম্ভু মহারাজ। এই তিন ভাইয়ের মধ্যে অচ্ছন মহারাজ নৃত্যে সর্বাধিক জনপ্রিয়তা অর্জনে সক্ষম হন। অচ্ছন মহারাজের পুত্র বিরজু মহারাজ বর্তমান যুগে লক্ষ্ণৌ ঘরানার অন্যতম শ্রেষ্ঠশিল্পী হিসেবে বিবেচিত। এছাড়াও অন্য শিল্পী যারা এই ঘরানায় খ্যাতি অর্জন করেছেন তাঁদের মধ্যে রামনারায়ণ, সিতারা, দয়মন্তযোশী, রোশন কুমারী, গোপীকৃষ্ণ, বেলা অর্নব, অনুরাধা গুহ, রীতা ভাণ্ডারী প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।[২]

এই ঘরানার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো:

(১) ভাবপ্রধান নৃত্য
(২) ভাবাভিনয়ের সাথে তাল ও ছন্দের সামঞ্জস্য সাধন
(৩) নৃত্যাংশে তোড়া ও টুকরার সমাবেশ
(৪) নৃত্যের ছোট ও শ্রুতিমধুর বোলের প্রয়োগ।

নিম্নে লক্ষ্ণৌ কত্থক ঘরানার বংশাবলীর একটি তালিকা দেওয়া হলো:

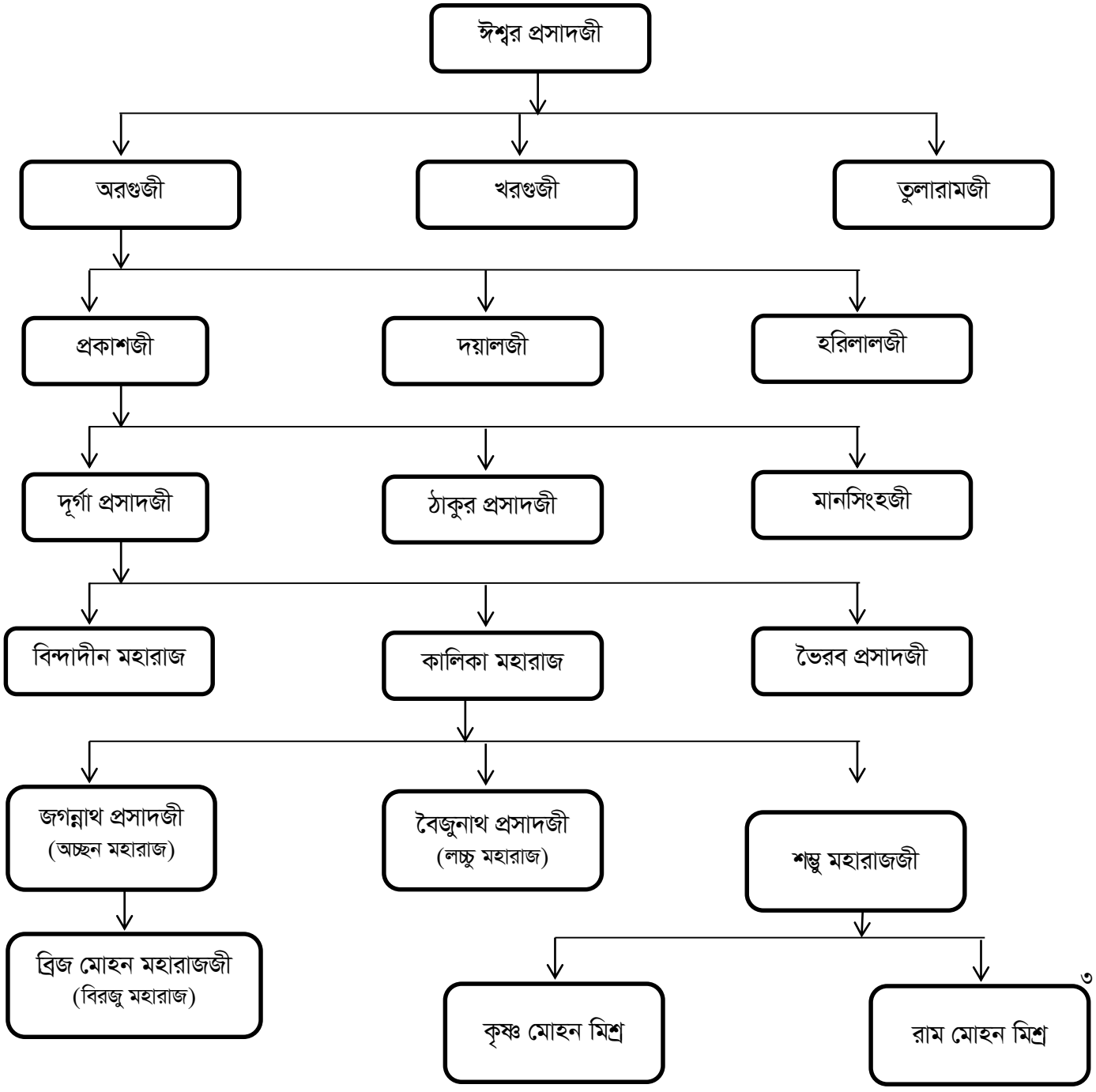

লক্ষ্ণৌ কত্থক ঘরানার বিখ্যাত নৃত্যশিল্পীদের চিত্র:

শম্ভু মহারাজজী [৪]

বৈজুনাথ প্রসাদজী
(লচ্ছু মহারাজ) [৫]

ব্রিজ মোহন মহারাজজী
(বিরজু মহারাজ) [৬]

কৃষ্ণ মোহন মিশ্র [৭]

তথ্য ও চিত্রসূত্র

১) ড. অভিজিত রায়, *কত্থকনৃত্যের উৎস ও প্রাসঙ্গিকতা*, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা: ১৪০৫।

২) ড. শংকর লাল মুখোপাধ্যায়, *ভারতীয় নৃত্য ধারার সমীক্ষা*, ফার্মা কে.এ.প্রা:লি: কলকাতা: ১৯৯৭।

৩) ড. অভিজিত রায়, *কত্থকনৃত্যের উৎস ও প্রাসঙ্গিকতা*, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা: ১৪০৫, পৃ: ৫৯।

৪) https://www.sahapedia.org/shambhu-maharaj-0

৫) https://timescontent.com/syndicationphotos/reprint/entertainment/376037 /lachhu-maharaj-kathak-dancer-indian.html

৬) https://www.masala.com/kathak-legend-pandit-birju-maharaj-to-perform-in-dubai-on-december-2-227911.html
৭) https://www.youtube.com/watch?v=ep7LaVmL6YM

জয়পুর কত্থক ঘরানা

“কত্থক নৃত্যের জয়পুর ঘরানার সুনির্দিষ্ট বংশ পরম্পরার ইতিহাস সঠিকভাবে পাওয়া যায় না। যেসমস্ত উত্তরসুরীদের থেকে এর ইতিহাস সম্বন্ধে জানা যায়, তার সুনির্দিষ্ট কোনও ঐতিহাসিকত্ব নেই, ফলে বেশির ভাগটাই গল্পকথায় পর্যবাসিত। তবে এর প্রধান কারণ জয়পুর ঘরানার উৎপত্তিই হলো সম্পূর্ণই ব্যক্তিকেন্দ্রীক। রাজাদের বংশ পরম্পরা পৃষ্ঠপোষকতা না পাবার ফলে এবং তার সঙ্গে যোগ্য নৃত্যশিল্পীর উত্তরাধিকারীর অপ্রতুলতার ফলে ধারাবাহিকতার চর্চা থেকে এই ঘরানা বারবার বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। ফলে এর ইতিহাস কোন প্রামাণিক তথ্য ব্যতিরেকে গল্প কথার মধ্যেই বিরাজমান। তাছাড়া রাজস্থান অঞ্চলের ঐতিহাসিক চিত্রটাই হলো অস্থিরচিত্ত। কারণ কোন রাজাই স্থায়ীভাবে বংশানুক্রমিক শান্তিপূর্ণভাবে রাজ্য শাসন করতে পারেনি। তার সঙ্গে ঐশ্বর্য্যের প্রাচুর্য্যের অপ্রতুলতাহেতু অথবা শৌর্য বীর্যকে প্রাধান্য দেবার জন্য, সংস্কৃতিচর্চার ধারাবাহিকতা কখনই বজায় থাকেনি।”[১]

তবে জয়পুর ঘরানার আশানুরূপ প্রসার না হওয়ার পশ্চাতে দুটি কারণ থাকতে পারে- প্রথমত, গুরুদের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে অবহেলা এবং দ্বিতীয়ত এই ঘরানার কিছু নৃত্যপ্রধানের অসংযমী জীবনযাপন। প্রায় দেড়শো বছর আগে জয়পুর ঘরানার গোড়াপত্তন করেন ভানুজী। ভানুজী শিবের ভক্ত ছিলেন। কথিত আছে তিনি এক সন্ন্যাসীর কাছ থেকে শিবতাণ্ডব নৃত্যশিক্ষা গ্রহণ করেন। লক্ষ্ণৌ ঘরানার সাথে এই ঘরানার নৃত্যশৈলীর বেশ পার্থক্য বিদ্যমান। জয়পুর কত্থক ঘরানার নৃত্যশৈলী লক্ষ্ণৌ ঘরানার মত ভাবপ্রধান নয়। এই ঘরানায় পায়ের সাহায্যে লয়কারী করা হয়। শুধুমাত্র পদযুগলের মাধ্যমে এই ঘরানায় তবলা ও পাখোয়াজের বোল নিপুণভাবে দেখানো হয়ে থাকে। ভানুজীর পুত্র মালুজী এবং মালুজীর পুত্র লালুজী ও কানুজী এই শিক্ষা বংশানুক্রমে গ্রহণ করেন। পরবর্তী কালে কানুজী বৃন্দাবনে যান এবং ভিন্ন ধারার নৃত্যশিক্ষা গ্রহণ পূর্বক কৃষ্ণের পূজারীরূপে লাস্য অঙ্গের নৃত্যে দক্ষতা অর্জন করেন। মালুজীও তাঁর পিতার নিকট হতে তাণ্ডব নৃত্যের শিক্ষা পান। এরপর থেকে এই ঘরানায় তাণ্ডব ও লাস্য উভয় প্রকার নৃত্যের প্রচলন শুরু হয়। কানুজীর পুত্র গীধাজী (গিরিধারী জী) ও শেহজাজী তাণ্ডব ও লাস্য উভয় প্রকারের নৃত্যেরই শিক্ষা গ্রহণ করেন। গীধাজীর পাঁচ পুত্রের মধ্যে অন্যতম ছিলেন দুল্‌হাজী। তিনি এই ঘরানাকে অনেক জনপ্রিয় ও সমৃদ্ধতর করে তোলেন। গীধাজীর অপর পুত্র হনুমান প্রসাদজীও এইশৈলীতে দক্ষতা অর্জন করেন।[২]

হনুমান প্রসাদজীর ভ্রাতা হরিপ্রসাদ ছিলেন নিঃসন্তান। এই দুই সহোদর ‘দেবপরী কী জোড়ী’ নামে বিখ্যাত ছিলেন। হনুমান প্রসাদজীর তিনপুত্র হলেন মোহনলাল, চিরঞ্জীলাল এবং নারায়ণ প্রসাদ। এঁদের মধ্যে নারায়ণ প্রসাদজী সবচেয়ে খ্যাতিলাভ করেন। ১৯৫৮ সালে নারায়ণ প্রসাদজী মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর

পুত্র চরণগিরিধরও একজন দক্ষ নৃত্যশিল্পী হিসাবে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। নারায়ণ প্রসাদজীর শিষ্যা রাণীকর্ণ নৃত্যশিল্পী হিসাবে বিশেষ পরিচিতি লাভ করেন। হরিপ্রসাদ ও হনুমান প্রসাদের বংশধরেরা জয়পুর ঘরানাকে সমৃদ্ধ করেন। এঁদের মধ্যে- শ্যামলাল, চুন্নীলাল, দুর্গাপ্রসাদ ও গোবর্ধনজীর নাম উল্লেখযোগ্য। চুন্নীলালজীর পুত্র জয়লালজী ও সুন্দরলাল প্রসাদজী জয়পুর ঘরানার শ্রেষ্ঠশিল্পী হিসেবে চিহ্নিত। পরবর্তী কালে সুন্দরলাল প্রসাদজী বিন্দাদীন মহারাজের কাছে কত্থক নৃত্যের তালিম নেন এবং লক্ষ্ণৌ ও জয়পুর উভয় ঘরানাতেই পারদর্শিতা অর্জন করেন। যার ফলে তাঁর নৃত্যে এই দুই ঘরানারই সংমিশ্রণ দেখা যায়। চুন্নীলালজীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা নিঃসন্তান দুর্গা প্রসাদজী- জয়লালজী ও সুন্দর লালজীর নৃত্যগুরু ছিলেন । জয়লালজীর কন্যা জয়কুমারী এবং পুত্র রামগোপাল মিশ্র অত্যন্ত গুণী ও দক্ষ নৃত্যশিল্পী হিসেবে খ্যাতি অর্জনপূর্বক জয়পুর ঘরানার যোগ্য ধারকের দায়িত্ব পালন করে গেছেন।

জয়পুর ঘরানার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এই ঘরানার নৃত্যের বোল লক্ষ্ণৌ ঘরানার তুলনায় বড় হয় এবং বোলে শব্দের আধিক্য দেখা যায়। এখানে ভাবের দিকে তেমন নজর দেয়া হয়না। তার পরিবর্তে জটিল তাল লয়ের প্রাধান্য দেখা যায়। নৃত্য অপেক্ষা নৃত্তের (মুদ্রার চেয়ে পায়ের কাজ বেশি) ব্যবহার বেশি। এই ঘরানায় গজপরন, মোরপরন, মীনপরন ইত্যাদি প্রচলিত।

জয়পুর কত্থক ঘরানার বংশ পরম্পরাগত তালিকা:

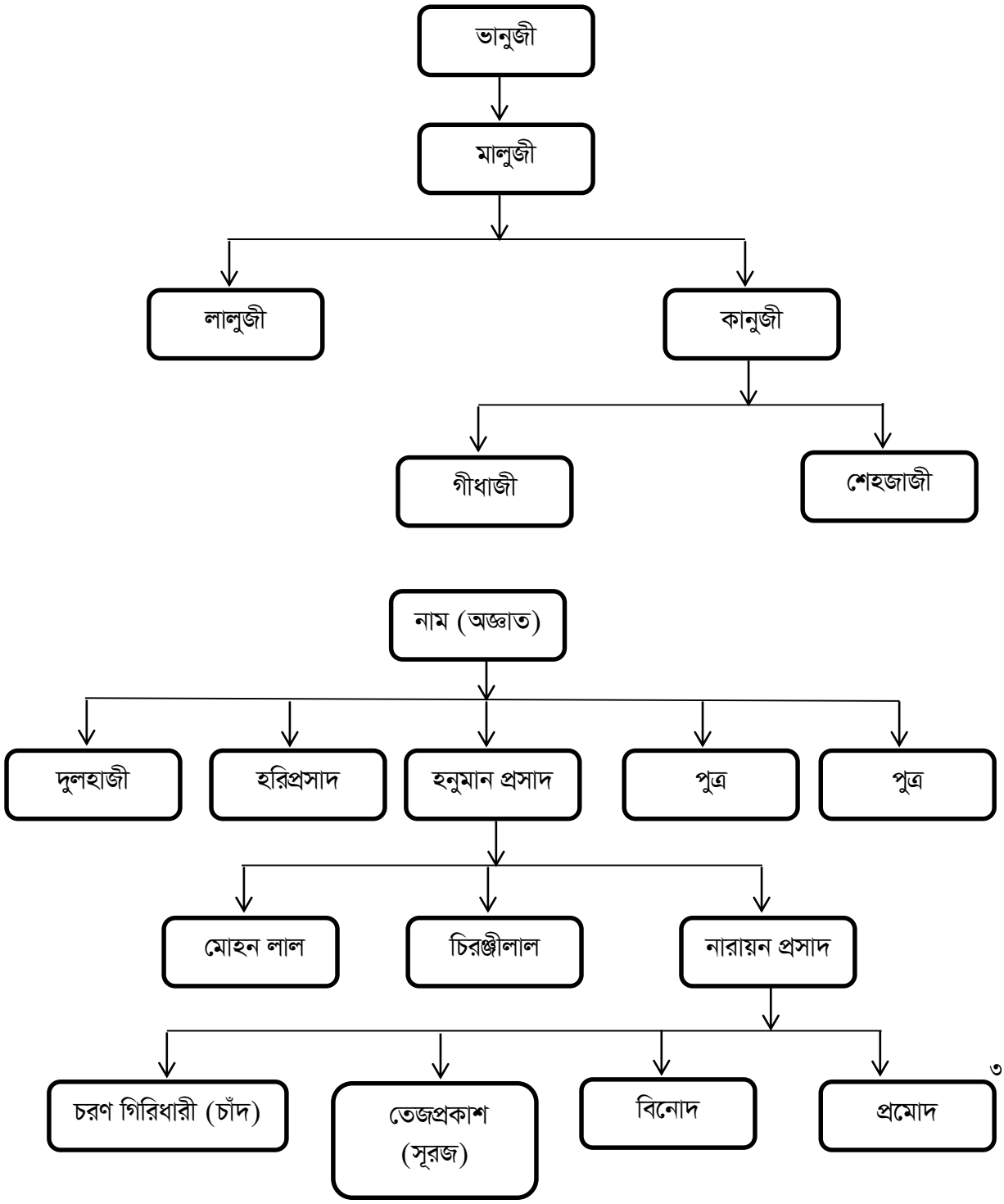

জয়পুর কত্থক ঘরানার বিখ্যাত নৃত্যশিল্পীর চিত্র:

চরণ গিরিধারী (চাঁদ) [৪]

তথ্য ও চিত্রসূত্র

১) অভিজিত রায়, *কত্থকনৃত্যের উৎস ও প্রাসঙ্গিকতা*, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা: ১৪০৫, পৃ: ৫৯।

২) শংকর লাল মুখোপাধ্যায়, *ভারতীয় নৃত্য ধারার সমীক্ষা*, ফার্মা কে.এ.প্রা:লি: কলকাতা: ১৯৯৭।

৩) অভিজিত রায়, *কত্থকনৃত্যের উৎস ও প্রাসঙ্গিকতা*, প্রকাশক: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা: ১৪০৫, পৃ: ৬২।

৪) https://www.youtube.com/watch?v=S0-W-b6WTl4

বেনারস কত্থক ঘরানা

এই ঘরানার প্রবর্তক জানকীপ্রসাদ। তাঁর সৃষ্ট জয়পুর ঘরানার একটি শাখা পরবর্তী কালে বেনারস ঘরানা নামে পরিচিতি লাভ করে। বেনারস ও লক্ষ্ণৌ ঘরানার মধ্যে অনেক সাদৃশ্য বিদ্যমান। জয়পুর ঘরানার পূর্বে রাজস্থানে 'শ্যামলদাস ঘরানা' নামক একটি পৃথক ঘরানা প্রচলিত ছিল। পরবরর্তীতে শ্যামলদাসের ঘরানা দ্বিধাবিভক্ত হয়ে জয়পুর ও বেনারস ঘরানা নামে প্রসিদ্ধি অর্জন করে। জানকীপ্রসাদের পূববর্তী বংশধরদের তালিকানুযায়ী জানকীপ্রসাদজীর প্রপিতামহ ছিলেন গোপীপ্রসাদজী, পিতামহ ছিলেন গোবিন্দপ্রসাদজী এবং পিতা হলেন আনন্দপ্রসাদজী।[১]

জানকীপ্রসাদের ভ্রাতা চুনীলাল ও দুল্হারামের মধ্যে চুনীলাল রাজস্থানে এবং দুল্হারাম বেনারসে বসবাস শুরু করেন। দুল্হারামের তিনপুত্র বিহারীলাল, পুরণ লাল ও হীরালালের মধ্যে বিহারীলাল ইন্দোর দরবারে নিযুক্ত হন এবং নৃত্যে অত্যন্ত দক্ষতা অর্জন করেন। বিহারী লালের তিনপুত্র কিশনলাল, মোহনলাল ও সোহনলাল দেরাদুনে এবং পুরণলালের দুইপুত্র মদনলাল ও রামলাল পাতিয়ালায় বসবাস শুরু করেন। জানকীপ্রসাদের ভাতৃস্পুত্র হনুমানপ্রসাদ, শিবলাল এবং গোপালদাস এই ঘরানার নৃত্যে অত্যন্ত খ্যাতি অর্জন করেন। শিবলাল নৃত্য ব্যতিরেকে তবলাবাদনেও পারদর্শী ছিলেন। শিবলালের তিনপুত্রের মধ্যে- কুন্দনলাল নৃত্যে তালিম নিলেও অপর দুইপুত্র সুখদেব ও দুর্গাপ্রসাদ নৃত্যচর্চা করেননি। এই ঘরানার আধুনিক কালের শিল্পী হিসেবে গোপীকিষাণের নাম উল্লেখযোগ্য।

বেনারস ঘরানাকে লক্ষ্ণৌ বা জয়পুর ঘরানা থেকে সহজেই পৃথক করা যায় কারণ এই ঘরানার মুদ্রার প্রয়োগবিধি- লক্ষ্ণৌ বা জয়পুর ঘরানা থেকে ভিন্ন ও স্বতন্ত্র। শিব ও বিষ্ণুর সমন্বয়ে যে হরিহর মতবাদের প্রচলন হয়েছিল তারই প্রতিচ্ছবি এই ঘরানায় দেখতে পাওয়া যায়। বিষ্ণুর পরিবর্তে এখানে শ্রীকৃষ্ণের লাস্যপদ্ধতি সংযোজন করা হয়েছে। তবে সর্বসম্মতিক্রমে এই নৃত্যঘরানা কত্থকের প্রাচীন দুই ঘরানা লক্ষ্ণৌ ও জয়পুর নৃত্য ঘরানার বৈশিষ্ট্য নিয়েই গঠিত।[২]

Dhaka University Institutional Repository

বেনারস কত্থক ঘরানা বংশ তালিকা :

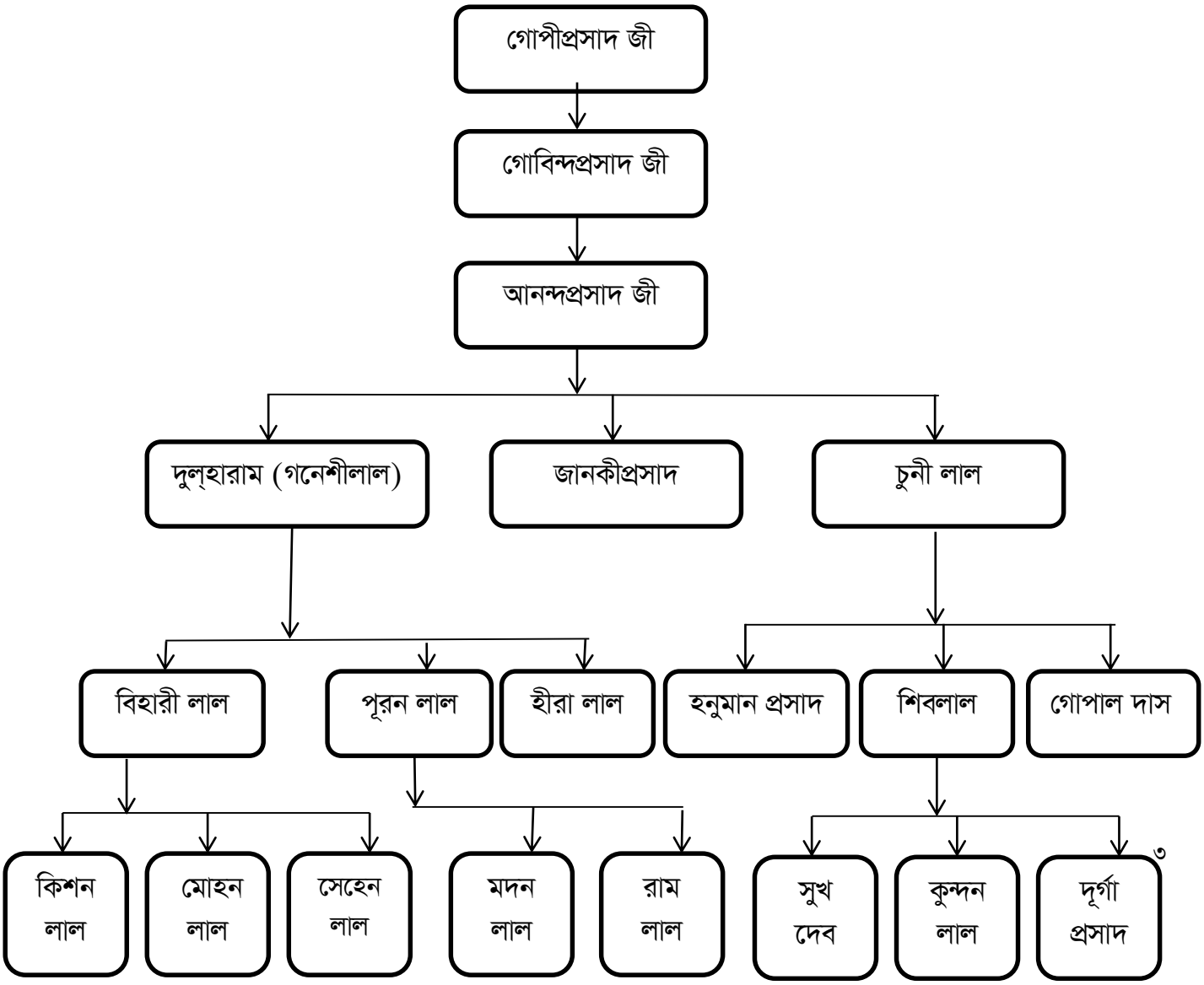

বেনারস কত্থক ঘরানার বিখ্যাত নৃত্যশিল্পীদের চিত্র:

কুন্দন লাল [৪]

গোপীকিষাণ [৫]

তথ্য ও চিত্রসূত্র

১) করুণাময় গোস্বামী, *সংগীতকোষ*, বাংলা একাডেমী, প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৫।

২) শাশ্বতী সেনগুপ্ত মুখার্জী, *কত্থক নৃত্যকলা*, প্রকাশক: নিখিল রঞ্জন সেনগুপ্ত, প্রথম প্রকাশ: ১৩৯৪।

৩) অভিজিত রায়, *কত্থকনৃত্যের উৎস ও প্রাসঙ্গিকতা*, প্রকাশক: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা: ১৪০৫।

৪) https://www.indianetzone.com/18/guru_kundan_lal_gangani_indian_dancer.htm

৫) http://cinemanrityagharana.blogspot.com/2014/01/film-dances-of-gopi-krishna-including.html

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার

ভারতীয় সংগীত প্রথায় 'ঘরানা' শব্দটি একটি গুরুত্বপূর্ণ অর্থ বহন করে। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে জানা যায় যে, পূর্বে ভারতীয় সংগীত পদ্ধতিতে অঞ্চলভেদে ভাষাগত পার্থক্যই ছিল মূল প্রভেদ। কিন্তু মুসলমানদের শাসনামলে এতে পরিবর্তনের সুর বাজে। আরব, পারস্য প্রভৃতি বিদেশী সংগীত ও সংস্কৃতির সংস্পর্শ ও প্রভাবে ধীরে ধীরে উত্তর ভারতীয় সংগীত পদ্ধতির বিবর্তন শুরু হয়ে বিকাশ হয় 'হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতির'। এই সংস্কৃতি দক্ষিণ ভারতীয় সংগীত পদ্ধতিকে তেমন প্রভাবিত করতে না পারলেও উত্তর ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বিগত কয়েক শতাব্দীতে ভিন্ন ভিন্ন ঘরানার উদ্ভব হয়েছে। এইসকল ঘরানাগুলোর সংগীতশৈলীর ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য থাকলেও বর্তমানে তার অধিকাংশই একে অন্যের সঙ্গে মিলে একাকার হয়েছে। ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের সূচনাকাল নির্ণয় করা কঠিন হলেও বৈদিক যুগকেই এর সঠিক সময় বলে মনে করা হয় এবং এই যুগের শেষভাগেই ধ্রুপদ গায়নরীতির প্রচলন হয়। এই ধ্রুপদ থেকে আবার বিভিন্ন গায়নরীতি বিকাশ লাভ করে। ফলে মধ্যযুগের শেষভাগে প্রচলন হয় খেয়ালের। মধ্যযুগের মুসলমান শাসনামলে নবাবদের চিত্তবিনোদনের জন্য দরবারগুলোতে খেয়াল গানের চর্চা শুরু হয় যা অত্যন্ত জনপ্রিয়তা অর্জন করে। খেয়াল গানের প্রচার ও প্রসার হয় ঘরানার মাধ্যমে। তবে ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে দরবারী সংগীতজ্ঞদের প্রথম বিপর্যয় ঘটে কারণ ঔরঙ্গজেব ছিলেন ঘোর সংগীতবিরোধী। তাঁর রাজত্বকালে যখন তিনি দরবারী সংগীতজ্ঞদের বহিস্কার করেন তখন তাঁরা আশ্রয় ও জীবিকার সন্ধানে সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে পড়েন এবং বিভিন্ন অঞ্চলের রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় সংগীতচর্চা করতে থাকেন। যার ফলেই অঞ্চলভেদে এইসকল শিল্পীদের গায়নশৈলীর পরিচিতিরূপে তাঁদের নাম কিংবা অঞ্চলের নামে সৃষ্টি হয় ভিন্ন ভিন্ন ঘরানার। উক্ত সংগীত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন অনেক সৃজনশীল ও প্রতিভাবান শিল্পী যাঁদের সংগীত প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁদের দক্ষতা ও জনপ্রিয়তার মাধ্যমে। বংশপরম্পরা ও শিষ্যপরম্পরার মাধ্যমে একটি সংগীত পরিবারের গায়নশৈলীই ঘরানারূপে মর্যাদা লাভ করে। এই পরম্পরায় কমপক্ষে তিনপুরুষ পর্যন্ত সংগীতচর্চা ও সাধনা থাকলেই পূর্বে তা 'ঘরানা' পদবাচ্য হত। বিভিন্ন ঘরানার কণ্ঠ তৈরি ও তার প্রয়োগবিধির মধ্যেও পার্থক্য রয়েছে। আগ্রা ঘরানার ফৈয়াজ খাঁ কিংবা কিরানা ঘরানার আব্দুল করিম খাঁ'র গায়নশৈলীতে কণ্ঠ প্রয়োগে ভিন্নতা অনেক। কিরানা ঘরানার স্বরপ্রয়োগ অত্যন্ত সুমধুর ও কোমল হয়ে থাকে। অন্যদিকে আগ্রা ঘরানায় খোলা আওয়াজে স্বর প্রয়োগ করা হয়। আগ্রা ঘরানার খেয়ালগানে ধ্রুপদের রীতিতে নোম-তোম যুক্ত আলাপ করা হয়। অন্যদিকে কিরানা ঘরানার খেয়াল গানে স্বর দিয়ে আলাপ করা হয়। সাধারণ মানুষের কাছে 'ঘরানা' তেমন গুরুত্বপূর্ণ না হলেও একজন নিষ্ঠাবান শিক্ষার্থীর কাছে এর গুরুত্ব অনেক।

Dhaka University Institutional Repository

শিক্ষার্থীদের মনে বিভিন্ন ঘরানার পার্থক্যগুলোর রহস্যভেদের যে আগ্রহ তৈরি করে তা কোন নির্দিষ্ট ঘরানাদার গুরুর অধীনে দীর্ঘকাল অনুশীলনের মাধ্যমেই জানা সম্ভব। বর্তমানে বিভিন্ন ঘরানার শিল্পী বিদ্যমান থাকলেও পূর্বের সেই শুদ্ধতা আজ আর নেই। ভারতবর্ষের সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির ফলে ঘরানা নামক যে সংগীতশৈলীর উদ্ভব হয়েছিল তা আজ অনেকাংশেই বিলুপ্ত। প্রযুক্তির ব্যবহারসহ সংগীত সম্বন্ধীয় যান্ত্রিক উপাদানের দরুণ ঘরানার অস্তিত্ব আজ প্রশ্নবিদ্ধ। ঘরানার সৃষ্টিকাল থেকে সকল ঘরানার প্রতিনিধি শিল্পীগণ যে মানের কণ্ঠ নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন সে অনুসারেই তাঁর ঘরানার বৈশিষ্ট্য বা গায়কী নির্ণয় করা হয়েছে। রাগ, বন্দিশ বা তাল এক হলেও শিল্পীর গায়কীর মাধ্যমেই তাঁর ঘরানাকে আলাদা করা সম্ভব। একজন শিষ্য যখন গুরুগৃহে বাস করে দিনরাত সেই সংগীতশৈলীর শ্রবণ, চর্চা ও আয়ত্ত্ব করেন- তখনই সেই পরম্পরায় এক নতুন শিল্পীর জন্ম হয়। বর্তমানকালে গুরুগৃহে বাস করে শুধুমাত্র গুরুর তালিম নিয়ে বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার দিন আর নেই। কারণ বর্তমানে প্রতিটি মানুষের মাঝেই ইচ্ছাশক্তির মূল্যবৃদ্ধি পাওয়ায় গুরুগৃহে বাস করে গুরুর ইচ্ছানুযায়ী সংগীতশিক্ষার মানসিকতা নেই বললেই চলে। নিজগৃহে বসেই প্রযুক্তির ব্যবহারে সংগীতশিক্ষা বা গান রেকর্ড করে জনপ্রিয়তা অর্জনের চেষ্টাও ঘরানা বিলুপ্তির আরেকটি কারণ। তবে সংগীতের শুদ্ধতা ও রাগের বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে ঘরানার কোন বিকল্প নেই। প্রাচীন গায়নরীতি ধ্রুপদের বাণীর প্রচলন কম হওয়ায় যেমন ধ্রুপদের জনপ্রিয়তা কমেছে এবং বর্তমানে জয়পুর-ডাগর পরিবার ব্যতীত আর কোন ধ্রুপদী পরিবার নেই, তেমনি ঘরানার বিলুপ্তিতে খেয়াল গানের দশাও এমন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই ঘরানার প্রয়োজনীয়তা অনেক। বর্তমানে এরজন্য দরকার উচ্চস্তরের ঘরানাদার সংগীতজ্ঞ এবং নিষ্ঠাবান শিক্ষার্থীর। জমিদারী প্রথা বিলুপ্তির সাথে সাথে সংগীত পৃষ্ঠপোষকতা প্রথারও সমাপ্তি ঘটায় সংগীতজ্ঞদের জীবন এখন অনিশ্চিত। আজ তাঁরা তাই জীবিকার জন্য সংগীত পরিবেশন করছেন বা শিক্ষকতা করছেন। বর্তমান প্রযুক্তির যুগে যেখানে সীমিত সময়ের মধ্যেই মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা রয়েছে সেখানে কলা প্রদর্শনের সুযোগ খুবই কম। পূর্বে ঘরানাদার শিল্পী বলতে যা বোঝাতো, বর্তমানে সেই রকম শিল্পী খুব কমই তৈরি হচ্ছে। তবে একটি আশার দিক হলো, ঘরানার তালিম ও ঘরানাদার শিল্পী তৈরি এবং ঘরানার মহত্ব বজায় রাখার জন্য ভারতের কলকাতায় I.T.C'র পক্ষ থেকে 'সংগীত রিসার্চ আকাদেমি' এবং বাংলাদেশে বেঙ্গল ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে 'বেঙ্গল পরম্পরা' গঠন করা হয়েছে। এতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন ঘরানার শিল্পীদের একত্রিত করে বাছাইয়ের মাধ্যমে শিক্ষার্থী নিয়োগ ও তাদের জন্য বিশেষ বৃত্তির ব্যবস্থা করে সেইসকল ঘরানাদার শিল্পীদের দ্বারা তালিমের ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগে রবীন্দ্র, নজরুল ও লোকসংগীতের পাশাপাশি ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের কণ্ঠ ও তবলা বিষয়ে ঘরানাদার তালিমসহ তত্ত্বীয় পাঠদান এবং নৃত্যকলা বিভাগে কত্থক, ভরতনাট্যম ও মনিপুরী

Dhaka University Institutional Repository

নৃত্যের ঘরানাদার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরাও ঘরানাদার সংগীতশিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে। যার ফলে এইসকল শিক্ষার্থীরা পরবর্তী সময়ে তাদের অনুশীলনের মাধ্যমে বাংলাদেশেও ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের (গীত, বাদ্য, নৃত্য) প্রচার ও প্রসারে সহায়ক হবে। তবে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় বিভিন্ন ঘরানাদার শিক্ষক থাকায় নির্দিষ্ট কোন ঘরানার গায়কী অর্জন করা সম্ভব নয়। গুরুশিষ্য পরম্পরায় শিক্ষালাভের জন্য শিক্ষার্থীকে তার পছন্দ অনুযায়ী ঘরানা নির্বাচন করে সেই ঘরানাদার গুরুর কাছে একাগ্রচিত্তে তালিম নিলেই সে একজন ঘরানাদার শিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে এবং পরবর্তীকালে সেই পরম্পরা বজায় রেখে ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সেই ঘরানার ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। তাই আশা করা যায় এর মাধ্যমে ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের ক্ষেত্রে একটি নবদিগন্তের সূচনা হবে।

সবশেষে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, প্রতিষ্ঠিত প্রত্যেকটি ঘরানাই তার নিজ বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে সমৃদ্ধ, যা সর্বকালেই শ্রোতা দ্বারা সমাদৃত।

পরিশিষ্ট

ঘরানাভেদে খেয়াল গানের বন্দিশের স্বরলিপি

সংস্কৃতি হচ্ছে একটি জাতির দর্পণ স্বরূপ। সংগীত, নৃত্য, বাদ্যযন্ত্র, ভাস্কর্য, চিত্রকলা, কাব্য– এ সকল সৃজনশীল শিল্পের মূল লক্ষ্য চিত্তবিনোদন। চিত্রকলায় যেমন শিল্পী তার কল্পনার আধারে একটি রূপ দাঁড় করাতে পারে ঠিক সেই রকম সংগীতে সম্ভব নয়। সংগীতের প্রত্যক্ষ কোন রূপ না থাকায়- গায়ক, বাদক ও শ্রোতাদের পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের উপরই এর নান্দনিক বিচার-বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন নির্ভর করে। আলোচ্য অধ্যায়ে বিভিন্ন ঘরানার বন্দিশ দেয়া হলো। প্রত্যেকটি ঘরানার বন্দিশ রচনায় ভাষার বৈশিষ্ট্য, বন্দিশের আকৃতি, রাগের রূপ, তাল ইত্যাদি বিষয় বিবেচিত হয়। প্রতিটি ঘরানার স্বর প্রয়োগ ও বাণীর ব্যবহার ভিন্ন বিধায় বন্দিশের রূপও ভিন্ন হয়ে যায়। এছাড়া শিল্পীর দক্ষতা ও গায়কী তার ঘরানাকে সুস্পষ্টরূপে শ্রোতা সম্মুখে ফুটিয়ে তুলতে সহায়ক ভূমিকা রাখে। আলোচ্য গবেষণায় ভাতখণ্ডে স্বরলিপি পদ্ধতিতে কিছু ঘরানার প্রসিদ্ধ বন্দিশের উল্লেখ করা হলো। ভাতখণ্ডে স্বরলিপি পদ্ধতির নিয়মাবলী নিম্নরূপ।

শুদ্ধ স্বর = সা রে গ ম প ধ নি।

বিকৃত স্বর = রে গ ম́ ধ নি। (ম́ কে তিব্র বা কড়ি ম বলা হয়)

মন্দ্র স্বর = স্বরের নিচে বিন্দু (.)
যেমন- ধ় নি় প্রভৃতি।

তার স্বর = স্বরের মাথায় বিন্দু (˙)
যেমন - গ̇ ম́̇ প̇ প্রভৃতি।

মাত্রা = কোন চিহ্ন নেই; পৃথক পৃথক স্বর-অবস্থানই এক মাত্রায় একটি স্বর প্রকাশ করে। যেমন- সা রে গ ইত্যাদি।

একমাত্রায় দুটি স্বর = সারে গরে সাসা

একমাত্রায় তিনটি স্বর = সারেগ গমপ

একমাত্রায় চারটি স্বর = সারেগম মরেগরে

দুই মাত্রায় একটি স্বর = সা– ।

তিন মাত্রায় একটি স্বর = সা– – ।

চার মাত্রায় একটি স্বর = সা– – – ।

Dhaka University Institutional Repository

তাল বিভাগ = ×, ২, ০, ৩ দাঁড়ি চিহ্ন।

সম্-চিহ্ন = ×

ফাঁক (খালি) চিহ্ন = শুন্য (০)।

তালি চিহ্ন = ২, ৩, ৪ প্রভৃতি সংখ্যা।

মীড় চিহ্ন = স্বরের উপরে ⁀ চিহ্ন।

যেমন- সা⁀মা

গিটকিরী = (সা)– রেসানিসা অথবা (প)– ধপমপ

কণ (স্পর্শ স্বর) = ᵍম

স্বরে সামান্য বিরতি = 'কমা' (,) চিহ্ন।

এই পদ্ধতিতে স্বরের নিচে বন্দিশের শব্দ লেখা হয়ে থাকে। যে স্থানে শব্দ থাকেনা সেই স্থানে 'অবগ্রহ' (ऽ) চিহ্ন দেওয়া হয়।

সেনী ঘরানার বন্দিশ

উল্লেখিত বন্দিশটি ভারতবর্ষের প্রখ্যাত সংগীতজ্ঞ সেনী ঘরানার সদারঙ্গ দ্বারা রচিত। এই বন্দিশটিতে রাগ গৌড় সারং এবং তাল ত্রিতালের ব্যবহার করা হয়েছে। ব্রীজ ভাষায় রচিত এই বন্দিশে স্থায়ী ও অন্তরা দুটি তুকই আছে। গৌড় সারং একটি বক্র প্রকৃতির রাগ। এই রাগে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই পমপ ও গরেমগ স্বরসংগতি দেখা যায়। উল্লেখিত বন্দিশ :

রাগ– গৌড় সারং
তাল– ত্রিতাল

স্থায়ী

পিউ পলন লাগে মোরি আঁখিয়া
তুম বিন তড়পত মোরি ছাতিয়া।

অন্তরা

আবন কহগয়ে অজহুন আয়ে
সদারঙ্গ পিয়া বিন ক্যায়সে কঁরু বতিয়া।[১]

স্থায়ী

১	২	৩	৪		৫	৬	৭	৮		৯	১০	১১	১২		১৩	১৪	১৫	১৬
				‖			পম'	প	‖	গ	ম	গ	রেসা	‖	ন়ি	রে	ন়ি	সা
							পিS	উ		প	ল	ন	লাS		S	গে	মো	রি
গ	রে	ম	–	‖	গ	–	পম'	প	‖	গ	ম	গ	রেসা	‖	ন়ি	রে	ন়ি	সা
আঁ	খি	য়া	S		S	S	পিS	উ		প	ল	ন	লাS		S	গে	মো	রি
গ	রে	ম	–	‖	গ	–	–	–	‖	গ	ম	প	প	‖	প	প	ম'	প
আঁ	খি	য়া	S		S	S	S	S		তু	ম	বি	ন		ত	ড়	প	ত
ধনি	সাঁনি	ধ	পম	‖	গ	ম	গ	রে	‖	গ	ম	গ	রেসা	‖	ন়ি	রে	ন়ি	সা
মোS	SS	রি	SS		ছা	তি	য়া	S		প	ল	ন	লাS		S	গে	মো	রি

গা রে ম – || গ – – – ||
আঁ খি য়া S S S S S
× ২ ০ ৩

অন্তরা

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮
|| ম॑ প নিধ নি || র্সা র্সা – –
আ S বS ন ক হ গ য়ে

৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬
– র্সার্সা র্সা নি || ধনি র্সানি ধপ ম॑প || ম॑ প নিধ নি || র্সা – – –
S অজ হু ন SS SS আয়ে SS আ S বS ন ক হ গ য়ে

প নি র্সা র্রে || র্সা নি ধ প || নি ধ প ম॑ || গ ম গ রে
স দা রুং গ পি য়া বি ন ক্যায় সে ক রু ব তি য়া S

গ ম গ রেসা || নি় রে নি় সা ||
প ল ন লাS S গে মো রি
০ ৩ × ২

বেতিয়া ঘরানার বন্দিশ

বেতিয়া ঘরানার উল্লেখিত রচনাটি একটি চার-তুক বিশিষ্ট ধ্রুপদ। এর রচয়িতা বেতিয়ার মহারাজা আনন্দকিশোর রায় চৌধুরী। ধ্রুপদটি ভৈরবী রাগে রচিত। ঝাঁপতালে নিবদ্ধ এই ধ্রুপদখানি বেতিয়া ঘরানার একটি অন্যতম ধ্রুপদ হিসেবে বিশেষ সমাদৃত।

ধ্রুপদ

ভৈরবী–ঝাঁপতাল

স্থায়ী

ভবানী দয়ানী মহাবাক বাণী

সুর নর মুনিজন মানী

সকল বুধ জ্ঞানী।

অন্তরা

জগজননি জগজানি

মহিষাসুরমরদনী

জ্বালামুখী চণ্ডী

অমর পদ দানী।[২]

স্থায়ী

১	২	||	৩	৪	৫	||	৬	৭	||	৮	৯	১০
												ধ
												ভ
সাঁ	–	||	সাঁ	–	রেঁ	||	সাঁ	–	||	ধ	প	প
বা	s		নী	s	দ		য়া	s		নী	s	ম
×			২				০			৩		

নি	–	||	ধ	–	প	||	প	–	||	গ	–	মা
হা	ऽ		বা	ऽ	ক		বা	ऽ		নী	ऽ	সু
×			২				০			৩		

প	পনি	||	ধ	প	প	||	মগ	গ	||	রে	–	সা
র	ন		র	মু	নি		জ	ন		মা	ऽ	নি
×			২				০			৩		

সাগং	গং	||	গং	রেং	রেং	||	সাং	–	||	নিধ	–	নি
স	ক		ল	বু	ধ		জ্ঞা	ऽ		নী	ऽ	ভ
×			২				০			৩		

অন্তরা

পধ	ম	||	ধ	ধ	নি	||	সাং	সাং	||	সাং	–	সাং
জ	গ		জ	ন	নি		জ	গ		জা	ऽ	নি
×			২				০			৩		

সাংরেং	রেং	||	রেং	–	রেং	||	গং	রেং	||	রেং	সাং	সাং
ম	হি		ষা	ऽ	সু		র	ম		র	দ	নি
×			২				০			৩		

গং	–	||	গং	–	মং	||	রেং	–	||	সাং	–	সাং
জ্বা	ऽ		লা	ऽ	মু		খী	ऽ		চন্	ऽ	ডী
×			২				০			৩		

প	ধ	||	নি	সাং	রেং	||	সাং	–	||	ধ	–	নি
অ	ম		র	প	দ		দা	ऽ		নী	ऽ,	ভ
×			২				০			৩		

গোয়ালিয়র ঘরানার বন্দিশ

গোয়ালিয়র ঘরানার নিম্নোক্ত বন্দিশগুলোর রচনা কে করেছেন তা সঠিকভাবে জানা যায় না। তবে এই ঘরানার গায়কেরা এই বন্দিশগুলো গেয়েছেন এবং তাঁদের মতামত অনুযায়ী এগুলো গোয়ালিয়র ঘরানার বিশেষ কিছু বন্দিশ। যেহেতু গোয়ালিয়র ঘরানার বেশীরভাগ সংগীতজ্ঞই মারাঠী তাই ব্রীজভাষা ছাড়াও এই ঘরানার অধিকাংশে রচনা মারাঠী ভাষায় এবং ধ্রুপদশৈলীর রচনা হিসেবে দেখতে পাওয়া যায়।

রাগ–ভূপালী – ত্রিতাল (মধ্যলয়)

স্থায়ী

জবসে তুম সন লাগলী
পীত নভেলী পেয়ারে বল্যা মোরী ॥

অন্তরা

জো ন্যায়ন না দেখো তোহে
কল না পরত মোহে চর্চা করে সবসে লরিয়াঁ ॥৩

স্থায়ী

৯	১০	১১	১২		১৩	১৪	১৫	১৬		১	২	৩	৪		৫	৬	৭	৮
গ	রে	গ	রে	‖	সা	রে	সা	ধ	‖	–	সা	–	রে	‖	গ	–	–	–
জ	ব	সে	ऽ		তু	ম	স	ন		ऽ	লা	ऽ	গ		লী	ऽ	ऽ	ऽ
গ	–	প	প	‖	প	ধ	প	গ	‖	গ	প	ধ	র্সা	‖	পধ্	র্সা	ধপ্	গরে
পী	ऽ	ত	ন		ভে	ऽ	লী	ऽ		পেয়া	রে	ব	ল্যা		ऽऽ	ऽ	মোऽ	রীऽ
০					৩					×					২			

অন্তরা

									।	গ	–	গ	–	।	প	প	র্সা	ধ
										জো	ऽ	ন্যায়	ऽ		ন	ন	না	ऽ
র্সা	–	র্সা	–	‖	র্সা	র্রে	র্সা	–	‖	র্সা	র্রে	র্গ	র্রে	‖	র্সা	র্রে	র্সা	পধ্
দে	ऽ	খো	ऽ		তো	ऽ	হে	ऽ		ক	ল	ন	প		র	ত	মো	হেऽ
র্সা	-ধ্	–	প	‖	গ	রে	গ	প	‖	র্সাধ	র্সাধ	পধ্	র্সা	‖	ধ	প	গ	রে
চ	ऽর্চা	ऽ	ক		রে	ऽ	স	ব		সেऽ	ऽऽ	ऽऽ	ऽ		ল	রি	য়াঁ	ऽ

গোয়ালিয়র ঘরানার বন্দিশ

রাগ–ভূপালী – ত্রিতাল (বিলম্বিত)

স্থায়ী

জব হী সব নীরপত নিরাস ভয়ে।

অন্তরা

গুরু পদ কমল বৌন্দে রঘুপত
চাপ সমীপ গয়ে ॥[4]

স্থায়ী

১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২
গ রে সা,রেধ্‌সাসা || প রে গ রগ || পগা প সাঁধ সাঁ || ধ প গ রে
জ ব হী, SS সব নী S S র পS S SS S ত S S S

সা ধা সা – || সা রে রে – || পা – রে গ – রে সা সাসারেগা
নী রা S S S S স S ভ S S S S S য়ে S,SSS
৩ × ২ ০

অন্তরা

গা পা সাঁধ সা || সাঁ সাঁ (সাঁ) – || সাঁ রেঁ গঁরেঁ সাঁ || সাঁ সাঁ(সাঁ) ধপা গরে
গু রু পS দ ক ম ল S বৌ S SS ন্দে র ঘুS Sপ তS

গ প সাঁধ সাঁসাঁ || রেঁ গঁ রেঁ সাঁ || প সাঁধ রেঁ সাঁ || (প) গ রেগ সারে,সারেগ
চা S পS Sস মী S S প গ SS S য়ে (S) S SS SS,SSS
৩ × ২ ০

গোয়ালিয়া ঘরানার বন্দিশ

রাগ–ইমন
তাল–একতাল (বিলম্বিত লয়)

স্থায়ী
জিয়ো করো কোর্ট বরস লো
জা ম্যায় অত সুখ পায়ো তেহারে ধাম।

অন্তরা
তু রাউ উম্র বাদ বদৌলত
মুদাম বহ কে লহুমদী আলে হিসলাম।[৫]

স্থায়ী

৯	১০		১১	১২		১	২		৩	৪		৫	৬		৭	৮
নিনি	প(প)	‖	গ	গপ্	‖	রে	গ	‖	গ	গ	‖	গ	রে	‖	গ	র্ম
জিঽ	য়োঽ		ক	রোঽ		কো	ঽ		ট	ব		র	স		লো	ঽ
পা	রে	‖	নিরে	সা	‖	সা	রে	‖	গ	রে	‖	সা	(সা)	‖	নি়	নিধ়
ঽ	জা		ঽঽ	ম্যায়		অ	ত		সু	খ		পা	(ঽ)		য়ো	তেঽ
নি়	ধ়	‖	প়	–	‖	প	–	‖	গ	প	‖	রে	নি়	‖	রে	সা
হা	ঽ		রে	ঽ		ধা	ঽ		ঽ	ঽ		ঽ	ঽ		ঽ	ম
৩			৪			×			০			২			০	

অন্তরা

প	গ	‖	প	ধপ্	‖	সাঁ	–	‖	সাঁ	সাঁ	‖	–	সাঁ	‖	সাঁ	সাঁ
তু	ঽ		রা	ঽঽ		উ	ঽ		ম্র	বা		ঽ	দ		ব	দৌ
রেঁ	রেঁ	‖	সাঁ	নিধ়	‖	নি	–	‖	ধ	প	‖	প	গপ্	‖	–	প
ঽ	ল		ত	মুঽ		দা	ঽ		ঽ	ম		ব	হুঽ		ঽ	কে
–	প	‖	ধ	–	‖	নি	ধ	‖	প	–	‖	প	নিধ়	‖	–	সাঁ
ঽ	ল		হুঁ	ঽ		ঽ	ম		দী	ঽ		আ	ঽঽ		ঽ	ঽ
–	নি	‖	প	পগ্	‖	প	–	‖	রে	গ	‖	রে	নি়	‖	রে	সা
ঽ	লে		হি	সঽ		লা	ঽ		ঽ	ঽ		ঽ	ঽ		ঽ	ম
৩			৪			×			০			২			০	

আগ্রা ঘরানার বন্দিশ

নিম্নে উল্লেখিত আগ্রা ঘরানার বন্দিশটি তিলোক-কামোদ রাগে এবং তিলওয়াড়া (বিলম্বিত) তালে নিবদ্ধ। উক্ত বড় খেয়ালটির রচয়িতা আগ্রা ঘরানার বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ গুলাম আব্বাস খাঁ। বন্দিশটির দুইটি তুক আছে–স্থায়ী ও অন্তরা। ব্রীজ ভাষায় রচিত বন্দিশটি পনেরো মাত্রা থেকে আরম্ভ হয়েছে।

রাগ–তিলোক-কামোদ
তাল–তিলওয়াড়া (বিলম্বিত)

স্থায়ী
এ জিয়রা উন বিন ক্যায়সে রহো জায় হমারা ॥

অন্তরা
যাও সখী তুম উনকো বুলায়ো
উন বিন কৌন সহারা ॥[৬]

স্থায়ী

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬
॥ মপ নিসা
এঽ জিয়
সা– সানিসারে গরেসারে গসারে ॥ প ধপ ধপ মমমপ ॥ মপ মগগ মগগমরেগ স ,রেগ ॥ (সা)রেসসা, প ধমপ নিসা
রাঽ উনঽঽ ঽঽঽঽ বিঽন ক্যায়সেঽ ঽঽ ঽঽরহো জায় ঽঽহ মাঽঽঽঽঽ ঽঽঽ (রা)ঽঽঽ, ঽ ঽঽঽ জায়
× ২ ০ ৩

অন্তরা

১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২
ম প নি র্সা ॥ র্সানির্রের্সার্সার্সার্গর্রে র্গর্ম ॥ র্মর্গর্রের্সা র্সা মপনির্সা র্সা ॥ র্সার্রের্গর্সার্সা পমগমগমরেগাসারেগা
যা ঽ ও স খীঽ তুঽম উনঽ কোবু লাঽঽঽ য়ো তুমবিন কৌ ঽঽঽঽন ঽস হাঽঽঽঽঽ ঽঽঽ

সারেসাসা প ধমপ নিসা ॥
রাঽঽঽ ঽ ঽ,এঽ জিয়
৩ × ২ ০

নিম্নে বর্ণিত আগ্রা ঘরানার বন্দিশটি 'যোগ' রাগে নিবদ্ধ। এতে ত্রিতাল ব্যবহৃত হয়েছে। আগ্রা ঘরানার বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ ফৈয়াজ খাঁ রচিত এই বন্দিশটির দুইটি তুক আছে। স্থায়ী ও অন্তরা। বন্দিশটি হিন্দি ও ব্রীজ ভাষায় রচিত।

স্থায়ী
সজন মোরে ঘর আয়ো
মন অত সুখ পায়ো ॥

অন্তরা
মঙ্গল গাউ চৌখ পুরাউ
প্রেমপিয়া সুখ পায়ো ॥[৭]

স্থায়ী

৯	১০	১১	১২
–	(গ)ম	গ	সা
S	স	জ	ন
০			

১৩	১৪	১৫	১৬		১	২	৩	৪		৫	৬	৭	৮		৯	১০	১১	১২
সা	নি	গ	সা	‖	সা	–	নিপ	প	‖	প	নি	সা	গ	‖	–	গ	–	–
মো	রে	ঘ	র		আ	S	SS	S		S	S	য়ো	S		S	ম	ন	অ
গ	–	ম	প	‖	ম	–	গ	ম	‖	সা	(ম)গ	গ	সা	‖	–	গ	ম	সা
ত	S	সু	খ		প	S	S	S		S	S	য়ো	S		S	স	জ	ন
৩					×					২					০			

অন্তরা

৯	১০	১১	১২
গ	ম	প	নি
ম	ঙ	গ	ল
০			

১৩	১৪	১৫	১৬		১	২	৩	৪		৫	৬	৭	৮		৯	১০	১১	১২
র্সা	–	–	–	॥	র্সা	–	নি	প	॥	মগ	প	ম	–	॥	–গ	–	–	–
গা	S	উ	S		চৌ	S	খ	পু		ব়াS	S	উ	S		Sপ্রে	ম	পি	য়া
–	ম	প	ম	॥	–	গ	–	ম	॥	সা	মগ	গ	স		গ	ম	গ	সা
S	সু	খ	পা		S	S	S	S		S	S	য়ো	S		S	স	জ	ন
৩					×					২					০			

উল্লেখিত আগ্রা ঘরানার বন্দিশটি কামোদ রাগে এবং ত্রিতালে নিবদ্ধ। এটি রচনা করেছেন আগ্রা ঘরানার বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ তসদ্দুক হুসেন খাঁ। যিনি 'বিনোদ পিয়া' নামে পরিচিত। বন্দিশটির দুটি তুক আছে–স্থায়ী ও অন্তরা। স্থায়ী শুরু হয়েছে ১২ মাত্রা থেকে এবং অন্তরা শুরু হয়েছে ১৩ মাত্রা থেকে।

রাগ- কামোদ
তাল- ত্রিতাল

স্থায়ী
বেগুন গুনা গার হে করতার
তারন তার তু সতার

অন্তরা
বিনোদ অজীজ হ্যায়, বেকস লাচার
তু ইয়া জগ কো হ্যায়, নিস্তার।[৮]

স্থায়ী

১৩	১৪	১৫	১৬		১	২	৩	৪		৫	৬	৭	৮		৯	১০	১১	১২
																		সা
																		বে
ম	র	প	প্র্ম	||	ধ	প	প	–	||	গ	–	ম	প	||	ম	রে	সা	–
গু	ন	গু	ন্যাS		গা	S	S	র		হে	S	ক	র		তা	S	S	র
রেঁ	–	র্সা	–	||	র্সা	ধ	প	প	||	গ	–	ম	প	||	ম	রে	সা,	স
তা	S	র	ন		তা	S	S	র		তু	S	স	S		তা	S	র,	বে
৩					×					২					০			

অন্তরা

১৩	১৪	১৫	১৬		১	২	৩	৪		৫	৬	৭	৮		৯	১০	১১	১২
প	প	র্সা	র্সা	||	সা	রে	সা	–	||	র্সা	ধা	র্সা	রেঁ	||	র্সা	ধ	প	প
বি	নো	দ	অ		জী	জ	হ্যায়	S		বে	ক	স	লা		চা	S	S	র
মঁ	গমঁ	রেঁ	র্সা	||	নির্সা	রেঁ	র্সা	ধ	||	প	–	গম্	প	||	ম	রে	সা,	সা
তু	S	ইয়া	S		জ	গ	কো	S		হ্যায়	S	নিS	S		স্তা	S	র,	বে
৩					×					২					০			

অত্রৌলী ঘরানার বন্দিশ

অত্রৌলী ঘরানার উল্লেখিত বন্দিশটি সম্পর্কে জানা যায় যে এর পদ্য রচনা অত্যন্ত প্রাচীন তবে এই বন্দিশটির স্বর রচনা করেছেন অত্রৌলী ঘরানার মহান সংগীতজ্ঞ আল্লাদিয়া খাঁ। বন্দিশটি ঝাঁপতালে 'সাবনী বিহাগ' রাগে রচিত। এই বন্দিশের দুটি তুক রয়েছে–স্থায়ী ও অন্তরা।

রাগ- সাবনী বিহাগ
তাল- ঝাঁপতাল

স্থায়ী
দেব দেব সতসংগ শ্রী রংগ ভবদংগ
তারণ শরণ সব শিব কৈ আয়ে।

অন্তরা
জপত ভব ঢিংগরী প্রহলাদ সমান
সদা ভক্ত রহিয়ে সংকট দুর করৌ মুহারে ৷৷[৯]

স্থায়ী

১	২		৩	৪	৫		৬	৭		৮	৯	১০
সা	প্	‖	প্	সা	সা	‖	গ	রেসা	‖	সা	সা	ম
দে	ঽ		ব	স	ত		সং	ঽঽ		গ	শ্রী	ঽ
গ	,রেসা	‖	সা	সা	সা	‖	ম	গ	‖	ম	প	প
রং	,ঽঽ		গ	ভ	ব		দং	ঽ		গ	তা	র
প	প	‖	প্ধপ্	প	র্সা	‖	র্সা	প	‖	প	প্ধপ্	প
ন	শ		বঽঽ	ণ	স		ব	ঽ		শি	বঽঽ	কে
গ	ম	‖	ধ	মপ	ম	‖	মপ	গ	‖	রেসা,	–	রেসা
ঽ	ঽ		আ	ঽঽ	ঽ		ঽঽ	য়ে		ঽঽ	দে,	ঽব
×			২				০			৩		

অন্তরা

প	প	‖	র্সা	–	র্সা	‖	র্সা	–	‖	র্সা	র্সা	র্রের্সাসা
জ	প		ত	ঽ	ভ		ব	ঽ		ঢিং	গ	ঽঽরী
র্সা	র্সা	‖	–	র্সা	র্সার্ম	‖	র্গ,	র্রের্সা	‖	র্সা	র্সা	র্সা
প্র	হলা		ঽ	দ	সঽ		মা,	ঽঽ		ন	স	দা

প	প	‖	গ	গ	মপ	‖	গ	রেসা	‖	সা	মা	গা
s	ভ		s	ক্ত	রহি		য়ে	ss		সং	ক	ট
প	–	‖	প	প	প	‖	সাঁ	প	‖	প	প	গ
দু	s		র	ক	রৌ		s	s		মু	হা	s
মধ	মপ	‖	প	প	গ	‖	রেসা	সা	‖	সা,	সা	রেসাসা
রেs	ss		s	s	s		ss	s		s,	দে	ssব
×			২				০			৩		

অত্রৌলী ঘরানার উল্লেখিত বন্দিশটি এই ঘরানার বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ মেহবুব খাঁ দ্বারা রচিত। তাঁর ছদ্মনাম ছিল দরস পিয়া। তাঁর রচিত বন্দিশগুলোতে তিনি এই নাম ব্যবহার করতেন। জৌনপুরী রাগের এই বন্দিশটি ত্রিতালে নিবদ্ধ। এর দুটি তুক রয়েছে– স্থায়ী ও অন্তরা এবং বন্দিশটি ব্রীজ ভাষায় রচিত।

রাগ– জৌনপুরী
তাল– ত্রিতাল

স্থায়ী
পরিয়ে পায়নবা কে সজনী
জো না মানে গুনিয়ন কী সীখ ॥

অন্তরা
হাথ জোর ফিরনেয়ারে হোবে
এ্যায়সে নরকে পাস না জৈয়ো
দরস কহে বা সোঁ নিত ডরিয়ে ॥[১০]

স্থায়ী

৯	১০	১১	১২		১৩	১৪	১৫	১৬		১	২	৩	৪		৫	৬	৭	৮
[প]ম	ম	প	সাঁ	॥	[নি]ধ	–	পধ	মপ	॥	গ	–	রে	[সা]ম	॥	প	–	–	–
প	রি	য়ে	ঽ		পঽ	ঽ	য়েঽ	নঽ		বা	ঽ	কে	ঽ		স	জ	নি	ঽ
প	–	গঁ	–	॥	[সা]রেঁ	–	সাঁ	–	॥	[সা]নি	নি	সাঁ	সাঁ	॥	[নি]রেঁ	ধ	–	প
জো	ঽ	না	ঽ		মা	ঽ	নে	ঽ		গু	নি	য়	ন		কী	সী	ঽ	খ
০					৩					×					২			

অন্তরা

[প]ম	–	প	[নি]ধ	॥	–	ধ	নি	নি	॥	সাঁ	–	সাঁ	–	॥	নি	সাঁ	সাঁ	–
হা	ঽ	থ	জো		ঽ	র	ফি	র		ন্যা	ঽ	রো	ঽ		হো	ঽ	বে	ঽ
[নি]ধা	–	[নি]ধা	–	॥	[ধ]সাঁ	–	–	–	॥	সাঁরেঁ	[ম]গঁ	রেঁ	সাঁ	॥	রেঁ	নি	ধ	প
এ্যায়	ঽ	সে	ঽ		ন	র	কে	ঽ		পাঽ	ঽ	স	ন		জৈ	ঽ	য়ে	ঽ
প	–	গঁ	–	॥	[সা]রেঁ	–	সাঁ	–	॥	[সা]নি	নি	সাঁ	সাঁ	॥	রেঁ	নি	ধ	প
দ	র	স	ক		হে	ঽ	বা	ঽ		সোঁ	ঽ	নি	ত		ড	রি	য়ে	ঽ
০					৩					×					২			

আল্লাদিয়া খাঁ রচিত অত্রৌলী ঘরানার এই বন্দিশটি ললিতা গৌরী রাগে ও ত্রিতালে নিবদ্ধ একটি বিলম্বিত খেয়াল। এর দুটি তুক রয়েছে–স্থায়ী ও অন্তরা।

রাগ– ললিতা গৌরী
তাল– ত্রিতাল (বিলম্বিত)

স্থায়ী
প্রীতম সইয়াঁ, দরস দিখাজা,
মোরা জিয়া চাহে রে।

অন্তরা
বিন কৌথ কছু ন সুহাবে
রহিলো জায় সদারঙ্গ ডারু গরে হার ॥[১১]

স্থায়ী

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬
|| রেগ রেসা
প্রীs তম

সা – নিসারে নিসানি||নিরেগম ম – গমম||গম গ – রেগ||রেগমগরে -সা রেনিসা ধানি
সই s sss ssয়া দরসদি খা s sss ss জা s ss ssss s sss মোরা

রেগ –মমগরেগম প || পপ পধপমপমগমগ||রেগ – রেগরেগমগ – || রে সানি নিরেগ রেগ
জিয়াs sssss s চাহে রেss sss sss ss s ssssss s s ss প্রীss তম
× ২ ০ ৩

অন্তরা

১৩ ১৪ ১৫ ১৬
|| গম ধনিসা
বিন কৌss

নিসা সা নিধনিসা || সা নিধ নি ধপ || ধমপ গ গরেরে সা || নিরেগম ম ম, গমম
ss থ কছু নাs s সুs হা sবে sss s রহিলো জায় সদারঙ্গ ডা s, sss

গম গ – গরে || গমপ – ধ মপ || গম,গ রেগ রেগরেগমগরেসা || রেনিসা নিধনি রেগ রেসা
ss রু s গরে হাss s s s sss ss রsssss ss s,ss sss প্রীs তম
× ২ ০ ৩

রামপুর (সহসওয়ান) ঘরানার বন্দিশ

উল্লেখিত বন্দিশটি রামপুর ঘরানার বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ মুস্তাক হুসেন খাঁ দ্বারা রচিত। দেশ রাগে রচিত এই বন্দিশটি ত্রিতালে নিবদ্ধ। এর দুটি তুক রয়েছে, স্থায়ী ও অন্তরা। বন্দিশটি হিন্দি ও ব্রীজ ভাষায় রচিত।

রাগ–দেশ
তাল–ত্রিতাল

স্থায়ী
তুম বিন মোরী কৌন খবরিয়া লেবে
শাহে নজফ কে বসৈয়া।

অন্তরা
মুস্তাক ভিখারী দেত সদা তোরে দর পর
সুন লো নবীজী কে ভইয়া ॥[১২]

স্থায়ী

১৩	১৪	১৫	১৬		১	২	৩	৪		৫	৬	৭	৮		৯	১০	১১	১২
ম	সারে	ম	প	॥	নি	নি	সাঁ	–	॥	পনি	সাঁরেঁ	নি	নি	॥	ধ	প	মধ	পধ
তু	মSS	বি	ন		মো	S	রী	S		কৌS	SS	ন	খ		ব	রি	য়াS	SS
(ম)	গম	রেগ	রে	॥	সাঁ	নি	ধ	নি	॥	ধ	প	মধ	পধ	॥	ম	গ	রেগ	সা
(লে)	SS	বেS	S		শা	S	হে	ন		জ	ফ	কেS	বS		সৈ	S	য়াS	S
৩					×					২					০			

অন্তরা

মম	প	নি	নি	॥	সাঁ	–	সাঁ	–	॥	রেঁ	গঁ	রেঁ	মঁ	॥	গঁ	রেঁ	সাঁ	নি
মুশ	তা	ক	ভি		খা	S	রী	S		দে	S	ত	স		দা	S	তো	রে
সাঁ	নি	সাঁ	সাঁ	॥	ম	প	নি	–	॥	সাঁ	নি	সাঁ	রেঁ	॥	সাঁনি	ধপ	মগরেসা	নিসা
দ	র	প	র		সু	ন	লো	ন		বী	S	জী	কে		ভই	SS	য়াSSS	SS
৩					×					২					০			

রামপুর ঘরানার এই বন্দিশটি রচনা করেছেন বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ ও সংগীত পৃষ্ঠপোষক পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে। বন্দিশটি শুদ্ধ কল্যাণ রাগে রচিত এবং ঝাঁপতালে নিবদ্ধ একটি প্রচলিত বন্দিশ। এর দুটি তুক রয়েছে- স্থায়ী ও অন্তরা। এতে হিন্দি ও ব্রীজভাষা ব্যবহার করা হয়েছে।

রাগ– শুদ্ধ কল্যাণ
তাল– ঝাঁপতাল

স্থায়ী
গাবো সব সুজন রাগিণী সুধ কল্যাণে
ঔড়ব সমপূরণ প্রথম প্রহর জান ॥

অন্তরা
আরোহন ম নি তজত বাদি সুর গান্ধার
ধৈবত নিত দুরবল কহে চতুর পরমান ॥[১৩]

স্থায়ী

১	২		৩	৪	৫		৬	৭		৮	৯	১০
[সা]গ	–	‖	গ	রে	[সা]রে	‖	গ	রে	‖	সা	–	সা
গা	ऽ		বো	ऽ	স		ব	সু		জ	ऽ	ন
[নি]সা	–	‖	রে	[সা]রে	রে	‖	গ	রে	‖	সা	–	সা
রা	ऽ		গি	নি	সু		ধ	ক		ল্যা	ऽ	ন
[নি]সা	–	‖	[গ]রে	গ	রে	‖	[নি]সা	নি়ধ়	‖	নি়	ধ়	প়
ঔ	ऽ		ড়	ऽ	ব		সমু	পূऽ		র	ऽ	ণ
[ম]প	গ	‖	প	ধ	প	‖	গ	রে	‖	[নি]সা	রেধ়	সা
প্র	থ		ম	ऽ	প্র		হ	র		জা	ऽऽ	ন
×			২				০			৩		

অন্তরা

গপ	গ	‖	গ	প	প	‖	ধসাঁ	সাঁধ	‖	সাঁ	সাঁ	সাঁ
আ	s		রো	হ	ন		ম	নি		ত	জ	ত
সাঁ	–	‖	রেঁ	গঁ	রেঁ	‖	সাঁ	নি্ধ্‌	‖	নি	ধ	প
বা	s		দি	সু	র		গান্‌	ss		ধা	s	র
প	গ	‖	প	প	প	‖	নি	ধ	‖	প	ধ	প
ধৈ	s		ব	ত	নি		ত	দু		ওও	ব	ল
সাঁ	ধ	‖	প	গ	প	‖	গ	রে	‖	নিসা	রেধ্‌	সা
ক	হে		চ	তু	র		প	র		মা	ss	ন
×			২				০			৩		

কিরানা ঘরানার বন্দিশ

এই ঘরানার কোন সুরকারের (বাগ্গেয়কার) নাম পাওয়া যায় না। তবে যে সকল বন্দিশ এই ঘরানায় গাওয়া হয় কিরানা ঘরানার সংগীতজ্ঞরাই তার সুরস্রষ্টা। উল্লেখিত বন্দিশটি দরবারী কানাড়া রাগে রচিত এবং ত্রিতালে নিবদ্ধ। এর দুটি তুক রয়েছে–স্থায়ী ও অন্তরা।

রাগ– দরবারী কানাড়া
তাল– ত্রিতাল (মধ্যলয়)

স্থায়ী
জব সুধ লাগী তুমরে দরস কী
লাগী কলেজে পীর পীর দেখো।

অন্তরা
বিন্দাবন বংসীবট ত্যাগী
ত্যাগী যমুনা নীড়
আপহী জায়ে দ্বারকা ঠাড়ে
ঠাড়ী নদী কে তীর তীর দেখো ॥[১৪]

স্থায়ী

৯	১০	১১	১২		১৩	১৪	১৫	১৬		১	২	৩	৪		৫	৬	৭	৮
নিসা	রে	ম	রেসা	||	ধ	ধ	নি	–	||	রে	রে	রে	সা	||	রে	নি	সা	–
জ্ঽ	ব	ঽ	সুধ্		লা	ঽ	গী	ঽ		তু	ম	রে	দ		র	স	কী	ঽ
রেরে	রে	রে	রে	||	সা	রেপা	গ	–	||	গ	–	গ	ম	||	রে	রে	সা	সা
লাঽ	গী	ঽ	ক		লে	জেঽ	ঽ	ঽ		পী	ঽ	র	পী		ঽ	র	দে	খো
০					৩					×					২			

অন্তরা

ম	–	প	–	||	ধ	ধ	ধ	ধ	||	সা	–	সা	সা	||	ধ	নি	ওঁও	সা
বিন্	ঽ	দ্রা	ঽ		ব	ন	বন্	ঽ		সী	ঽ	ব	ট		ত্যা	ঽ	গী	ঽ
নি	–	সা	–	||	নি	সা	রে	সা	||	সা	–	–	–	||	ধ	নি	প	–
ত্যা	ঽ	গী	ঽ		য	মু	না	ঽ		নী	ঽ	ঽ	ঽ		ঽ	ঽ	ঽ	ড়
নি	নি	নি	নি	||	সা	সা	সা	সা	||	গ	–	গ	ম	||	রে	রে	সা	সা
আ	ঽ	প	হী		জা	ঽ	য়ে	ঽ		দ্বা	ঽ	র	কা		ঽ	ঠা	ঽ	ড়ে

রে	রে	রে	রে	‖	সা	রে	প	গ	‖	গ	–	গ	ম	‖	রে	রে	সা	সা
ঠা	s	ড়ী	ন		দী	s	কে	s		তী	s	র	তী		s	র	দে	খো
০					৩					×					২			

কিরানা ঘরানার উল্লেখিত বন্দিশটি বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ সদারঙ্গ (নিয়ামত আলি খাঁ) দ্বারা রচিত। বন্দিশটি মেঘমল্লার রাগে সৃষ্ট এবং ঝাঁপতালে নিবদ্ধ। ব্রীজভাষায় রচিত বন্দিশটির দুটি তুক বা ভাগ রয়েছে– স্থায়ী ও অন্তরা।

রাগ– মেঘ মল্লার
তাল– ঝাঁপতাল (মধ্যলয়)

স্থায়ী
গরজে ঘটাঘন কাবেরী কারে
পাবস রুত আই।
দুলহন মন ভায়ে।

অন্তরা
রৈন আঁধেরী বিজরী ডরাবে
সদারঙ্গীলে মহম্মদ শা
পিয়া ঘর নাহি।[১৫]

স্থায়ী

১	২		৩	৪	৫		৬	৭		৮	৯	১০
মরে	মরে	‖	মরে	মা	রে	‖	সা	–	‖	নি	–	প
গ	ওও		জে	s	ঘ		টা	s		ঘ	s	ন
নিসা	–	‖	রে	–	সারে	‖	মরে	প	‖	মপ	মরে	ম
কা	s		বে	s	রী		কা	s		রে	ss	s
রেনি	সা	‖	মরে	ম	র	‖	সা	সা	‖	পনি	–	প
পা	s		ব	s	স		ওঙ	ত		আ	s	ই
মা	পা	‖	সা	–	সা	‖	পনিধনি	পম	‖	মরে	–	সা
দু	ল		হ	s	ন		মs	নs		ভা	s	য়ে
×			২				০			৩		

Dhaka University Institutional Repository

অন্তরা

(প)ম	প	॥	নি	র্সা	নি	॥	র্সা	–	॥	র্সা	–	–
রৈ	ঽ		ন	ঽ	আন্		ধে	ঽ		রী	ঽ	ঽ
(র্সা)র্নি	র্সা	॥	র্রে	–	র্সা	॥	(র্সা)র্রে (র্সা)র্রে	র্সা	॥	নি̱পম	নি̱র্সা	র্রে
বি	জ		রী	ঽ	ভ		রাঽ	ঽ		ঽঽঽ	ঽঽ	বে
(প)নি̱	প	॥	(র্সা)নি̱	র্সা	র্সা	॥	র্সা	র্সানি̱	॥	র্রে	র্সা	–
স	দা		রং	গী	লে		মহ	ম্মঽ		দ	শা	ঽ
(নি̱)র্সা	নি̱	॥	র্সা	র্রে	সা	॥	নি̱	প	॥	ম	(ম)রে	সা
পি	য়া		ঽ	ঽ	ঘ		র	ন		ঽ	ঽ	হি
×			২				০			৩		

ভিণ্ডী বাজার ঘরানার বন্দিশ

উল্লেখিত বন্দিশটি রচনা করেছেন ভিণ্ডীবাজার ঘরানার বিখ্যাত সংগীতগুণী অমান অলী খাঁ। বন্দিশটি দরবারী কানাড়া (কানাড়া) রাগে রচিত এবং ত্রিতালে নিবদ্ধ। এর দুটি তুক রয়েছে- স্থায়ী ও অন্তরা। বন্দিশটি ব্রীজ ভাষায় রচিত।

রাগ–দরবারী কানাড়া
তাল–ত্রিতাল

স্থায়ী
তু হী তু করীম চাহে সো করে তু রব সাই।

অন্তরা
মাঙ্গে সোহি দেবে দিবাবে সবন কো
'অমর' তেহারে সাহেব গুণ গাবি ॥[১৬]

স্থায়ী

১৩	১৪	১৫	১৬		১	২	৩	৪		৫	৬	৭	৮		৯	১০	১১	১২
				‖					‖					‖				সা
																		তু
সা	নি	রে	সা	‖	সা	–	ধ	–	‖	নি	–	নি	–	‖	সা	সা	সা	সা
হি	তু	ऽ	ক		রী	ऽ	ऽ	ऽ		ऽ	ऽ	ম	ऽ		র	হী	ম	চা
নি	রে	–	রে	‖	গ	–	ম	প	‖	নিমপ	গ	ম	মস্যা	‖	রে	রেনি	সা	সা
হে	সো	ऽ	ক		রে	ऽ	ऽ	ऽ		তুऽऽ	ऽ	ऽ	রঽ		ব	সাঁঽ	ই,	তু
৩					×					২					০			

অন্তরা

১৩	১৪	১৫	১৬		১	২	৩	৪		৫	৬	৭	৮		৯	১০	১১	১২
				‖					‖					‖				ম
																		মা
নিপ	সাধ	নি	নি	‖	সা	–	সা	সানি	‖	নি	সারে	রে	সা	‖	নি	সারে	ধ	নি
ঙ্গেঽ	সোঽ	ऽ	হি		দে	ऽ	বে	দিঽ		বা	ऽऽ	বে	স		ব	নঽ	কো	অ
প	সা	গ	ম	‖	রে	–	সা	রে	‖	সা	পম	পনি	গ	‖	ম	রে	রে,	সা
ম	র	ऽ	তে		হা	ऽ	রে	সা		হে	বঽ	গুঽ	ন		ঽ	গা	বি,	তু
৩					×					২					০			

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখিত বন্দিশটি অমান আলী খাঁ রচিত ভৈরব রাগের একটি প্রসিদ্ধ বন্দিশ। এটি একতালে নিবদ্ধ। এর দুইটি তুক রয়েছে–স্থায়ী ও অন্তরা। এতে ব্রীজভাষার প্রয়োগ করা হয়েছে।

রাগ– ভৈরব
তাল– একতাল

স্থায়ী
অব করম কীজে জী ভগবন্ত বলবন্ত দাতা দয়ানিজু

অন্তরা
তু হী দীন দয়াল তু আকাশ তু পতাল তুহী রূপ
তু হী খেয়াল জগতার 'অমর' গুনজ্ঞানীজু ॥[১৭]

স্থায়ী

১	২		৩	৪		৫	৬		৭	৮		৯	১০		১১	১২
		‖			‖			‖		রে	‖	রে	সা	‖	ধ়	নি়
										অ		ব	ক		র	ম
রে	–	‖	–	সা	‖	–	সা	‖	–	সা	‖	রেসা	ধ়	‖	–	ধ়
কী	s		s	জে		s	জী		s	ভ		গs	বন্		s	ত
–	ধ়	‖	নিসা	ম	‖	–	ম	‖	ম	–	‖	গ	গ	‖	মপ	ম
s	ব		লs	ব		s	ন্ত		দা	s		s	তা		ss	দ
প	ম	‖	গ	ম	‖	রে	সা	‖	–,	রে	‖					
য়া	s		s	নি		s	জু		s,	অ						
×			০			২			০			৩			৪	

অন্তরা

গ	ম	‖	–	ধ়	‖	–	ধ়	‖	ধ়	সাং	‖	সাং	সাং	‖	–	সাং
তু	হী		s	দী		s	ন		তু	s		দ	য়া		s	ল
ধ়	–	‖	ধ়	সাং	‖	–	সাং	‖	রেং	–	‖	সাং	ধ়	‖	–	প
তু	s		আ	কা		s	শ		তু	s		প	তা		s	ল
ম	প	‖	–	ম	‖	–	গ	‖	গ	গ	‖	ম	রে	‖	–	সা
তু	হী		s	রূ		s	প		তু	হী		s	খেয়া		s	ল

Dhaka University Institutional Repository

নি	ধ	ll	ধ	–	ll	–	নি	ll	সা	ম	ll	ম	ধ	ll	সা̇	সা̇
জ	গ		তা	S		S	র		অ	ম		র	গু		S	ন

ধ	প	ll	ম	গ	ll	ম	রে	ll	–,	রে	ll					
জ্ঞা	S		S	নী		S	জু		S,	অ						
×			০			২			০			৩			৪	

পাতিয়ালা (পাটিয়ালা) ঘরানার বন্দিশ

পাতিয়ালা ঘরানার উল্লেখিত বন্দিশটি আড়ানা রাগে রচিত ও ত্রিতালে (দ্রুত) নিবদ্ধ একটি সুপ্রসিদ্ধ বন্দিশ। এর দুটি তুক রয়েছে- স্থায়ী ও অন্তরা।

রাগ– আড়ানা
তাল– ত্রিতাল

স্থায়ী
তান কপ্তান কাহা গয়ো
জগত মে ফতেহ্ আলী খাঁ

অন্তরা
তান বলবন্ত এ্যাসী ফিরত হ্যায়
জৈসে অর্জুন জী কী বাণ ॥[১৮]

স্থায়ী

১	২	৩	৪		৫	৬	৭	৮		৯	১০	১১	১২		১৩	১৪	১৫	১৬
				॥					॥	–	–	সা̇নি	সা̇রে̇	॥	গরে̇	সা̇নি	পম	রে̇সা̇
												তাS	SS		SS	নS	কS	পS
গ	–	ম	প	॥	গ	ম	রে	সা	॥	নি	সা	রে	ম	॥	প	নি	ম	প
ত	S	ন	কা		হা	S	গ	য়ো		জ	গ	ত	মে		ফ	তেহ্	আ	লী
সা̇নি	সা̇রে̇	গরে̇	সা̇নি	॥	পম	প	সা̇নি	সা̇রে̇	॥	গরে̇	সা̇নি							
খাঁS,	SS	SS	নS		কS	প	তাS	SS		SS	ন,S							
×					২					০					৩			

অন্তরা

৯	১০	১১	১২		১৩	১৪	১৫	১৬		১	২	৩	৪		৫	৬	৭	৮
ম	প	নি	প	॥	নি	নি	সা̇	–	॥	রে̇	ম̇	রে̇	সা̇	॥	নি	সা̇	নি	প
তা	ন	ব	ল		ব	S	ন্ত	S		এ্যা	সী	S	ফি		র	ত	হ্যায়	S
প	রে̇	রে̇	রে̇	॥	রে̇	রে̇	সা̇	সা̇	॥	সা̇নি	সা̇রে̇	গরে̇	সা̇নি	॥	পম	প	সা̇নি	সা̇রে̇
জৈ	সে	অ	র		জু	ন	জী	কী		বাS	SS	SS	নSS		কS	প	তাS	SS
গরে̇	সা̇নি	সা̇নি	সা̇রে̇	॥														
SS	Sন	তাS	SS															
০					৩					×					২			

Dhaka University Institutional Repository

মেওয়াতি (মেবাতী) ঘরানার বন্দিশ

উল্লেখিত বন্দিশটি মিয়ামল্লার রাগে রচিত ও ত্রিতালে নিবদ্ধ। এর দুটি তুক রয়েছে– স্থায়ী ও অন্তরা। এটি হিন্দী ও ব্রীজভাষায় রচিত।

রাগ– মিয়া মল্লার
তাল– ত্রিতাল

স্থায়ী
ঘন গরজত বরসত বুন্দ বুন্দ
চলত পবন মন মন্দ সুগন্ধন ॥

অন্তরা
আবকী সাবন তোহে জানেনা দুঙ্গী
সদা রঙ্গীলে মহম্মদ শাহ্
রাখো পলকে মুন্দ মুন্দ ॥[১৯]

স্থায়ী

৯	১০	১১	১২		১৩	১৪	১৫	১৬		১	২	৩	৪		৫	৬	৭	৮
															–	–	নি়	সা
															s	s	ঘ	ন
রে	ম	রে	সা	॥	সানি়	রেসা	নি়ধনি়	প	॥	নি়	–	ধ়	নি়	॥	নি়	সা	–	–
গ	র	জ	ত		বs	রs	সsss	ত		বু	ন্	দ	বু		ন্	দ	s	s
রে	–	প	প	॥	প	ম	প	নি়	॥	গ়	ম	রে	সা	॥	রে	রে	সা	সা
চ	ল	ত	প		ব	ন	ম	ন		ম	ন্	দ	সু		গ	ন্	ধ	ন
রে	–	প	প	॥	ম	প	প	নি়	॥	গম়	রে	সা	রে	॥	রে	সা,	নি়	সা
চ	ল	ত	প		ব	ন	ম	ন		মs	দ	সুs	গন্		ধ	ন,	ঘ	ন
০					৩					×					২			

Dhaka University Institutional Repository

অন্তরা

ম	রে	প	প	‖	নি	ধ	নি	নি	‖	সাঁ	–	–	–	‖	সাঁ	–	–	–
আ	ব	কী	সা		ব	ন	তো	হে		জা	ऽ	নে	না		দু	ং	গী	ऽ
নি	নি	–	ধ	‖	নি	–	সাঁ	সাঁ	‖	নিসাঁ	রেঁ	সাঁনি	রেঁসাঁ	‖	ধনি	প	–	–
স	দা	ऽ	রং		গী	ऽ	লে	ম		হাঽ	ऽ	মঽ	দঽ		শাঽ	হ	ऽ	ऽ
ম	রে	প	–	‖	নি	ধ	নি	সাঁ	‖	গ	ম	রেসাঁ	রে	‖	রে	সা,	নি	সা
রা	ऽ	খো	ऽ		প	ল	কে	ऽ		মু	ন্	দঽ	মু		ন্	দ,	ঘ	ন
০					৩					×					২			

দিল্লী ঘরানার বন্দিশ

উল্লেখিত বন্দিশটি ইমন রাগে রচিত এবং ত্রিতালে নিবদ্ধ। ‘গুরু বিনা ক্যায়সে’ বন্দিশটির স্বরলিপি সংগীতের অন্য পুস্তক থেকে এখানে একটু ভিন্নভাবে উপস্থাপন করা হলো। এই স্বরলিপিটি দিল্লী ঘরানার ওস্তাদ চাঁদ খাঁর। তাঁর বক্তব্য হচ্ছে এই স্বরলিপি ঠিক ঐভাবেই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যেভাবে দিল্লী ঘরানার সংগীতজ্ঞ মিয়া অচপল এবং তাঁর প্রমুখ শিষ্য গেয়েছেন। মিয়া অচপলের আসল নাম মীর সাদিক আলি।

এই বন্দিশটির দুইটি তুক রয়েছে- একটি স্থায়ী এবং অন্যটি অন্তরা। ত্রিতালে নিবদ্ধ বন্দিশটি ইমন রাগের একটি বিখ্যাত এবং সুপ্রচলিত বন্দিশ।

রাগ–ইমন
তাল–ত্রিতাল

স্থায়ী

গুরু বিন ক্যায়সে গুণ গায়ে
গুরু ন মানে তো গুণ নাহি আয়ে
গুণিয়ন মে বে গুণী কহাবে ॥

অন্তরা

মানে তো রিঝায়ে সবকো
চরণ পরে শা ভী খন কে
জব আয়ে অচপল তালসুর।[২০]

স্থায়ী

৯	১০	১১	১২		১৩	১৪	১৫	১৬		১	২	৩	৪		৫	৬	৭	৮
ম॑	প	নি	ধ	‖	পম॑	–	ধ	পম॑প	‖	ম॑	গ	ম॑	রে	‖	গ	–	ম॑	গ
গু	রু	বি	ন		ক্যায়	ঽ	ঽ	সেঽঽ		গু	ন	গা	ঽ		য়ে	ঽ	ঽ	ঽ
রে	গ	রে	সা	‖	সা	রে	সা	সা	‖	নি়	রে	গ	রে	‖	নি়	রে	সা	সা
গু	রু	ন	মা		ঽ	নে	তো	ঽ		গু	ন	ন	হি		আ	ঽ	য়ে	ঽ
নি়	ধ়	নি়	রে	‖	গ	–	প	–	‖	রে	গ	–	রে	‖	নি়	রে	সা	–
গু	নি	য়	ন		মে	ঽ	বে	ঽ		গু	ণী	ঽ	ক		হা	ঽ	বে	ঽ
০					৩					×					২			

Dhaka University Institutional Repository

অন্তরা

প	–	প	–	ǀǀ	নি	ধ	নি	নি	ǀǀ	র্সা	–	র্সা	–	ǀǀ	নি	র্রে	র্সা	–
মা	ऽ	নে	ऽ		তো	ऽ	রি	ऽ		ঝা	ऽ	য়ে	ऽ		স	ব	কো	ऽ
ধ	–	ধ	–	ǀǀ	নি	–	র্সা	–	ǀǀ	নি	র্রে	র্সানি	র্সা	ǀǀ	ধ	ধ	প	–
চ	র	ণ	প		রে	ऽ	শা	ऽ		ভী	ऽ	খুঽ	ন		কে	ऽ	ऽ	ऽ
প	প	রে	রে	ǀǀ	গ	গ	প	প	ǀǀ	র্সা	র্সা	প	প	ǀǀ	রে	ন্ি	রে	সা
জ	ব	আ	ऽ		বে	ऽ	অ	চ		প	ল	তা	ऽ		ল	সু	ऽ	র
০					৩					×					২			

Dhaka University Institutional Repository

দিল্লী ঘরানার উল্লেখিত বন্দিশটি তানরস খাঁ রচিত একটি প্রসিদ্ধ এবং প্রচলিত বন্দিশ। এই বন্দিশটি টোড়ী/তোড়ী রাগে রচিত এবং ত্রিতালে (বিলম্বিত) নিবদ্ধ। এর দুটি তুক রয়েছে- স্থায়ী ও অন্তরা।

রাগ– তোড়ী
তাল– ত্রিতাল (বিলম্বিত)

স্থায়ী
অব মোরি নাইয়া পার করো তুম
হজরত নিজামুদ্দিন অওলিয়া পীর ॥

অন্তরা
দুঃখ দরিদ্র সব দূর করো অব
তানরস খাঁ কি লে দো খবরিয়া
গঞ্জ শকর কে লাভ লড়াইয়া ॥[২১]

স্থায়ী

৯	১০	১১	১২		১৩	১৪	১৫	১৬		১	২	৩	৪		৫	৬	৭	৮
সা	সা	সা	রেগ	॥	গ	রে	স	সা	॥	(প)	র্ম	প	ধ	॥	র্ম	গ	রে	সা
অ	ব	মো	রিS		S	না	S	ইয়া		(পা)	S	র	ক		রো	S	তু	ম
সা	রে	গ	র্ম	॥	ধ	নি	র্সা	র্সা	॥	নি	ধ	র্মপ	ধ	॥	র্ম	গ	রে	সা
হ	জ	র	ত		নি	জা	S	মু		দ্দি	ন	অS	ও		লি	য়া	পী	র
০					৩					×					২			

অন্তরা

র্ম	র্ম	গ	গ	॥	র্ম	র্ম	ধ	ধ	॥	র্সা	র্সা	র্সা	র্সা	॥	নি	র্রে	র্সা	র্সা
দু	খ	দ	S		রি	দ্র	স	ব		দু	S	র	ক		রো	S	অ	ব
ধ	ধ	ধ	ধ	॥	নি	–	র্সা	–	॥	র্সার্রে	র্গ	র্রে	র্সা	॥	নি	র্সানি	ধ	প
তা	ন	র	স		খাঁ	S	কী	S		লেS	S	দো	খ		ব	রিS	য়া	S
র্ম	ধ	গ	গ	॥	র্ম	র্ম	ধ	ধ	॥	র্মধ	নির্সা	নি	ধ	॥	র্ম	গ	রে	সা
গন্	S	জ	শ		ক	র	কে	S		লাS	SS	ভ	ল		ড়ই	S	য়া	S
০					৩					×					২			

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যসূত্র

১) নার্গিস নাসির, *খয়াল রীতির গানের ঘরানা-ভেদে পরিবেশন পদ্ধতির স্বাতন্ত্র্য এবং নান্দনিক বিচার বিশ্লেষণ*, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮ বিধান সরণী, কলকাতা-৬, প্রথম প্রকাশ: ২০১১, পৃ: ১৫৫।

২) পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে, *হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতি* (তৃতীয় খণ্ড), রেণুকা সাহা, ২০ কেশব সেন স্ট্রীট, ১৩৯৭, কলিকাতা, পৃ: ১০৯।

৩) শন্নো খুরানা, *খেয়াল গায়কী মে বিবিধ ঘরানে*, ১০. ডী. এস. আই. ডী. সী. স্কীম, ওখলা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া নয়া দিল্লী ১১০০২০, প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৫, পৃ: ১৭।

৪) প্রাগুক্ত, পৃ: ২১।

৫) প্রাগুক্ত, পৃ: ২৪।

৬) প্রাগুক্ত, পৃ: ৪৭।

৭) নার্গিস নাসির, *খয়াল রীতির গানের ঘরানা-ভেদে পরিবেশন পদ্ধতির স্বাতন্ত্র্য এবং নান্দনিক বিচার বিশ্লেষণ*, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮ বিধান সরণী, কলকাতা-৬, প্রথম প্রকাশ: ২০১১, পৃ: ১৫৪।

৮) শন্নো খুরানা, *খেয়াল গায়কী মে বিবিধ ঘরানে*, ১০. ডী. এস. আই. ডী. সী. স্কীম, ওখলা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, নয়াদিল্লী ১১০০২০, প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৫, পৃ: ৫০।

৯) শন্নো খুরানা, *খেয়াল গায়কী মে বিবিধ ঘরানে*, ১০. ডী. এস. আই. ডী. সী. স্কীম, ওখলা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া নয়া দিল্লী ১১০০২০, প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৫, পৃ: ৩৬।

১০) নার্গিস নাসির,*খয়াল রীতির গানের ঘরানা-ভেদে পরিবেশন পদ্ধতির স্বাতন্ত্র্য এবং নান্দনিক বিচার বিশ্লেষণ*, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮ বিধান সরণী, কলকাতা-৬, প্রথম প্রকাশ:২০১১, পৃ: ১৫৯।

১১) শন্নো খুরানা, *খেয়াল গায়কী মে বিবিধ ঘরানে*, ১০. ডী. এস. আই. ডী. সী. স্কীম, ওখলা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া নয়া দিল্লী ১১০০২০, প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৫, পৃ: ৩৮।

১২) প্রাগুক্ত, পৃ: ১০০।

১৩) পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে, *হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতি* (সপ্তম খণ্ড), রেণুকা সাহা, ২০ কেশব সেন স্ট্রীট, কলিকাতা, পৃ: ২২।

১৪) শন্নো খুরানা, *খেয়াল গায়কী মে বিবিধ ঘরানে*, ১০. ডী. এস. আই. ডী. সী. স্কীম, ওখলা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া নয়া দিল্লী ১১০০২০, প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৫, পৃ: ৬১।

১৫) নার্গিস নাসির,*খয়াল রীতির গানের ঘরানা-ভেদে পরিবেশন পদ্ধতির স্বাতন্ত্র্য এবং নান্দনিক বিচার বিশ্লেষণ*, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮ বিধান সরণী, কলকাতা-৬, প্রথম প্রকাশ:২০১১, পৃ: ১৬৮।

Dhaka University Institutional Repository

১৬) শন্নো খুরানা, *খেয়াল গায়কী মে বিবিধ ঘরানে*, ১০. ডী. এস. আই. ডী. সী. স্কীম, ওখলা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া নয়া দিল্লী ১১০০২০, প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৫, পৃ: ৭৪।

১৭) প্রাগুক্ত, পৃ: ৭৭।

১৮) প্রাগুক্ত, পৃ: ৯১।

১৯) https://youtu.be/er7h1QX7zdg

২০) শন্নো খুরানা, *খেয়াল গায়কী মে বিবিধ ঘরানে*, ১০. ডী. এস. আই. ডী. সী. স্কীম, ওখলা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া নয়া দিল্লী ১১০০২০, প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৫, পৃ: ৮৬।

২১) প্রাগুক্ত, পৃ: ৮৫।

গ্রন্থপঞ্জি

অজয় চক্রবর্তী, *শ্রুতিনন্দন*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা : ১৯৯৯।

অঞ্জলি চক্রবর্তী, *ঠুমরী গানের ইতিকথা (প্রথম খন্ড)*, মুখার্জী প্রিন্টার্স, কলকাতা : ১৪১০।

অপূর্ব সন্দর মৈত্র, *সংগীত কথা*, ৪২ মহেশ চৌধুরী লেন, কলকাতা : ১৯৯৬।

অমলেন্দুবিকাশ করচৌধুরী, *রাগপ্রধান গানের উৎস সন্ধানে*, ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা : ১৯৮৪।

অভিজিত রায়, *কত্থকনৃত্য ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট*, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা : ১৪০৫।

অভিজিত রায়, *কত্থকনৃত্যের উৎস ও প্রাসঙ্গিকতা*, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলিকাতা : ১৪০৫।

অমল দাশ শর্মা, *প্রাচীন ও নবীন সংগীতজ্ঞ এবং ঘরানার ইতিবৃত্ত*, দরবারী প্রকাশন, কলকাতা : ১৯৯৫।

অমিয়রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, *সঙ্গীতের সৌন্দর্যচিন্তা*, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা : ১৯৯৫।

অমিয়রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, *স্মৃতির আলোয় আমার জীবন ও গান*, সুবর্ণরেখা, কলকাতা : ২০০৭।

অহোবল পণ্ডিত, *সঙ্গীত পারিজাত*, দিপায়ন, কলকাতা : ২০০১।

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, *ভারতীয় সঙ্গীত*, সুত্রধর, কলকাতা : ২০১৩।

উৎপলা গোস্বামী, *ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত*, সলিল সাহা, কলকাতা : ১৩৯৭।

করুণাময় গোস্বামী, *সংগীতকোষ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা : ১৯৮৫।

কুমার প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, *কুদরত রঙ্গি বিরঙ্গী*, আনন্দ পাবলিশার্স, কলিকাতা; ১৪০২।

কুমার প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, *খেয়াল ও হিন্দুস্থানি সঙ্গীতের অবক্ষয়*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা : ২০০৩।

কৃষ্ণপদ মণ্ডল, *বাংলার রাগসঙ্গীত (১ম খণ্ড)*, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, আগারগাঁও, ঢাকা : ২০০৭।

ক্ষিতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, *সঙ্গীতদর্শিকা রামকৃষ্ণ আশ্রম*, ষষ্ঠদশ সংস্করণ, কলকাতা : ২০১০।

জগদানন্দ বড়ুয়া, *সঙ্গীত রত্নাকর (১ম খণ্ড)*, প্রকাশক : শ্রী জগদানন্দ বড়ুয়া, কলকাতা : ১৯৮৬।

জগদানন্দ বড়ুয়া, *সঙ্গীত রত্নাকর (২য় খণ্ড)*, প্রকাশক : শ্রী জগদানন্দ বড়ুয়া, কলকাতা : ১৯৮৭।

জয়কৃষ্ণ মাইতি, *তবলা শাস্ত্র প্রভাকর*, নাথ ব্রাদার্স, কলকাতা।

জামিল চৌধুরী, *আধুনিক বাংলা অভিধান*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা : ১৪২২।

টি আর শুকলা, *নবনির্মিত এবং অপ্রচলিত রাগ মঞ্জুরি এবং শাস্ত্র*, প্রকাশ বুক ডিপো, বড়েলী, ভারত : ১৯৮৬।

Dhaka University Institutional Repository

দিলীপ কুমার মুখোপাধ্যায়, *ভারতীয় সংগীতে ঘরানার ইতিহাস*, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী প্রাঃ লিঃ, কলকাতা : ১৩৮৪।

দুলাল ভট্টাচার্য, *তবলার ঘরানা*, নাথ পাবলিশিং, কলকাতা : ২০০৫।

দেবব্রত দত্ত, *সঙ্গীত সোবন*, ব্রতী প্রকাশনী, কলকাতা : ২০০৪।

দেবব্রত দত্ত, *সঙ্গীত-তত্ত্ব (তবলা প্রসঙ্গ)*, ব্রতী প্রকাশনী, কলকাতা : ১৯৮২।

দেবব্রত দত্ত, *সঙ্গীত-তত্ত্ব (শাস্ত্রীয় তথা ভাব সঙ্গীত প্রসঙ্গ)*, ব্রতী প্রকাশনী, কলকাতা : ১৪০২।

দেবব্রত দত্ত, *সঙ্গীত-সহায়িকা (শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রশ্নোত্তরী পুস্তক) ১ম খন্ড*, ব্রতী প্রকাশনী, কলকাতা : ১৯৭৫।

দেবব্রত দত্ত, *সঙ্গীত-সহায়িকা (শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রশ্নোত্তরী পুস্তক) ২য় খন্ড*, ব্রতী প্রকাশনী, কলকাতা : ১৯৭৬।

দীপা মুখোপাধ্যায়, *দীপাঞ্জলি*, সোহিনী সাহানা প্রকাশনী, কলকাতা : ১৯৯৭।

নবনীতা চট্টোপাধ্যায়, *ভারতীয় সংগীত প্রকর্ষ ইতিহাস ও তত্ত্ব*, বিনয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা : ১৯৯৬।

নার্গিস নাসির, *খয়াল রীতির গানের ঘরানা-ভেদে পরিবেশন পদ্ধতির স্বাতন্ত্র্য এবং নান্দনিক বিচার বিশ্লেষণ*, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা : ২০১১।

নিবেদিতা কোসর, *ষড়জ পঞ্চম (প্রথম ভাগ)*, কোসর পাবলিকেশন্স, কলকাতা : ১৯৮৯।

নীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায়, *সঙ্গীত পরিচিতি (পূর্বভাগ)*, আদিবাস ব্রাদার্স, কলকাতা : ১৩৫৭।

নীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায়, *হিন্দুস্থানি নৃত্যশৈলী কথক*, হসন্তিকা প্রকাশিকা, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ

নীহারবিন্দু চৌধুরী, *কণ্ঠসঙ্গীত সাধনা*, বাউলমন প্রকাশন, কলকাতা : ১৯৮০।

পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে, *হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতি (প্রথম খণ্ড)*, রেণুকা সাহা, কলিকাতা : ১৩৯৬।

পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে, *হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতি (তৃতীয় খণ্ড)*, রেণুকা সাহা, কলিকাতা : ১৩৯৭।

পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে, *হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতি (সপ্তম খণ্ড)*, রেণুকা সাহা, কলিকাতা : ১৩৯৮।

পণ্ডিত নন্দগোপাল বিশ্বাস, *ঠুমরী লহরী(১ম খণ্ড)*, দীপায়ন, কলকাতা : ১৪০২।

পণ্ডিত নন্দগোপাল বিশ্বাস, *ঠুমরী লহরী(২য় খণ্ড)*, দীপায়ন, কলকাতা : ১৪০৩।

পণ্ডিত নন্দগোপাল বিশ্বাস, *ঠুমরী লহরী(৩য় খণ্ড)*, দীপায়ন, কলকাতা : ১৪০৫।

পাপড়ি চক্রবর্তী, *নান্দনিক ভাবনায় ভারতীয় সঙ্গীত*, সুমাল্য ভট্টাচার্য, কলকাতা : ২০০৫।

প্রদীপকুমার ঘোষ, *দক্ষিণ ভারতের সংগীত*, শিবলিঙ, কলকাতা : ১৯৮৯।

Dhaka University Institutional Repository

প্রদীপকুমার ঘোষ, *ভারতীয় সংগীতের ক্রমবিবর্তন (সংগীত মূল্যায়ন বক্তৃতামালা)*, পশ্চিমবঙ্গ বাদ্য সংগীত একাডেমী, কলকাতা : ১৯৮৯।

প্রদীপকুমার ঘোষ, *মধ্যযুগের সঙ্গীত ও সঙ্গীতজ্ঞ*, শিবলিঙ, কলকাতা : ২০১০।

প্রদীপকুমার ঘোষ, *সংগীত শাস্ত্র সমীক্ষা*, পশ্চিমবঙ্গ বাদ্য সংগীত একাডেমী, কলকাতা : ২০০৫।

প্রদীপ কুমার ঘোষ, *হিন্দুস্তানী সংগীতে ঘরানার ক্রমবিকাশ*, শ্রীমতী তৃপ্তি ঘোষ, কলাকাতা : ২০০২।

প্রভাতকুমার গোস্বামী, *ভারতীয় সঙ্গীতের কথা*, আদি নাথ ব্রাদার্স, পরিবর্ধিত পঞ্চম সংস্করণ, কলকাতা : ২০০৫।

বসন্ত, *সংগীত বিশারদ(হিন্দী)*, সংগীত কার্যালয়, কলকাতা : ২০০৪।

বাসুদেব ঘোষাল, *সঙ্গীত মুকুল (প্রথম খণ্ড)*, নাথ পাবলিশিং, কলকাতা : ১৪১২।

বিনতা মৈত্র, *ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের রীতি বিবর্তন*, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা : ১৯৯৬।

বিনয় চক্রবর্তী, *পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত আকাদেমি পত্রিকা*, সংস্কৃতি অধিকর্তা, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সংগীত আকাদেমি, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, কলকাতা : ২০০২।

বিমল রায়, *সংগীতি শব্দকোষ (২য় খণ্ড)*, পশ্চিমবঙ্গ বাদ্য সংগীত একাডেমী, কলকাতা : ১৯৯৬।

বিমলাকান্ত রায়চৌধুরী, *ভারতীয় সঙ্গীতকোষ*, সাম্প্রতম প্রকাশন, কলকাতা : ১৩৭২।

বিমলা রায়, সম্পাঃ ড. প্রদীপকুমার ঘোষ, *রাগ-রহস্য*, শিবলিঙ, কলকাতা : ২০১১।

ম ন মুস্তাফা, *আমাদের সঙ্গীত ইতিহাসের আলোকে*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা : ১৯৮১।

মাণিক সাহা, *আগ্রা ঘরানা*, দিপায়ন, কলকাতা : ১৪০৯।

মীনাক্ষী বিশ্বাস, *পরম্পরা*, সপ্তর্ষি প্রকাশন, কলিকাতা : ২০১৩।

মুকেশ গর্গ সম্পাদিত, *'মাসিক সংগীত পত্রিকা'*, হাথরস : সংগীত কার্যালয়, কলকাতা : ২০০৬।

মুশাররাত শবনম ও ফিরোজ আহমেদ ইকবাল, *সঙ্গীত মুখশ্রী (হাজার বছরের সঙ্গীতজ্ঞ-শাস্ত্রকারদের জীবনী)*, ম্যাগমাম ওপাস, শাহবাগ, ঢাকা : ২০১২।

মোবারক হোসেন খান, *কণ্ঠ সাধন*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা : ১৩৯৬।

মোবারক হোসেন খান, *গীতমঞ্জুরী*, বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি, ঢাকা : ২০০৫।

মোবারক হোসেন খান, *সংগীত দর্পণ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা : ১৯৯৯।

মোবারক হোসেন খান, *সংগীত মালিকা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা; ১৩৯৪।

মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, *সংগীত-সংলাপ*, প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা, সুত্রাপুর, ঢাকা : ২০০৪।

রণি গুহ মজুমদার, *রাগপঞ্জী*, নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস, কলকাতা : ১৪০০।

রবিশঙ্কর, *রাগ-অনুরাগ*, আনন্দ প্রকাশনী, কলকাতা : ১৯৮০।

রাজেশ্বর মিশ্র, *মুঘল ভারতের সংগীত চিন্তা*, লেখক সমবায় সমিতি, কলকাতা : ১৯৬৪।

Dhaka University Institutional Repository

রামকৃষ্ণ দাস, *আমীর খুসরৌ ভারতীয়*, মল্লিক ব্রাদার্স, কলকাতা : ২০০৩।

রামপ্রসাদ রায়, *সংগীত জিজ্ঞাসা*, *শ্রীমতী নমিতা রায়*, কলকাতা : ২০০৩।

রেবা মুহুরী, *ঠুমরী ও বাইজী*, প্রতিভাস, কলকাতা : ১৯৮৬।

লক্ষ্মীনারায়ণ গর্গ, *হামারে সংগীত রত্ন (হিন্দী)*, হাথরস প্রকাশনী, গুজরাট।

লীনা তাপসী খান, *রাগরূপ (উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত গ্রন্থ) প্রথম ভাগ*, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা : ২০১৬।

সঙ্গীতশাস্ত্রী সুবোধচন্দ্র নন্দী, *সঙ্গীতসুধা (দ্বিতীয় খণ্ড)*, কলকাতা : ১৪১৪।

সুধীর চক্রবর্তী, *ঘরানা বাহিরানা*, পত্রলেখা, কলকাতা : ২০০৬।

সুধীর চক্রবর্তী, *নির্বাচিত ধ্রুবপদ-২*, গাঙচিল, কলকাতা : ২০০৯।

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, *সঙ্গীত রত্নাকর (অনুবাদ)*, ড. সন্তোষকুমার ঘড়ুই, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা : ১৩৭৯।

স্বপন নস্কর, *ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিকথা (প্রথম খণ্ড)*, শিল্পী প্রকাশিকা, কলকাতা : ১৪১৬।

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, *ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস (প্রথম ভাগ)*, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলকাতা : ১৩৫৯।

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, *ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস (দ্বিতীয় ভাগ)*, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলকাতা : ১৩৬৩।

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, *ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস (তৃতীয় ভাগ)*, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলকাতা : ১৩৯৪।

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, *ভারতীয় সঙ্গীত (ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক রূপরেখা)*, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, কলকাতা : ১৯৮৬।

শক্তিপদ ভট্টাচার্য, *উচ্চাঙ্গ ক্রিয়াত্মক সংগীত*, নাথ ব্রাদার্স, কলকাতা : ১৯৮০।

শন্নো খুরানা, *খেয়াল গায়কী মে বিবিধ ঘরানে (হিন্দী)*, ওখলা ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়া, নয়া দিল্লী : ১৯৯৫।

শম্ভুনাথ ঘোষ, *তবলার ইতিবৃত্ত*, সঙ্গীত প্রকাশন, কলকাতা : ১৯৭২।

শংকর লাল মুখোপাধ্যায়, *ভারতীয় নৃত্য ধারার সমীক্ষা*, ফার্মা কে.এ.প্রা: লি: কলকাতা : ১৯৯৭।

শাশ্বতী সেনগুপ্ত মুখার্জী, *কত্থক নৃত্যকলা*, নিখিল রঞ্জন সেনগুপ্ত, কলকাতা : ১৩৯৪।

হরিশচন্দ্র শ্রীবাস্তব, *রাগ পরিচয় (ভাগ ২, হিন্দী)*, সঙ্গীত সদন প্রকাশন, শেষ সংস্করণ, এলাহাবাদ, ভারত : ২০০৬।

হরিশচন্দ্র শ্রীবাস্তব, *হামারে প্রিয় সঙ্গীতজ্ঞ (হিন্দী)*, সঙ্গীত সদন প্রকাশন, ষষ্ঠ সংস্করণ, এলাহাবাদ।

Bonric C. Wad C., *Khyal tradition on North-Indian Classical Music Tradition*, Munsiram Monaharlal Publishing, New Delhi, India : 1984.

Mohan Nandkarni, *the Great Masters*, Rupa Co, New Delhi, India : 1999.

Dhaka University Institutional Repository

O.C. Gangoly, *RAGAS & RAGINIS*, Munshiram Monoharlal Publish ers Pvt. Ltd., New Delhi, India : 1935.

Vamanrao H. Deshpande, *Indian Musical Tradition on Aesthetic study at the Gharana tradition Music*, Ramadash G. Bhatkal for Popular Prakasana, Bombay, India.

Vasudev Murthy, *What the Raags told me*, Rupa Co, New Delhi, India : 2004.

Dhaka University Institutional Repository